



চেরাগে জ্ঞান শরীফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-নৈমান আল-সুবেশ্বরী
শ্রাম: চুনকুটিয়া, পো: শুভাচ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি



১. মারেফতের গোপন কথা

২. মারেফতের বাণী

৩. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ১ম খণ্ড

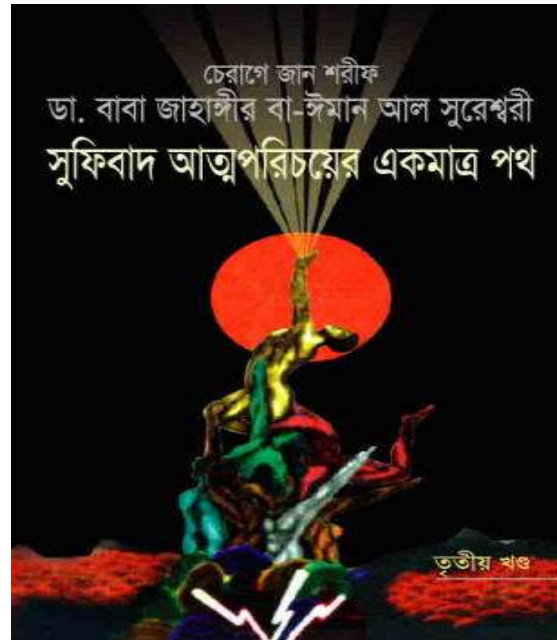
৪. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ২য় খণ্ড

৫. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৩য় খণ্ড

৬. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৪র্থ খণ্ড

৭. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৫ম খণ্ড

৮. কোরআনুল মাজিদের বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ- ১ম খণ্ড



সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ (তৃতীয় খণ্ড)

সূচিপত্র

সবাইকে বলছি না	৪৩
কিছু বলতে চাই	৪৫
ইসলাম গবেষণা ও কিছু কথা	৬৫
মানুষ..... শয়তান	৬৮
আল্লামা ইকবালের কালজয়ী সুফিবাদভিত্তিক কবিতা ও তার অনুবাদ	৭৩
কোরান-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কয়টি কথা	৭৬
সূরা : আশ্বিয়া	৭৭
সূরা : হুজ	১২৮
সূরা : রুম	১৮৫
হাদিস সংগ্রহের নানা কথা	১৯৫
প্রচার মাধ্যম নিয়ে আক্রেপ	১৯৯
কুহ ও নফস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা	২০১
শয়তানের অবস্থান কোথায়	২০৩
শয়তানের প্রকারভেদ	২০৫
জ্ঞানের প্রকারভেদ	২১৩
ধ্যানসাধনার স্বরূপ	২১৫
বিবর্তনবাদের কিছু কথা	২২০
আহাদ আল্লাহ এবং ওয়াহেদ আল্লাহর পার্থক্য	২২৩
গণতন্ত্রমনা জনতার নিকট একটি আহ্বান	২২৯

ফেরকাবাজির ধর্মীয় ধৃষ্টতা	২৩০
বই-পড়া জ্ঞান বনাম আধ্যাত্মিক জ্ঞান	২৩১
গবেষণার তাগিদ	২৩৪
খেলাফত বিষয়ে ভুলের অবসান হোক	২৩৬
কারবালার যুদ্ধ এবং সাহাবা প্রসঙ্গ	২৪০
কোরানের মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যার স্বরূপ	২৪২
কুহ এবং নফস বিষয়ে ভুলের অবসান হোক	২৪৪
সাধনার সহায়ক মোকাম পরিচয়	২৫০
ছবি বিষয়ে ভুলের অবসান হোক	২৫৩
আদম দেহই রহস্যের মাকাম, ইনসান দেহ নহে	২৫৪
সালাত বা নামাজের প্রকারভেদ	২৫৫
হাকিকি কবর ও শরিয়তি কবর	২৫৯
ফেরকাবাজির পরিণাম	২৬০
সত্যদর্শনে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি আশ্বাস	২৬২
যাহারা সাধনায় আগ্রহী তাহাদের প্রতি অনুরোধ	২৬৫
বলে রাখলাম	২৬৫
জানিয়ে রাখলাম	২৬৫

সবাইকে বলছি না

বিচিত্র এই মানব-সমাজের বুকে কিছু কিছু লোক আছে যারা নাস্তিক তথা আল্লাহকেই মানে না। আবার কিছু কিছু লোক আছে যারা অধ্যাত্মবাদকেই অস্বীকার করে এবং অনুষ্ঠানগুলোকেই ধর্মের মূলমন্ত্র মনে করে। কিছু কিছু লোক আছে যারা আরজ্জ আলি মাতুঝরের মতো বলে বেড়ায়, ধর্মে নাকি প্রেম করা হারাম, কিছু চারটি মেয়েকে এক সঙ্গে হাঙ্গা (বিয়ে) করা হালাল। কিছু কিছু লোক আছে যারা ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও দর্শনকেই সব কিছু মনে করেন। কিছু কিছু লোক আছে যারা শক্তিকেই সব কিছুর উৎস বা মূল মনে করে। যারা ধর্মের বিভিন্ন ফেরকায় বিশ্বাসী তাহা হয়তো বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে। যারা হিন্দুধর্মের সাধক ব্রহ্মচারী এবং কঠোর নিরামিষভোজী এবং জীবনটাকে সাধনায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন অথচ রহস্যলোকের কিছুই জানতে বুঝতে পারলেন না; যারা কৃষ্ণভাবনায় মৃত হয়ে থাকার সাধনায় ইসকন নামক সংঘ তৈরি করে দুনিয়াজোড়া প্রচার ও আশ্রম তৈরি করে চলছেন, কিন্তু ইহকালে রহস্যলোকের কিছু দেখার, বোঝার এবং জানবার একটি কথাও পেলেন না; যারা খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের নাটকীয় ভঙ্গিতে কথার উচ্চাঙ্গ ভাষার শৈলীতে ভাষণ দিয়ে চমক দেখাচ্ছেন অথচ মরার আগে কাঁচকলাটি পাবেন এবং খ্রিস্টান বানাবার মানবতা নামক মেশিন বানিয়ে চলছেন এবং পৃথিবীর যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী অথবা বিজ্ঞানী অথবা যুক্তিবাদী তাদেরকে আকুল আবেদন জানাই ॥ আপনারা আসুন এবং সুফিদের দেওয়া সহজ পদ্ধতিতে মাত্র একশত বিশ দিন ধ্যানসাধনা করে যান ॥ আশা করি অবশ্যই রহস্যলোকের কিছু না কিছু নিদর্শন দেখতে পাবেন। ‘অবশ্য’

শব্দটি এ জন্য ব্যবহার করলাম যে, ব্যর্থ হবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ প্রথমেই বলে রাখি, যদি আপনার ভাগ্যে না পাবার কথাটি লিখা থাকে তো পাছায় লাগি মেরে আপনাকে আগেই উঠিয়ে দেওয়া হবেই। সুফিদের দেওয়া এই ধ্যানসাধনাটি অনেকটা চুক্তিভিত্তিক ॥ অথচ কোনো চুক্তি নাই। সুফিদের দেওয়া এই ধ্যানসাধনাটি অনেকটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারার মতো ॥ অথচ কোনো চ্যালেঞ্জ নাই। এই ধ্যানসাধনায় যদি দুনিয়ার ধনসম্পদ পাবার আশা নিয়ে আসেন তো অনুরোধ রইলো, ভুলেও আসবেন না। কারণ আপনার যদি দুটো বাড়ি থাকে, তা হারাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কারণ এই ধ্যানসাধনা শক্তির পূজারকের জন্য হারাম। বরং যারা প্রেমের পূজা করেন এবং যারা স্বেচ্ছায় কিছু হারাতে চান তাদের জন্য। ধ্যানসাধনাটির কিছু কিছু অংশ গোপন বলে বইতে লিখে দিলাম না। ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো দুধ না পেয়ে পীরের বাড়িতে গিয়ে লাফালাফি করে চলছেন, আমার পীর হিয়া-হুয়া বলছেন : অথচ নিজে কিছুই বুঝলেন না, জানলেন না, দেখলেন না, কেবল একবস্তা কথা শিখে মানুষের মুখ বন্ধ করে দেবার কলাকৌশল শিখলেন ॥ তাদেরকেও দাওয়াত দিলাম। আসুন, চুপ করে ভক্ত হয়ে ধ্যানসাধনাটি করে দেখুন! কিছু পাবার জন্য তো মুরিদ হয়েছিলেন, কিন্তু যদি কিছু না-ই পেয়ে থাকেন তো আসুন। আর, কিছু পেয়ে থাকলে ভুলেও আসবেন না। এসব কথা বিস্তারিত বইতে লিখা যায় না। তাই আসুন, মাত্র কয়েকটি বৈঠকী ভাষণের ক্যাসেট সংগ্রহ করে শুনে দেখুন।

অকপটে বলতে চাই, একটু নিজের ঢোল নিজেই পিটিয়ে বলতে চাই যে, দারিদ্র্য কাকে বলে তা আমার ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে নি। কোটি কোটি টাকা কামিয়েছি ॥ হোমিও ডাক্তারি করে। মনে হয়, এশিয়া মহাদেশে কোনো হোমিও

ডাক্তার এত অর্থ উপার্জন করে নি। তাই বইপুস্তক কেনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছি। অনেকে বলতো, এত বড় বুক কালেকশন কমই দেখা যায়। প্রচুর পড়াশুনা করতাম। দু'হাতে গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতাম। সঙ্কয়ের জন্য স্বীর অনুরোধটিও শুনি নি। জায়গা-সম্পত্তি কিছুই করি নি। কেবল স্বীর দেওয়া আড়াই বিঘা জমিটুকু আছে। ওটা আমার উপার্জনে নয়, তাই ওটা আমার নয়। ওটা সন্তানদের। না হয় তো ওটা বিক্রি করে দিলে আপনাদের কাছে প্রচারের জন্য হাত পাততে হতো না। ঢাকার বুকে এক কাঠা জমির দাম কত টাকা সবারই তা জানা থাকার কথা, সেখানে পঞ্চাশ কাঠা জমির মালিক আমার প্রয়াত স্বী ॥ গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর মুরিদ ও খলিফা।

ফকিরনির ছেলে হলে মালপানির জন্য ভগ্নামি করাটা অসম্ভব ছিল না। কোটি টাকা লাখি মেরে ফেলে দিয়ে ফকিরি লাইনে এসেছি। তাই ফকিরি আমার কাছে কোহিনুর হীরার চেয়েও অনেক মূল্যবান। ভুল করতে পারি, কিন্তু ভগ্নামি করার আগে মৃত্যু কামনা করি। কারণ মৃত্যুই শেষ শাস্তি। যা জানি না তা কোনোদিন জানার ভান করতে চাই না। সোজা বলে দেই, জানি না। এ কথাগুলো এ জন্যই বললাম যে, এই ধ্যানসাধনাটি কত বড় একটি জলজ্যান্ত সত্য তা একটু ধ্যানসাধনা করে দেখুন। দেখুন, ওয়াহেদকে কেমন করে আহাদের সঙ্গে গিরায় গিরায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অথচ আহাদের সঙ্গে ওয়াহেদকে আর্কৈপ্তে এমনভাবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে যে, একখণ্ড জমি কিনতে পারলে মন খুশি হয়। কারণ কী ? জমিটিও মাটি, আর দেহটিও মাটি। মাটি মাটিকে আকর্ষণ করে। অথচ ওয়াহেদ মাটিও নয়, জমিও নয়। ওয়াহেদ বিদায় নিলে মাটির দেহটি লাশ হয়ে পড়ে থাকে। লজ্জায় ওয়াহেদ কর্মফলের ভোগটিকে দেখে চমকে ওঠে, কিন্তু তখন আর করার কিছুই

থাকে না। নিয়তির ঘূর্ণায়মান চক্রে শক্ত বন্ধনটিকে কে অস্বীকার করতে পারে, যদি না কোনো কামেল গুরুর রহমত লাভ করা যায়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, যার গুরু নাই, শয়তান তার গুরু। বর্তমানে বাজারে গুরুর ছড়াছড়ি। কিন্তু আসল গুরুটি কোথায়? ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ফেইথ ইজ মিনিংলেস উইদাউট এনি অ্যাক্চুয়াল প্র্যাকটিস তথা বিশ্বাসের কোনো মূল্যই থাকে না যদি তার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

মনে পড়ে কাফের ওকবা মহানবিকে গালি দেওয়াতে মহানবি মনে বড়ই কষ্ট পেয়েছিলেন। কারণ গালিটি ছিল অশ্লীল। মহানবি বলেছিলেন এই বলে যে, ‘তুমি তো গালি দেবেই, কারণ তুমি তো জারজ সন্তান।’ কাফের ওকবা তার মায়ের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলো। কাফের ওকবার মা বলেছিল, ‘কথাটি একদম সত্য।’ এত বড় সত্যটি মায়ের কাছে শোনার পরও তো মহানবির কাছে গিয়ে মুসলমান হয় নি! কাফের কাফেরই রয়ে গেল।

জগতে অনেক লোক আছে যারা সত্য জানবার পরও কাফের ওকবার মতো সত্যকে গ্রহণ করে নিতে পারে না, পারে নি এবং পারবেও না। অদৃশ্য তকদীর একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। অথচ সবাই মনে করে, সঠিক পথেই তো আছি।

কিছু বলতে চাই

সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইটির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করলাম। প্রচণ্ড কাজের চাপে (বৈষয়িক কাজ নয়) সারাটি রাত জেগে থাকতে হয়। সেই কাজটি হলো কোরান-এর অনুবাদ। কোরান-এর অনুবাদটি এত শক্ত ও ব্যাকুলতার বিষয় হবে তা বুঝতে পারি নি। পৃথিবীতে একটিও কোরান-এর হুবহু অনুবাদ নাই ॥ এই কথাটি আমি ভুলেও বলতে চাই না, তবে বাংলাভাষায় হুবহু অনুবাদটি আজও কেউ করেন নি। হুবহু অনুবাদ করতে গেলে অনেক কিছুই তো বোঝাটা কষ্টকর। তাই অকপটে বলেছি যে, ‘ইহা বুঝতে পারলাম না।’ হুবহু এ জন্য করলাম যে, আমি এই অনুবাদের রহস্যটি বুঝতে না পারলেও অনাগত কালের গবেষকেরা বুঝতে পারবেন। তাই মনগড়া, অর্থের বিকৃত করা অনুবাদ করলাম না। যা আছে তাই রেখে দিলাম। যেমন একটি নমুনা তুলে ধরছি : ‘আমরা একমাত্র ফেরেশতাদেরকে আগুনের অধিবাসী করি’ ॥ এই হুবহু অনুবাদটিতে অন্ধের হিশাবে গড়মিল পাওয়াতে অনুবাদক ফেরেশতাদেরকে আগুনের অধিবাসী না করে দারোয়ান তথা প্রহরী অনুবাদ করে রেখেছেন। কোথায় আগুনের অধিবাসী আর কোথায় প্রহরী নিযুক্ত করা! অনুবাদক যেন ভুলটাকে (?) শুদ্ধ করে দেবার দায়িত্বটি পালন করলেন বলে তৃপ্তি পেলেন। অনুবাদক একটিবার ভুলেও মনে করতে পারলেন না যে, পৃথিবীর সব পানি কালি আর গাছগুলো কলম হলেও কোরান-এর ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। নিরপেক্ষ হওয়া তো অনুবাদকের জন্য একটি অর্ধম আশ্চর্যজনক বিষয়। তাই এত বস্তা বস্তা গোঁজামিল। পাঠক বাবা-মায়েরা কী শিখবেন? সরল-সহজ পাঠক অবশেষে আল্লাহর ভয়ে

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাত্রে আচ্ছন্ন হবার সমূহ বিপদ থেকে মুক্তি চায়। অনেক আরবি, ফারসি অনুবাদ এবং অনুবাদকের নামগুলো তুলে ধরলাম না। কারণ ব্যাখ্যার নামে, মহানবির নামে কত হাদিসের উদাহরণ যে তুলে ধরা হয়েছে মুখে কুলুপ ঝুটে দেওয়ার জন্য, মুক্ত মনে স্বাধীন গবেষণা করার জন্য, তার হিসাবটা না দেওয়াই ভালো। হজরত মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির ফতুহাতে মক্কি আর হজরত মুফতি ইয়ার আহমদ খান নাসিমীর বিরাট কোরান-তফসিরটি ভুলেও এই সুন্নিদের বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে যাবেন বলে তো মনে হয় না! কারণ মোহাম্মদি দেশ (সৌদি) আরবের মুসলমানরা সবাই ওহাবি। ওহাবিরা ‘ইয়া মোহাম্মদ’, ‘ইয়া নবি’, ‘ইয়া রসুল’ বলাটাকে শেরেক মনে করেন, অথচ আরবদেশটির নামের আগে দাদার নামটি জুড়ে দিয়ে শেরেক করেন নি। কারণ তারা তো শেরেকের মূল এজেন্সি নিয়ে বসে আছেন। তাই মোহাম্মদি আরাবিয়া বললে শেরেক হবে, কিন্তু দাদাজির নামে সৌদি আরব লিখলে তৌহিদে কোনো ক্ষতি হবে না। ছবি তোলা হারাম উনারাই (ওহাবিরা) বলেন, আবার তাদের টাকা এক রিয়াল হতে পাঁচশত রিয়াল পর্যন্ত সব নোটেরই বাদশাদের ছবি থাকলে হারাম হবে না। আমি বিশ্বাস করতাম না যে, এজিদ যেমন তিনশত বিরাট বিরাট (?) আলেম-উলামাদের টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন এবং সেই আলেম-উলামারাই দামেস্কের জনসাধারণকে প্রকাশ্যে ফতোয়াটি গুনিয়ে দিলেন যে, মহানবির প্রাণপ্রিয় নাতি ইমাম হোসায়েন দেশদ্রোহী এবং তাঁকে কতল করা ওয়াজিব। আমি এই অত্যাধুনিক যুগে বিশ্বাস করতে চাহিতাম না যে, ওহাবিরা টাকা দিয়ে সুন্নি আলেম কিনে নিতে পারেন! তবে টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোতে এই বিকাহুয়া (বিক্রি-হয়ে-যাওয়া) আলেমদের মুখে কোনো বিশ্ববিখ্যাত ওলিদের

নাম ও দর্শন ভুলেও মুখে শুনবেন না। কারণ যিনি ওলিদের ওলি সেই বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানিকে ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজ্জদি কাফেরে আকবর তথা ‘সর্বশ্রেষ্ঠ কাফের’ ফতোয়া দিয়ে গেছেন। তা হলে এই সব বিকাহিয়া আলেমদের মুখে কেমন করে বড়পীর সাহেবের প্রশংসা শুনতে পাবার আশা করেন? তবে এদের বিরুদ্ধে কিছু বলার এখনও সময় হয় নি। তবে সময় আসার পরিবেশ অনেকটা তৈরি হয়ে গেছে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের অগ্রভাগে আগে নিয়ন সাইনে লিখা ছিলো ‘আল্লাহ’ এবং ‘মোহাম্মদ’। এখন মহানবির নামে স্থান পেয়েছে ‘আল্লাহ আকবর।’ বাংলাদেশের কোনো পীর সাহেব বড় বড় ওলিদের বইগুলো অনুবাদ করে ব্যাপক প্রচারে এগিয়ে আসছেন না কোনো অজ্ঞাত কারণে। তবে হালে পরম শ্রদ্ধেয় জনাব জেহাদুল ইসলাম সাহেব এই মহৎ কাজে একাই এগিয়ে এসে খাজাবাবার ফারসি ভাষায় রচিত বইগুলো মূল, উচ্চারণ এবং অনুবাদ করে একত্রে একখণ্ডে পাঁচশত উনত্রিশ পৃষ্ঠায় দিউয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন নাম দিয়ে ছাপিয়েছেন। এই বইটি যে ওহাবি মতবাদের উপর কত বড় চপেটাঘাত তা ওহাবিরা এখনই বুঝতে শুরু করেছে। তিনি দিউয়ান-ই-গাউসুল আজম এবং আরও মূল্যবান কিছু বই মূলসহ অনুবাদ করার কথাটি ঘোষণা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ উনি এগারোই মে ২০০৪ দেহত্যাগ করেছেন। উনি বেঁচে থাকলে ‘একলা চলো রে’ নীতি নিয়ে এগিয়ে যেতেন। দিউয়ান-ই-শামসে তাব্রিজ-এর অনুবাদ করার জন্য বিশ্ব দরবার শরীফের পীর সাহেবের ছোট ছেলে বাবা নঈম ধরেছেন এবং মোবাইল ফোনে জানতে পারলাম, এতদিনে একখণ্ড সমাপ্ত হয়েছে। এই অল্প বয়সে যে উনি এত বড় কাজটি ধরেছেন,

এটাই তো ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিছু একটা বলতে গেলে বেগে যেতে পারেন, তাই কিছু বলবো না।

নাহওয়ানের যুদ্ধটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানতে পারি। অনেক ইসলাম-গবেষক পর্যন্ত চমকে যান, চোখে সর্ষেফুল দেখার মতো হয়ে যেতে হয়, সিদ্ধান্তহীনতার ধুম্রজাল তৈরি হয়। কারণ মাওলা আলি (আ.)-র মর্যাদার হাদিসগুলো উম্মাইয়া-আব্বাসিয়রা লুকাতে পারে নি। শত চেষ্টা করেও পারে নি। মাওলা আলির ভক্তদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেও পারে নি। কারণ মহানবির এই হাদিসগুলো সাহাবাদের মুখে মুখে ফিরতো এবং ফেরাটাই স্বাভাবিক। কারণ মাওলা আলি (আ.) মহানবির চাচাতো ভাই, মহানবির প্রাণপ্রিয় কন্যা খাতুনে জান্নাতের স্বামী, মহানবির সাহাবা এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের একমাত্র খলিফা। মাওলা আলি (আ.) আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রথম খলিফা, শেষ খলিফা, মাঝখানের খলিফা এবং সর্বকালের জন্য খলিফা। তাই গাধিরে খুন্নে মাওলা আলি (আ.)-কে হজরত আবু বকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) এবং সব সাহাবারা বিনা বাক্যে খলিফারূপে মহানবির সামনে মেনে নিলেন। শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা অধ্যাত্মবাদ মানে না, সুতরাং সুফিবাদ মেনে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই মাওলা আলি (আ.)-কে রাজকার্য পরিচালনার পক্ষে খলিফারূপে দেখতে না পেয়ে হজরত আবু বকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) এবং আরও কিছু সাহাবাদের উপর ভালো মন্তব্য করা হতে বিরত থাকে এবং শিয়াদের মাঝে কিছু কিছু উপ-ফেরকার অনুসারীরা যা-তা মন্তব্য করতেও পিছপা হয় না। এখানেই শিয়ারা মারাত্মক ভুলটি করে, কারণ অধ্যাত্মবাদ মানে না। যেমন ওহাবিরা মানে না। শিয়া এবং ওহাবি দু'টো ফেরকা টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। সুন্নিরা অধ্যাত্মবাদ মানে এবং

যারাই অধ্যাত্মবাদ মানে তাদেরকেই সুন্নি নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন খ্রিস্টানদের মাঝে ক্যাথলিকরা অধ্যাত্মবাদ মানে। তাই দুনিয়াতে চৌদ্দ আনা মুসলমানই সুন্নি এবং চৌদ্দ আনা খ্রিস্টানই রোমান ক্যাথলিক। ওহাবিদের দেশ পেট্রোডলারে ভাসছে তাই তাদের প্রচার এবং মালপানিটা অনেক অনেক বেশি। মানুষ স্বভাবতঃই দুনিয়ামুখী, তাই ওহাবিরা বিশাল সুন্নি জামাতে ঢুকে সুন্নিদের মাঝে মতভেদ তৈরি করতে পেরেছে। তাই আজ সুন্নিদের মাঝেও ওহাবিদের দর্শনের অনুসারী পাই। তাই আজকাল নিরপেক্ষ ইসলাম-গবেষক পাওয়া বড়ই কষ্টকর। মহানবি মাওলা আলি (আ.)-কে নিয়ে যেসব কথা বলেছেন তার মাত্র দু-চারটা এ জন্যই আবার বলতে হচ্ছে যে, ইসলামের প্রথম ফেরকা খারেজিরা যে-যুদ্ধটি মাওলা আলির বিরুদ্ধে করেছিল, সেই যুদ্ধটির নামই হলো নাহওয়ানের যুদ্ধ। মহানবি বলেছেন যে, আমি যার মাওলা আলিও তার মাওলা; আলি এবং আমি একই নুরের দুইটি টুকরা; যারা আলি হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো, তারা আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো (সংক্ষেপে); যারা আলির বিরুদ্ধে অস্বধারণ করলো তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্বধারণ করলো (সংক্ষেপে)। খারেজিরা ভালো করেই মহানবির এই বাণীগুলো জানতো। তাই তারা যুদ্ধ করার জন্যে কৌশল আবিষ্কার করলো। খারেজিরা বলতে লাগলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানি না এবং আল্লাহর কোরান-এর আইন ছাড়া আর কোনো আইন মানি না ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ খারেজিরা এই কথাটি বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে যে, মাওলা আলি, আপনার সম্মান ও মর্যাদা মহানবি যত বড়ই করুক না কেন, আমরা আপনাকে মানি না। এই কথাটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই রাজনৈতিক চিকন কৌশল আবিষ্কার করে মুখের উপর বলে দিলো যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও মানি না।

এ জন্যই অনেকে মনে করেন যে, খারেজিদের দর্শনটি ওহাবিরা লুফে নিয়েছে। কিছু ওহাবিদের অনেকে আগে খারেজিদের এই দর্শনটি সর্বপ্রথমে গ্রহণ করে নেন আমাদের চার ইমামের মধ্যে এক ইমাম। তাঁর নাম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। তিনি প্রকাশ্যে খারেজিদের মতবাদটিকে বাতেল মতবাদ বললেও পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে গেলেন। কারণ তিনি দশ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন এবং যে-যে হাদিসে সামান্য অধ্যাত্মবাদের গন্ধ পাওয়া যেত উহা গ্রহণ করেন নি। উনি নয় লক্ষ সত্তর হাজার হাদিস জাল হাদিস মনে করে ফেলে দিলেন এবং ত্রিশ হাজার হাদিস রেখে দিলেন এবং নাম দিলেন মসনদে আহমদ এবং এই বিশাল হাদিস গ্রন্থটি সব চাইতে বড় হাদিস গ্রন্থ। যদিও এই বিশাল ষাট খণ্ডের হাদিস গ্রন্থটি সিয়াহ সিঠাহ-র বহির্ভূত, তবুও ওহাবিদের কাছে অমূল্য এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইহার যার-পর-নাই প্রশংসা করে গেছেন এবং ইবনে কাসির সাহেব তাঁর তফসিরে এই হাদিস গ্রন্থের উপর অনেকখানি নির্ভর করে গেছেন এবং এই ইবনে কাসির নামক তফসিরটির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া। কারণ তফসিরে ইবনে কাসির-এ কোনো আধ্যাত্মিক দর্শনের সামান্যমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তাই অনেকে বলে থাকেন যে, ওহাবি মতবাদের ঢাল হচ্ছে তফসিরে ইবনে কাসির। আরও একটি কথা হলো, ওহাবিরা কোনো মাজহাব মানে না। তারা বলে যে, মহানবির জামানায় কোনো মাজহাব ছিলো না, তাই মাজহাব মানি না। তর্কে যদি ওহাবিরা হেরে যায় এবং যদি বলা হয় যে, এই চার মাজহাবে কি কোরান-হাদিস-এর বাহিরে কিছু বলা হয়েছে? তা হলেই ওহাবিরা অনেকটা বাধ্য হয়ে বলে ফেলেন যে, তারা হাম্বলি মাজহাবের অনুসারী। এখন বিষয়টি পাঠকদের কাছে কিছুটা পরিষ্কার হলো বলে মনে করি। কারণ খারেজিরা ভালো করে জানতো

যে, মাওলা আলির নামটি কোরান-এ নাই, তাই কোরান ছাড়া অন্য কথা মানি না। অর্থাৎ হাদিসে বর্ণিত মাওলা আলির মর্যাদা মানি না। কী ঝানু কৌশল, কী ঘাণ্ড চালবাজি খারেজিরা আবিষ্কার করলো। এই ঝানু আর ঘাণ্ড কৌশলের ফাঁদে পড়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হয়েছিল এবং আজও খারেজিদের এই ঝানু দর্শনটি অনেকের মধ্যে বিভ্রান্ত হবার কুয়াশা তৈরি করে চলছে। কারণ, মানুষটি তো আর একা নয়, সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি বহাল তবিয়ে প্রতিটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। সুতরাং শয়তান বিভ্রান্ত করার সুবর্ণ সুযোগটি গ্রহণ করে চলছে। তাই বার বার বলছি যে, ইসলামের মূলসূত্রটি জানতে হলে প্রথমেই আপনাকে শয়তান বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রাখতে হবে, নতুবা পিচ্ছিল পথে বার বার আছাড় খেতে হবে। শয়তান বিষয়টি কোরান-এ শতবারের চেয়েও বেশি বার বলা হয়েছে এবং বার বার শয়তান হতে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। আমি শয়তান বিষয়ের উপর কোরান-এর যতগুলো আয়াত আছে সবগুলো তুলে ধরবো এবং বিশদ আলোচনা করার আশা রাখি সামনের কোনো বইয়ে। তবে অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, শয়তানের থাকার স্থান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোথাও নাই, একমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া। কারণ সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে, তসবিহ পাঠ করে। সুতরাং তৌহিদ-রাজ্যে শয়তান থাকার কোরানিক বিধান নাই। যেহেতু মানুষ এবং জিনকেই আল্লাহ কর্তৃক সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করা হয়েছে সেইহেতু শয়তান কেবলমাত্র জিন এবং মানুষের অন্তরে বাস করে, কিছু দেহে নয়। তাই হাদিসে আছে : তোমার অন্তরে এক টুকরো গোশত আছে আর সেই গোশতখণ্ডটি শয়তানমুক্ত হতে পারলে তুমি পাকপবিত্র। আর অন্তরের সেই গোশতখণ্ডটি নাপাক তথা খান্নাসরূপী শয়তানের আবাসস্থল হলে তুমি নাপাক,

অপবিত্র। সুতরাং সব সাধনার মূল কথা মাত্র একটি, আর সেই একটিমাত্র কথাটি হলো, তোমার ডেতর যে খান্নাসরূপী শয়তানটি আছে উহা ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে তাড়িয়ে দাও। তাই হাকিকি শয়তান হলো চারটি এবং মানুষকে ধোঁকা দেবার অস্ত্র হলো উনিশটি (প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে এবং অস্ত্রগুলোর আরবি নামও অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে এবং উহা কেবলমাত্র কোরান হতে নেওয়া)। চারটি নাম হলো : ইবলিস, শয়তান, মরদুদ এবং খান্নাস। পঞ্চাশত্রে জাহেরি শয়তান হলো তিনটি ॥ এই তিনটি শয়তান মক্কার মিনাতে অবস্থান করে, হাজিদের হজ করতে গিয়ে কংকর ছুঁড়ে মারতে হয় : বড় শয়তান, মেঝা শয়তান এবং ছোট শয়তান। সুতরাং মূলসূত্রটি না জেনে না বুঝে ইসলামের উপর বড় বড় বই লিখাটা কি সঠিক মনে করেন? যদি বলেই ফেলেন যে সঠিক, তা হলে আমার আর কিছুই বলার রইলো না।

খারেজিরা নাহওয়ানের যুদ্ধে মাওলা আলির সামনে যে চমকানো বাণীগুলো শুনিয়েছিলো, তাতে মাওলা আলি খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আদেশ করলেন। মাওলা আলির দলের মাঝেও খতমত খাবার অবস্থা তৈরি হওয়াতে তিনি এই বাণীগুলোকে এক ধরনের চিকন মিষ্টি প্রতারণা বলে অভিহিত করলেন। আজও কি সেই খারেজিমার্কী বাণীগুলো শুনে অনেক মানুষ সঠিক পথটি ছেড়ে বিপথে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে না? তারা কি সেই বাণীটি মনে করতে পারছে না যে, যে আল্লাহকে ভালোবাসতে চায়, সে যেন রসূলকে ভালোবাসে অর্থাৎ রসূলকে ভালোবাসলেই আল্লাহকে ভালোবাসা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হলো। এখানে ভয় এবং সুনীত শব্দ দু'টো ব্যবহার করা হয় নি, বরং ভালোবাসার কথাটি বলা হয়েছে। মাওলা আলি (আ.)কে ভালোবাসলে মহানবি মুহাম্মদ (আ.)-কে ভালোবাসা

হলো। আর মহানবিকে ভালোবাসলেই আল্লাহকে ভালোবাসা হলো। খারেজিরা পিছনের অংশটুকু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর কথাটিই এখানে বললো। যার জন্য মাওলা আলি তাদেরকে বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও খারেজিদের মতো মিষ্টি (?) বাণী শুনিতে কত সরল প্রাণের মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? পাইকারিভাবে সব মুসলমান ভাই যদি বেহেশতে যাবে বলা হয় তা হলে মহানবির তেহাওয়ারটি ফেরকা হবার বাণীটির কী হবে? উম্মতদের মাঝে তেহাওয়ার ফেরকা হবে এবং এই তেহাওয়ার ফেরকার মধ্যে মাত্র একটি ফেরকাই বেহেশতে যাবে। বাকি সব জাহান্নামে যাবে। এখন আপনিই হিসাব করে দেখুন যে, কতজন বেহেশতে যেতে পারে? বিচারের ভারটা আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম। সৌদি আরবের ওহাবি-অনুসারী আলেম-উলামা বাংলাদেশে অনেক আছে। এরা পদে পদে সরল প্রাণের মুসলমানদের ধোঁকা দিচ্ছে। যেমন কিছু মুসলমান যদি ইয়া মুহম্মদ, ইয়া গাওসুল আজম, ইয়া খাজাবাবা, ইয়া বাবা শাহজালাল, ইয়া বাবা ভাণ্ডারী, ইয়া বাবা সানাল শাহ, ইয়া বাবা সুরেশ্বরী, ইয়া বাবা শাহা পীর, ইয়া বাবা আমানটুলী বলে ডাক দেয়, তো ওহাবি আলেম-উলামারা সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার নসিহত করবে এই বলে যে, সব ওলি-নবিদের যিনি স্রষ্টা সেই মহান আল্লাহকে ‘ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ’ বলে ডাকতে পারো না! নবি-ওলিদেরকে আল্লাহ নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং এরা সবাই একদিন মারা যাবে এবং এরা একদিন কেউ থাকবে না। তখন একমাত্র আল্লাহ পাকই সর্বশক্তিমানরূপে থাকবেন। তা হলে এদের নাম ধরে ডাকছো কেন? ইয়া আল্লাহ বলতে পারো না? এখন আপনিই বলুন ॥ কথাগুলো

কত সুন্দর এবং শুনতে কত মিষ্টি লাগে। তা হলে এদের কথায় অনেকেরই বিভ্রান্ত হবার সম্ভব বিপদ থাকতে পারে। কারণ ওই ওহাবি আলেম-উলামাদেরকে এই কথাটি শুনিয়ে দেবার জ্ঞান রাখে না যে, স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ মহানবি মুহম্মদ (আ.)-কে দুই-দুইটি নামে কোরান-এ অনেকবার ডেকেছেন। যেমন ‘ইয়া নবি’, ‘ইয়া আইউহান নবি।’ দুই-দুইটি নামে মহানবিকে ডাক দিয়ে কি আল্লাহ ভুল করেছেন? এই চিকন কথাটি ওহাবি আলেম-উলামাদেরকে শুনিয়ে দেবার জ্ঞান কয়জন সহজ-সরল মুসলমানের আছে? সুতরাং বিভ্রান্ত হওয়াটা তো স্বাভাবিক। এরা ধর্ম-বিষয়ের সব কিছুতে আল্লাহর দোহাই দেয়, আর তা শুনতেও ভালোই লাগে। কিন্তু বিভ্রান্তির চিকন ধোঁকাগুলো যে এদের কথার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে তা কয়জন সরল মুসলমান ধরতে পারবে? বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়েও অনেক সময় অনেক কথা বলে ফেলি। সংযত হতে পারি না, তাই লিখি।

আর একটি প্রাথমিক সূত্র জানতে হবে আর সেটা হলো দুই কত প্রকার ও কী কী। অতি ছোট করে বলতে গেলেও বলতে হয় যে, দুই হলো দুই প্রকার : আল্লাহর দুই এবং মানুষের দুই। আল্লাহর দুই এক, অখণ্ড এবং একক। মানুষের দুই অনেক, খণ্ডিত এবং এককতা নাই। মানুষের দুই বহু রচিত হয়েছিল, হয়েছে, হয় এবং হতে থাকবে। মানুষের দুই অসম্পূর্ণ, অপূর্ণ তথা কোনো অবস্থাতেই পরিপূর্ণতা থাকে না। আজ তোমাদের অসম্পূর্ণ দুইটি পূর্ণ করে দেওয়া হলো তথা আল্লাহকে কেমন করে লাভ করতে পারবে তার পূর্ণতা দান করা হলো ॥ এখানে ‘তোমাদের দুই’ বলা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, এখানে আল্লাহর দুইয়ের কথা বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে, ‘তোমাদের দুইকে আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম।’ এ রকম কথা ভগবান কৃষ্ণ, হজরত ইসাও তাঁদের অনুসারীদেরকে বলেছেন। এ বিষয়টির

বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী রচিত মসজিদ দর্শন নামক বইটি এবং অধর্মের রচিত সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইটির ওর্থ খণ্ড পড়ে দেখতে পারেন। সব রকম দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং দুই বলতে কী বুঝায় তার ব্যাপক এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা জেনে নিলে ভালো হয়। ধর্মীয় বিষয়গুলো বুঝে নিলে কিছুটা সহজ হয় বৈকি। দুই বলতে ইসলামি পরিভাষায় কেবল ধর্মকেই বোঝানো হয় নি। বরং দুই বলতে একটি সম্পূর্ণ জীবন-বিধান এবং-দর্শনকে বুঝানো হয়েছে বলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে করতে চাই। তবে কেউ যদি আরও অন্যকিছু বুঝতে চায় তো সেটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার এবং গবেষণা করার পূর্ণ স্বাধীনতা। তবে কিছু ইসলাম-গবেষক বোঝাতে চান যে, আগের সকল প্রকার ধর্মগুলো বাতিল বলে গণ্য করা হলো। এই অর্থটি গ্রহণ করে নিতে পারলাম না এই জন্য যে, মহানবি দুইনটিকে পরিপূর্ণ করে দেবার কথা বলেছেন। যাহা অসম্পূর্ণ তাহাকে পূর্ণ করা যায়। যাহা বাতিল তাকে পূর্ণ করার প্রশ্নই ওঠে না, বরং ফেলে দিতে হয়। অর্ধকলস জলকে ভরে পূর্ণতায় আনতে হয়। অসম্পূর্ণ বিল্ডিংটিকে পূর্ণতা দান করা যায়। কিছু যে-বিল্ডিং অতি পুরাতন, জীর্ণ এবং বাস করার মোটেই উপযুক্ত নয়, উহাকে ডেঙে ফেলতে হয়। সুতরাং পূর্ণতা তাকেই দেওয়া হয় যাহা অপূর্ণ অবস্থায় আছে।

পবিত্র কোরান-এ নফসের কথাটি অনেকবার বলা হয়েছে, কিছু অপ্রিয় সত্য কথাটি হলো এই যে, নফসকে কোরান-এ কোথাও আত্মা বলে নি। আমরা বুঝবার জন্য নফসটিকে আত্মা নাম দিয়ে থাকি, তাও আবার জীবাত্মা। কারণ সকল জীবের মাঝেই কমবেশি নফস আছে। এক মানুষ এবং জিন ছাড়া আর

কোনো জীবের বেলায় নফসকে মাত্র একটিবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে বলা হয় নি। অন্যান্য জীবের মাঝে নফস আছে, তবে সেইসব নফসের উপর সে রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, যে রকম মানুষ এবং জিনের নফসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষ এবং জিনের নফসের চলাফেরার পাই-পাই করে হিসাব নিবার কথাটি আছে, কিন্তু অন্যান্য জীবের বেলায় এসব কিছুই বলা হয় নি। অন্যান্য জীবেরা না বেহেশতে যাবে, না দোজখে যাবে। তবে সব বিষয়েই একটি বিশেষ দিক এবং বিশেষ ব্যতিক্রম আছে। তাই আমরা সূরা কাহাফে বর্ণিত সাত ওলির সঙ্গে কুকুর কিহ্মিরেরও বেহেশতে যাবার কথাটি জানতে পারি। কেন কুকুর বেহেশতে যাবে (?) বলে আমাদের যদি কেউ প্রশ্ন করেই বসেন তো আমি সোজা বলে দেব যে, ইহার কারণ এবং ব্যাখ্যাটি আমার জানা নাই এবং ইহার রহস্যটি বুঝতে পারিলাম না। যেহেতু জীবকুলের নফসের কোনো বিচার হবে না, পুরস্কার এবং শাস্তির প্রশ্নে বর্ণনার সম্পূর্ণ বাহিরে রাখা হয়েছে বলে ফারুক আজম হজরত ওমর (রা.) নামাজের পর আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠিয়ে কঁদে কঁদে বলতেন যে, এই মুসলিম জাহানের আমানতদার, খাদেমের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বার বার যে ভয়টি হয় তা হলো, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় একটি ছাগল পানির পিপাসায় কাতর হয়ে চিৎকার দেয় তো আমি ইহার কী জবাব দেব? (সুবহান আল্লাহ)! আর আজ মুসলিম দেশগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন তো! আমাদের কর্মফলে কী-বা আশা করতে পারি, আর কী-বা পেতে পারি? যে-জাতি তার নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন না করে সেই জাতির ভাগ্য আল্লাহ পরিবর্তন করেন না (কোরান)। যে ইসলামে ব্যক্তিমানিকানার বিন্দুমাত্র স্থান নাই, আছে ব্যক্তি-আমানতের কথা সেই আমানতটি আমরা কি বার বার খেয়ানত করছি না?

কেন আজ মুসলিম জাতির উপর ঠাটা (বজ্রপাত) পড়ছে? (শেকোয়াহ : আল্লাম্মা ইকবাল)। মানুষ এবং জিনের নফসই জাগ্রত নফস। কারণ এই দুইটি নফসের সঙ্গেই রুহ (আল্লাহ) থাকেন। রুহ ডাইরেক্ট তথা সোজাসুজি আল্লাহর খাস জাতপাক হতে আগত। তাই রুহকে আল্লাহর হুকুম বলা হয়েছে (সূরা হিজর)। সোজা কথায়, স্বয়ং আল্লাহপাক রুহরূপে প্রতিটি মানুষ এবং জিনের সঙ্গে অণুরূপে জড়িয়ে আছেন। অণুকে যেমন খালি চোখে দেখা যায় না, তেমনি জাতরূপী রুহকে দেখা যায় না। তাই যাতে আমরা সামান্য ভুল, সামান্য সন্দেহ না করে বসি তার জন্য কোরান-এ সোজা বলে দেওয়া হয়েছে যে, ‘আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি।’ তাই বাংলার সুফিসম্প্রদায়, মরমিসম্প্রদায়, বাউলসম্প্রদায় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গানের ভাষায় বলে গেছেন যে, তুমি এত কাছে থেকেও মনে হয় যেন লক্ষ যোজন দূরে আছো। আমরা জানি যে, মাতুলানা জালালউদ্দিন রুমি তাঁর রচিত বিখ্যাত মসনভি শরিফে লিখে গেছেন যে, কোরান-এর মগজটি (আসল বিষয়টি) নিয়ে গেছি আর হাড়গুলো মৌল্লাদের জন্য রেখে গেলাম। হজরত আমির খসরু এই রকম কথাটি না বললেও তাঁর রচিত দিওয়ান-এ আরও মারাত্মক, আরও উলঙ্গ কথাগুলো পাই। (সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে আমির খসরুর দুইটি ফারসি গানের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে)। হজরত বাবা বুল্লে শাহ পাজাবি ভাষায় এই একই রকম কথাগুলো গানের ভাষায় লিখে গেছেন। যদিও বাবা বুল্লে শাহ ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার কোনো ধার ধারতেন না, যার জন্য বাবা বুল্লে শাহকে মৌল্লারা যা-তা বলতো। অথচ মৌল্লাদেরকে কোনো গালাগালি না করে বলতেন যে, ‘ওদের কী দোষ! ওদের যে বুঝবার তকদির দেওয়া হয় নি।’ সিক্কুর শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই মারফতের রহস্যপূর্ণ কথাগুলো গানের ভাষায়

লিখে গেছেন এবং তিনি লালনের মতো নিজে গান গাইতেন। বাউল সন্ধ্যাট বাবা লালন শাহকে যদি বাংলার জালালউদ্দিন রুমি বলতে চাই তবে কি অন্যায় হবে! অথবা খুব বেশি বড় করে বলে ফেললাম কি? আমাদের কপাল এতই খারাপ যে, বিখ্যাত মসনডি শরিফের একটিও বাংলায় অনুবাদ কোনো পীর সাহেবের দরবার হতে আজও প্রকাশ করা হলো না। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো দেওবন্দি ফেরকাওয়ালাদের অখাদ্য-মার্কা মনগড়া অনুবাদটি বাজারে পাই। অথচ চমকে উঠি যখন দেখতে পাই যে, পশ্চিমা জগতের বহু পণ্ডিত অনুবাদ করে গেছেন। যেমন, ই. বি. ব্রাউন, রেয়ন্ড নিকলসন, জে. আর. আরবেরি আর আমেরিকার এক পণ্ডিত যিনি ওল্ড (পুরাতন) এবং নিউ (নূতন) ফারসি ভাষার উপর ডবল ডক্টরেট সেই এডউইন এনজেল সাহেব রুমির সমস্ত রচনাবলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন পনের খণ্ডে। এডউইন এনজেল নিজেই বলেছেন যে, তিনি হুবহু অনুবাদ করে গেছেন। পনের খণ্ডের দাম বাংলাদেশি টাকায় একত্রিশ হাজার টাকা। ঠিকানা : নেভিট আরজিন উইমেন্স চাইল্ড ওমেন্স পাব.। ২৫৬ ডেরো রোড, নিউ লেবানন, নিউইয়র্ক-১২২২৫-২৬১৫, আমেরিকা)।

আমার বাড়িতে প্রায়ই এক বৃদ্ধ পীর সাহেব আসেন। আসেন আমার কাছে আবার মুরিদ হবার জন্য। বৃদ্ধটি খুবই সরল-সহজ এবং বড়জোর হাজার খানেক মুরিদ আছে। ফরিদপুরের এক অজপাড়াগাঁয়ে তাঁর খানকা। আমাকে একটি কাঁসার গ্লাস উপহার দিয়েছেন। তাতে উনার নাম-ঠিকানাটি খোদাই করে লিখা আছে। লিখা আছে অমুক বিশ্বদরবার শরিফ এবং উনার নামের আগে সুফিসন্ধ্যাট। কোনো কিছু বলার ভাষাটি ব্যবহার করলাম না। তাঁর সরলতার জন্য। মনে মনে ভাবলাম, বিশ্ব আর সুফিসন্ধ্যাট শব্দ দু'টোর মারাত্মক ভাইরাসে আমাদের পেয়ে

বসেছে। বগুড়ার গাবতলীর দুর্গাপুর নামক গ্রামের এক পীর সাহেব, যাঁর বয়স বড় জোর আমার ছোট ছেলের সমান হতে পারে, তাঁর দরবারের নামগু বিশ্বদরবার শরিফ আর উনিগু নামের আগে সুফিসম্মাট লিখেন। কী বলবো? মনে পড়ে গেল আমার নানির কথাটি। নানির বাড়ি কেরানীগঞ্জ উপজেলার চরাইল নামক গ্রামে। নানার বাড়ি চুনকুটিয়াতে। চরাইল আর চুনকুটিয়া গ্রামের দূরত্ব খুব বেশি হলে দুই কিলোমিটার। নানির নাম সদুপা বিবি আর নানার নাম আবদুর রাজ্জাক। বড় মামা ধানমণ্ডির উনিশ নম্বর রোডে বিশাল বাড়ি বানিয়েছেন। বিরাট ধনী এবং উচ্চশিক্ষিত। নাম আবুল কালাম আজাদ। মামি এরশাদের আমলে মহিলা সংসদ সদস্য ছিলেন। নাম উম্মে কুলসুম সালসাবিল। চুনকুটিয়া হতে ধানমণ্ডির দূরত্ব অনুমান সাত-আট কিলোমিটার। নানি প্রায়ই বড় মামার বাসায় ছেলেকে দেখতে যেতেন। সঙ্গে সব সময় এই অধম বড় নাতি। অন্য নাতির সঙ্গে যাবেন না, তাই আমাকে যেতে হতো। বাহন রিকশা। বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে সদরঘাট। রিকশা নিলাম। যাচ্ছি ধানমণ্ডি। কিছু দূর যাবার পর নানি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘ওই জাহাঙ্গীর, দুনিয়াটা কত বড় তাল করছো?’ আমি বললাম, ‘নানি তুমিই বলো না দুনিয়াটা কত বড়।’ নানি ধমক দিয়ে বললেন, ‘দুনিয়াটা কত বড় তা তুমি কী বুঝবি? দেখ, কই (কোথায়) চরাইল, কই চুনকুটিয়া আর কই ধানমণ্ডি ॥ দুনিয়াটা কত বড়, আর ফুরায় না।’ আমি অবাক হলাম, কিন্তু বললাম, ‘তুমি ঠিক বলেছ।’ এইসব পীর সাহেবদের বিশ্বটা বুঝি আমার নানির অভিজ্ঞতার মতো। আর সম্মাটের বিষয়টা আমার অভিজ্ঞতার জীবনে ধরা পড়ে নি বলে কিছু বলতে পারলাম না।

রুহ যখন নফসটিকে গ্রাস করে ফেলে, চাঁদকে গ্রাস করার মতো, সূর্যকে গ্রাস করার মতো ॥ তখন নফসের আর বিদুমাত্র কর্তৃত্ব থাকে না। সাপ যেমন ব্যাঙ গিলে ফেলে, সে রকম রুহের পেটে নফসের অবস্থানটির পরিণতি হয়। তখন নফস আর রুহকে পার্থক্য করার আর কোনো অবকাশ থাকে না, তখন সেই অবস্থায় বান্ধাও থাকে না, প্রভুও থাকে না। প্রশ্ন আসতে পারে, তা হলে কে থাকে? সবই তখন একাকার হয়ে যায়, প্রভু আর গোলাম থাকে না। আশেক আর মাস্তক মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই চরম পর্যায়ে উপনীত হবার জন্য সুফি কবি আল্লামা ইকবাল খুদি হতে খান্নাসকে তাড়াবার আশ্রয় জানিয়েছেন বার বার, খুদিকে তাড়াতে বলেন নি। অনেকে ভুল করে খান্নাসের সঙ্গে খুদিকেও তাড়িয়ে দেয়, খুদিকেও ফেলে দেয়, খুদিকেও ঘৃণা করতে শেখায়, কিন্তু রুম্মির ভাবশিষ্য সুফি কবি আল্লামা ইকবাল যে কত চরম পর্যায়ের কথাটি, সুফিদর্শনটি বলে গেছেন উহা সুফিবাদের ঝানু গবেষকেরাও ধরতে না পেরে উল্টাপাল্টা মন্তব্য করে বসেন। খুদি আর খান্নাস যে মোটেই এক কথা নয়, বরং আকাশ-পাতাল পার্থক্য সেটা অনেকেই ধরতে পারেন না। তাই সুফি কবি ইকবাল লিখে গেছেন, না তু জাম্বিকে লিয়ে হ্যায়, না তু আসমাকে লিয়ে, জাঁহা হ্যায় তেরে লিয়ে, তু নাহি জাঁহাকে লিয়ে ॥ ‘এই পৃথিবীর জন্য তুমি নও, (এবং এমনকি) তোমাকে বেহেশতের জন্যও পাঠানো হয় নি। তোমার অবস্থানটি যেখানে, সেখানে সৃষ্টির রাজ্য নাই।’ আবার সুফি কবি ইকবাল বলছেন, যত কিছুই তোমার হাতের মুঠায় আসুক না কেন, যত উঁচুতেই তোমার অবস্থান হোক না কেন, তুমি ভুলেও থেমে যেয়ো না (মানজিল না কর কবুল) কারণ সেইখানেই তোমাকে যেতে হবে যেখানে কোনো রাজ্য আর থাকে না। সেই নাই মোকামেই তোমার ঠিকানা (ইয়ে হেকমতে

মালাকুতি, ইয়ে ইলমে লাহতি, হারাম কি দারুদ কা দারমা নাহি হ্যায় তো কুচ ভি ন্যাহি)। হজরত আমির খসরু বলছেন, ‘উঁচুতে উঁঠতে উঁঠতে অবশেষে দেখতে পেলাম, আমি লা মোকামে অবস্থান করছি। যেখানে কেবলই একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে, যেখানে কেবল সবাই একটিমাত্র মিলনক্ষেত্রে এক হয়ে গেছি আর সেই একটিমাত্র প্রদীপ, একটিমাত্র মাহফিলের নামটি হলো মুহম্মদ।’ ভালুকের হাতে খন্তা দিলে যা হয় ধর্মবাণীগুলোর অপব্যখ্যায় সেই পথেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম বলতে এরা কেবল অনুষ্ঠানটিকেই সব কিছু মনে করে। এর ভেতরে কিছু আছে কি না একটু ভেবে দেখার আশ্বহট্টুকু নাই। তাই ধর্মের অনুষ্ঠানগুলো হয়ে গেছে সমাজকেন্দ্রিক আর অনুষ্ঠানের রহস্যগুলো উন্মোচিত করাটা হয়ে গেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সুতরাং সব কথার শেষ কথাটি হলো, নফস হতে খাল্লাসটিকে বের করে দিয়ে আপনার ভেতরে যে রুহটিকে বীজরূপে দেওয়া হয়েছে সেই রুহকে জাগ্রত করে তোল, বীজ রুহকে বিরাট বৃক্ষে পরিণত করো, যে রুহ আল্লাহ পূর্ণমানবাকৃতির আদমের ভেতর ফুঁৎকার দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহ নফসটিকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন বলে সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও নাই। তাই কুল্লু রুহিন জায়েকাতুল মউত তথা ‘প্রত্যেক রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে’ এমন কথাটি সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও পাওয়া যায় না। অনেক কষ্ট নিয়ে, অনেক দুঃখ নিয়ে বলতে হচ্ছে যে, যারা রুহে হায়ওয়ানি তথা জানোয়ারের রুহ বলে থাকেন তারা রুহের কিছুই বুঝতে পারেন নি। রুহের রহস্যের কিছুই জানেন না। সুতরাং এই জাতীয় গবেষক এবং পীর সাহেব হতে যত তাড়াতাড়ি পারেন মুখটি ফিরিয়ে নিন এবং তওবা করে অন্যস্থানে মুরিদ হয়ে যান। বার বার বলছি, পীর বদলাতে থাকুন। কারণ পীর উপলব্ধি, আসল লক্ষ্যটি হলো

আল্লাহ। আর এই আল্লাহকে পেতে হলে আপন দেহ-মনের ভেতরেই পেতে হবে। দেহের বাহিরে যতই ডাকাডাকি করুন না কেন, আল্লাহকে পাবার বিধান আল্লাহ স্বয়ং রাখেন নি। এই মহামূল্যবান কথাটি সব সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে। কারণ খান্নাসরুপী শয়তান আপনাকে দেহের বাহিরে আল্লাহকে পাওয়া যাবে বলে বার বার ধোঁকা দিয়ে যাবে। যদি দেহের বাহিরেই আল্লাহকে পাওয়া যেত তা হলে কোনো ঠলিই আপনাকে পীর ধরতে এবং পীরের গুরুত্ব দিয়ে যেতেন না। হজরত জোনায়েদ বোগদাদি বলেছেন যে, যার পীর নাই তার পীর তো শয়তান। হজরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরি বলেছেন, পীর ছাড়া নিরাকার আল্লাহর কেমন করে ধ্যান করবো? নিরাকারকে সাকাররূপে দেখতে হলে পীরের মধ্যেই খুঁজতে হবে। কারণ পীর ছাড়া আল্লাহর প্রত্যক্ষ ঠিকানা নাই। আবার পীরের প্রয়োজন কেবলমাত্র মোকামে জাবরুত পর্যন্ত। তাই তো মোজাদ্দের আলফেসানি সিরহিন্দ বার বার তাঁর মুরিদদের বলে গেছেন যে, পীরে তাশত আউয়াল মাবুদ তাশত অর্থাৎ ‘তোমার পীরই হলো তোমার প্রথম মাবুদ।’ খেয়াল করুন, এখানে আখের মাবুদ তাশত তথা শেষ মাবুদ বলা হয় নি। কারণ শেষ মাবুদটি পীরের মধ্যে থাকে না, থাকার বিধান নাই। শেষ মাবুদটি পাওয়া যাবে আপন-আপন দেহ-মনে। সুতরাং আপন দেহখানি সব রহস্যের মূল (দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন)। এই রহস্যের মূলটিকে জানতে হলেই মোরাকাবার একটানা স্মরণের প্রয়োজন। স্মরণ মানে সালাত, স্মরণ মানে জিকির, স্মরণ মানে ধ্যানসাধনা। স্মরণ মানে আপনার মাঝে রূহরূপে আল্লাহর অবস্থানটিকে জাগিয়ে তোলা, উদ্ভাসিত করে তোলা। রূহকে জাগ্রত করতে পারলেই রূহ নফসের উপর প্রভুত্ব করে। নফস তখন কর্তৃত্বহীন, অকর্তা হয়ে পড়ে। নফস তখন চঞ্চলতা হারিয়ে প্রশান্তি লাভ করে, যাকে নফসে

মোতমায়েন্না বলা হয়। তখনই নফসের জিহ্বাটি রুহের জিহ্বাতে পরিণত হয়, নফসের চোখ দু'টি রুহের চোখে পরিণত হয়, নফসের হাত দু'টি, পা দু'টি, কান দু'টি তথা এক কথায় সর্বাস্থ রুহের দ্বারা পরিচালিত হয়। (বুখারি শরিফ)। তাই বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী কেবলমাত্র কাবা পুঁথির ভাষায় শত বছর আগে লিখে গেছেন,

প্রভুতে না প্রভু পাবে, পাবে পীর সনে।
 পীরেতে পাইবে কোথা পাবে নিজ তনে ॥
 কোথায় নিজের তন একতন তার।
 এক বিনা জগতেতে কোথা তন আর ॥
 তন মাঝে মন আছে মন মধ্যে ধন।
 সে ধনের কুঞ্জী তালা জানিবে স্বরণ ॥
 (নুরে হক গঞ্জে নুর)

বাবা বু আলি শাহ কলন্দের পীর ও মুর্শিদ বাবা শেখ ফরিদ বলেছেন, 'সমস্ত জীবনগুলো আমি, সমস্ত দেহগুলো আমি, সমস্ত বুদ্ধিগুলো আমি, আমিই প্রেমিক, আমিই মৌল্লা, আমিই বীরপুরুষ, আমিই বিচারক, আমিই মন্দিরের ব্রাহ্মণ, পুরোহিত।' আবার বাবা ফরিদ বলেছেন, 'যে রহস্যের সূর্য আমার মাঝে তা কেমন করে তুমি প্রদীপ দিয়ে দেখবে? যে মাটির দেহের মাঝে এই রহস্যের সূর্য তা খালি চোখে কেমনে বুঝবে?' হজরত বাবা শামসে তাব্রিজ বলেছেন, 'একের মধ্যে খাই, একের মাঝে ঘুমাই, একের মাঝেই দেখি। কারণ দুই দেখার কুয়াশা আমার কেটে গেছে।' বোস্তের সাগরে যার মাজার সেই হজরত বাবা হাজি আলি শাহ বলেছেন, 'তুমি চরম রহস্যটি কি বলতে চাও? তা হলে বলে দাও, আমি যেখানে আছি

সেখানে বান্ধাও নাই, আল্লাহও নাই, তুমিও নাই, তিনিও নাই’ অর্থাৎ পরম মহা-আম্মি নামক তৌহিদে ভাসমান। আসল লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ যদি দেখতে না পারেন, যিনি অতি সাধারণ বিষয় নফস আর রুহের সামান্য পার্থক্যটি করতে না পারেন, তিনি পীর হন কী করে? সামান্য বিবেক যদি থাকে তা হলে পীরের গদি হতে নেমে পড়ুন। এই জাতীয় পীরেরাই সুফিবাদের দর্শনের শরীরে পায়খানা-পেশাব করে দেয়। এদের কাছে মুরিদ হয়ে কিছু না পেয়ে মানুষ অবশেষে তবলিগের গাটি মাথায় নিয়ে মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়ায়। কথায় বলে, চুন খেয়ে মুখ পুড়লে দই দেখে ভয় পায়। আজ সমাজের বুক পীর-ফকির দিখে ভরে গেছে। তাই ওহাবি মতবাদ এরাই এদের আকাম-কুকামের দরুন খাল কেটে যেন কুমির নিয়ে আসছে।

তুমি বলো, আল্লাহ আহাদ। বলো, আল্লাহ ওয়াহেদ ॥ নাই। ওয়াহেদ হলো এক আর আহাদ হলো অখণ্ড তথা যাকে খণ্ডন করা যায় না। তথা খণ্ডিত কিছুই নাই। কোনো কিছুই মওজুদ নাই। এমনকি ধূলিকণাটিরও আলাদা মওজুদ (অস্তিত্ব) নাই। থাকলে ইহা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, এমনকি অনুপরমাণুরূপেও আলাদা মওজুদ থাকলে আহাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের দাবি করে বসতো। কিন্তু কারোই নিজের আলাদা মওজুদের তথা অস্তিত্বের দাবি করার নাই বলেই আল্লাহ বলছেন যে, তুমি বলো তথা বুঝতে শেখো তথা সেই জ্ঞানটি অর্জন করতে শেখো যে-জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পারবে যে, কোনো কিছুরই নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। ওয়াহেদ তথা এক বললে সবাই বুঝতে পারে। কারণ বিষয়টি অনেকটা সহজ। তাই যাহা বুঝতে সহজ সেই ওয়াহেদ তথা এককে বুঝতে গিয়ে এখানে ‘বলো’ শব্দটি ব্যবহার না করে আহাদকে বুঝে নেবার জন্য ‘বলো’ শব্দটি ব্যবহার

করা হয়েছে। আল্লাহর ওয়াহেদ তথা একের রূপটি বোঝা যত সহজ তিক ততটুকু কঠিন আহাদ তথা অখণ্ডরূপটি বোঝা। আহাদকে বুঝতে চাইলে ধ্যানসাধনার গবেষণা করতে হবে। রোগের জীবাণু ধরতে চাইলে গবেষণার ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে। সেই ল্যাবরেটরি যত বড়ই হোক আর যত ছোটই হোক না কেন, গবেষণার আগ্রহ থাকলে আপনাকে প্রবেশ করতেই হবে। সুতরাং আহাদ বললেই আহাদরূপটির আসল পরিচয় জানা যায় না, যতক্ষণ না নির্জনে ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি করা হয়। এই আহাদরূপের পরিচয় জানবার জন্যই মহানবি তাঁর উম্মতদেরকে হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনাটি করে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তা না হলে মহানবি আদমের জন্মের অনেক আগেই নবি ॥ এটা অধমের কথা নয়, বরং হাদিসের বাণী। অবশ্য এই হাদিসের বাণীটি শুনে ওহাবিদের মোচড়ানুচরি (গাব্রদাহ) শুরু হয়ে যায়। যেমন সূরা কাহাফে খিজিরকে মুসা বুঝতে পারবেন না শুনে ওহাবিদের মোচড়ানুচরি শুরু হয়ে যায়। কারণ কোরান-এর কথা না পারে ফেলতে, না পারে গিলতে। এ রকম অবস্থাতে সবাই কমবেশি গোঁজামিলের আশ্রয়টি নেয়। ইহা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদেরই কথা। যেমন আরেকটি সামান্য উদাহরণ তুলে ধরি : কোরান বলেছে যে, হৃদহৃদ পাখিটি নবি হজরত সোলায়মানের মুখের উপর ঠাস করে বলে দিল যে, হৃদহৃদ পাখিটি যা জানে তা নবি সোলায়মান জানেন না। অথচ হৃদহৃদ পাখিটি যতই মর্যাদাশীল পাখি হোক না কেন, তাকে তো নফস দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রুহ দেবার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তা হলে কেমন করে এ রকম কথাটি বলতে পারে? অধমকে প্রশ্ন করলে সোজা বলে দেব, এই প্রশ্নের উত্তরটি আমার জানা নাই। কেন জানা নাই? যা জানি না তা জানার ভান করতে চাই না। কারণ কোরান-এর ব্যাখ্যা কতখানি বিশাল হতে

পারে যে দুনিয়ার সব পানি ও গাছ, কালি ও কলম হলেও শেষ করা যাবে না ॥
এটা তো কোরান-এরই কথা, অধমের নয়। তা হলে জ্ঞানি না বলার মাঝে কি
কোনো অপরাধ খুঁজতে চান? আল্লামা ইকবাল কোনো এক সেমিনারে বলে
ফেলেছিলেন যে, আলেমদের কোরান-তফসিরগুলো দেখে আল্লাহ, নবি আর
ফেরেশতারা তাক্তব হয়ে গেছেন।

ভূমিকাতে কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে টাচ (স্পর্শ, ছোঁয়া) দিয়ে যাই। তবে অনেক
সময় কিছুটা বেশি হয়ে যায়। বেশি হলেও কিছু করার থাকে না। আমি জ্ঞানি,
আমার লিখা অনেকের কাছে ভালো লাগবে। কিছু লোকের কাছে খুব ভালো
লাগবে। কিছু লোকের কাছে এতই ভালো লাগে যে, বইগুলো পড়ার পর ছুটে
আসেন আমাকে দেখার জন্য। কেবল বাংলাদেশ থেকে নয়, ইউরোপ, আমেরিকা
আর অস্ট্রেলিয়া হতেও আসেন। পাঠক বাবা-মায়াদের কাছে যদি ভালোই লেগে
থাকে এবং মনে করেন যে, বইগুলোর ব্যাপক প্রচার করা উচিত তা হলে
আমাদেরকে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন। অথবা আপনাদের কোরবানির পণ্ডর
চামড়ার মূল্যটি দান করতে পারেন। কারণ পণ্ডর চামড়ার টাকা খাওয়া নাজায়েজ
এবং আমাদের জন্য ডবল নাজায়েজ।

পাঠক যাই মনে করুন না কেন, খুব কষ্ট পাই একটি কথা বার বার মনে
করে। আজ হতে ঠিক ত্রিশ বছর আগের কথা। আমি তখন জিনজিরা বাজারের
ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম পাশে হোমিও ডাক্তারি করি। এত রোগী হতো যে, এগারো
জন সহকারী নিয়েও পেরে উঠতাম না। এটা এখনও এলাকাবাসীর সবার মুখে মুখে
ফিরে। সকাল আটটায় ডিসপেনসারি খুলতাম আর রাত আটটা পর্যন্ত একটানা
ডাক্তারি করতাম। দুপুরে প্রায়ই খোদাবক্সের হোটেলে ভাত খেতাম অথবা ইব্রাহিম

চৌধুরীর ছেলে আজহারের বাসায় খেতাম। প্রতিদিন পনের-বিশ হাজার টাকা কামানোট্টা ছিল একটা মামুলি ব্যাপার। সেই সময় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। সদরঘাট টার্মিনালে এবং কমলাপুর রেল স্টেশনে প্রতিদিন পঁচিশ-ত্রিশজন না খাওয়া মানুষের লাশ পড়ে থাকতো। আমার ছুটির দিন ছিলো শনিবার। ছয় দিনের কামানোট্টা টাকা (সংসারখরচ বাদে) ব্যাগে ভরে এক সপ্তাহ সদরঘাটের টার্মিনালে অন্য সপ্তাহে কমলাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে প্রতিজনকে বসিয়ে একশত টাকা দিতাম। খুব সংক্ষেপে বলছি। আমার স্বী বোকেয়া বেগম বাবা ভাণ্ডারীর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। আমার বাড়ির কিছু দূরে এক হিন্দু ভদ্রলোক ষোল বিঘা জমি মাত্র চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করবেন বলে সেই জমি আমার স্বীকে দালাল নিয়ে দেখালো। আমার স্বীর খুব পছন্দ হলো এবং জমি কেনার জন্য খুব অনুরোধ করলো। স্বী বললেন, ‘জানি, তুমি একদিন কোরান তফসির লিখবে এবং বইও লিখবে। তোমার লিখা বিশাল কোরান-তফসিরটি ছাপাতে অনেক টাকা লাগবে তাই এই জমিটুকু আমার কথায় কিনে রাখো। সব কিছু আমি করবো। তুমি শুধু টাকাটা আমাকে দাও।’ আমি স্বীকে বললাম, ‘যদি একশত টাকা করে দান করি তা হলে চারশত অনাহারী মানুষগুলো তিন-চারদিন খেয়ে বেঁচে থাকবে এবং দেয়া করবে।’ এই কথা শুনে স্বী আমতা আমতা করে বললো, ‘যেদিন তুমি কোরান-তফসিরে হাত দেবে তখন এই জমির দাম এক কোটি টাকা হবে। যদি তোমার আগে মারা যাই তো আমি জানি আমার কবরটি তোমার বাড়ির উঠানেই দেবে এবং খুব সুন্দর করে পাকা করে গিলাপ দিয়ে রাখবে। আরও জেনে রাখো, তুমি টাকার অভাবে তখন আমার কবরে এসে কাঁদবে এবং অনেক কিছু আবোল-তাবোল কথা বলবে। কারণ কঠিন বাস্তবের আঘাত তুমি কোনোদিন খাও নি বলে আমার কথা মূল্য

দিচ্ছে না।’ নিয়তির কী নির্ভন্ন লিখনী! আজ এই মুহূর্তে সেই জন্মির দাম হলে সাড়ে ছয় কোটি টাকা। যখন পাঠক বাবা-মায়াদের কাছে ভিক্ষা চাই তখন স্বীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শুধু একটি কথাই বলি যে, ‘তোমার কথাই ঠিক, এখন হলে চার হাজার মানুষ না খেয়ে মরলেও আমি ফিরেও তাকাতাম না।’ যখন আপনাদের কাছে সাহায্য চাই, কোরবানির চামড়াটির দাম চাই, তখন মনে হয় আমি যেন ত্রিশ বছর আগের না-খাওয়া মানুষটির মতো চাইছি। আমার ঠুনকো অঙ্গীকার ॥ এই কচুরি পানায় ভরা বিশাল দিঘিটার মধ্যে কয়টি ঢিল ছুঁড়ে মেরে একটু সুফিবাদের ক্ষুদ্র বৃত্ত তৈরি করে যাওয়া। আমি জেনে শুনে বিষপান করলাম। কারণ কোরান-এর সেই পবিত্র বাণীটি সেই বয়সে মনে থেকেও মনে ছিল না। আর সেই বাণীটি হলো, ‘তোমার হাত এত বেশি প্রসারিত করো না যে গরিব হয়ে যাও, আবার এত বেশি সঙ্কুচিত করো না যে, কৃপণের তালিকায় নামটা লেখা হয়ে যায়।’ (হবহ নয় ভাবার্থ)।

ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর বংশধর নবাব হাবীবুর রহমান কালের চক্রে যখন গরিব হয়ে যান, তখন সেই দিনের দামি ব্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিনের কোঁটায় পঞ্চাশটি সিগারেট কিনে খাবার সামগ্র্যটি হারিয়ে ফেলেন। কারণ জীবনভর এই দামি সিগারেট খেয়ে আসছেন। সহসা চকবাজারের মিঠাকড়া রেলওয়ের বাঁচালিত ইঞ্জিন-মার্কা তামাক হক্কায় ভরে টানার অভ্যাসটি মোটেই ছিল না। একদম নূতন একটি অবস্থার মুখোমুখি হওয়াতে অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে উর্দু ভাষায় ফরিয়াদ করলেন, আয় আল্লাহ, তু গরিব কে আমার বানা দে, ইসমে মেরা কোই শেকোয়া নাহি, মাগার ইয়ে ফরিয়াদ হ্যায়, যো আমার হ্যায় উসকো গরিব বানানে কি আগ মে মওত দে

দে, কিঁউ উয়ো আম্মির চালনে নেহি সাকে গা। ‘ওগো আল্লাহ, তুই যে গরিব তাকে ধনী বানিয়ে দে, এর মধ্যে আমার কোনো আপত্তি রইলো না, কিছু আপত্তি রইলো ॥ যে ধনী তাকে গরিব বানাবার আগে মৃত্যু দিয়ে দিয়ে। কারণ ওই ধনী লোকটি আর চলতে পারবে না।’ তবে এটাও সত্য যে, যিনি জেনে শুনে ধনসম্পদ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় গরিবিকে বরণ করে নেন সেটা আলাদা কথা। জ্ঞানীদের জন্য ইঙ্গিতটিই যথেষ্ট বলে মনে করি। কারণ সব কিছু আর ভেঙে বলতে হয় না। ওহাবিরা যদি সঠিক স্থানে, সঠিক পথে, সঠিক আদর্শে কোরবানির চামড়াটি দান করতে পারে তো সুফিবাদে বিশ্বাসীরা কি কোনোদিন পারবে না? কেবল একটু বুঝিয়ে দিলেই হলো।

খনার একটি বচন মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, তেলের দাম আর ঘিয়ের দাম এক হয়ে গেলে অমঙ্গলের লক্ষণ। শুকনো মরিচের চেয়ে কাঁচা মরিচের দাম বেশি হলে অরাজকতার লক্ষণ। সালাত আর সিয়ামকে ফারসি ভাষায় নামাজ-রোজা বলা হয়। নামাজ-রোজা বললে সোয়াবের পাল্লাটি ভারী হয়ে যাবার ফতোয়াটি এখনও দেওয়া হয় নি। তবে ‘খোদা হাফেজ’ বলার চেয়ে ‘আল্লাহ হাফেজ’ বলাতে অনেক বেশি সওয়াব ॥ এই ফতোয়াটি দৈনিক খবরের কাগজেই বেরিয়েছে, তাও আবার আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের মাওলানার মুখে। অনেক বই লিখেছেন এবং জাঁদরেল বাহাস করার যাহার অনেক ক্লমতা। ওহাবিরা যম্মের মতো ভয় করে। সাহসেরও তুলনা হয় না। শত শত ওহাবি আকিদার মোল্লাদের তওবা পড়িয়ে ছাড়েন। প্রচুর উনার পড়াশুনা। সেই উনিই যখন খোদা হাফেজ বলার চাইতে আল্লাহ হাফেজ বলাতে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে বলে ফতোয়া দেন, তো লজ্জায় আর কিছুই বলার থাকে না। শত শত বছরের চালু ‘খোদা

হাফেজ' এক ফুঁৎকারে বাংলাদেশ হতে বিদায় নিলো। ভাবলাম, লাউ মানে কদু। তবে বেশি সওয়াব পাবার কথাটি শুনে চিন্তায় পড়ে গেলাম। মাওলানা রুমি তাঁর সমগ্র রচনাবলিতে খোদা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, খোদা শব্দটি ব্যবহার করেছেন হাফেজ সিরাজি, আল্লামা জামি, ওমর খৈয়াম, সানায়ি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, খাজা গরিব নেওয়াজ, বু আলি শাহ কলন্দর, আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি, সুফি কবি আল্লামা ইকবাল, মির্জা ফারাক্কাবাদি, নাজা শোলাপুরি, আনওয়ার বেহজাজ, কাতিল সাফায়ি, আরজু শাহারানপুরি, সানজার গাজিপুরি, বেদম ওয়ারসি, শাকিল বাদায়ুনি এবং আরও অনেকে। তা হলে এত বড় বড় ওলিরা এবং কবিরা কি জানতেন না যে, আল্লাহ হাফেজ বলার মধ্যে বেশি সওয়াব? আসলে মনে হয় এটা যুগের হাওয়া, আধুনিকতার নূতন বাতাস। একঘেঁয়ে হয়ে ওঠা ভালো লাগে না বলে পানিকে জল বলার মতো। এই ক্ষুদ্র বিষয়টা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাতাম না, যদি বেশি সওয়াব পাবার কথাটি জুড়ে না দেওয়া হতো। দার্শনিক আর মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেই একটি মনে রাখার মতো কথা বলে থাকেন আর সেটা হলো, প্রতিভাকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় : একটি হলো অনুসরণ আর অনুকরণের প্রতিভা। এ রকম প্রতিভাবানরা চমৎকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ আর তুখোড় সেমিনার বা যে কোনো স্থানের বক্তা হয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে পারেন অনেক রকম রেফারেন্স তুলে। আরেকটি হলো নূতন কিছু সৃষ্টি করার প্রতিভা, জগতে নূতন কিছু দিয়ে যাবার প্রতিভা। এরাই ব্যতিক্রম, এরাই বৃত্তের বাহিরে অবস্থান করেন, এরাই সমাজের অন্য দশজনের মতো নয় ॥ বরং দশের বাহিরে সম্পূর্ণ আলাদা সৃষ্টিশীল প্রতিভা। সৃষ্টিশীল প্রতিভা অনেক রকম বাধাবিলম্বের মুখোমুখি হয়, অনেক রকম সামাজিক যাতনা সহ্য করতে হয় ॥ মানুষের ইতিহাস

এ রকম কথাটি বার বার বলে যায়। অনুসরণ আর অনুকরণের প্রতিভা যতটুকু আরাম আয়েশে থাকে, সৃষ্টিশীল প্রতিভাটির ভাগ্য তিক এর বিপরীত। লালনগীতির গবেষক হওয়া এক বিষয় আর লালনগীতি রচনা করাটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। অবশ্য উভয় প্রতিভাই সমাজের ভারসাম্যটি বজায় রেখে চলেছে।

কেমন করে মোকাম্বে লাহতে ঢোকা যায় তথা লা মোকাম্বে প্রবেশ করা যায় তথা আল্লাহর ঘরে অবস্থান করা যায় সেই বিষয়টি খুব সামান্য আলোচনা করতে চাই। আলোচনার আগে গুরু নানকের সাধনার জীবনের একটি ঘটনা বলছি। গুরু নানকের গুরু বা পীর সাহেব হলেন হজরত বাবা বাহালুল দানা। বাবা বাহালুল দানার কথাগুলো আমিত্তের গোপনে লুকিয়ে থাকা অতি সূক্ষ্ম আমিত্তটিকে নাড়া দিয়ে ওঠায়। শুনলে চমকে উঠি। বিবেক খরখর করে কাঁপতে থাকে। যেন মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কথাগুলো বলে দিচ্ছেন। গুরু নানক তাঁর পীর সাহেবকে বলছেন, ‘বাবা, ধ্যানসাধনার মোরাকাবায় আমি মোকাম্বে জাবরুতেই ঘোরাফিরা করছি। মোকাম্বে জাবরুত হলো শক্তির মোকাম। শত চেষ্টা করেও আমি লাহত মোকাম্বে যেতে পারছি না। আমার এখন কী উপায়?’ বাবা বাহালুল দানা বললেন, ‘বৎস! মাত্র একটি সূক্ষ্ম পর্দা এখনও বাকি আছে। ইহা ছিন্ন করতে পারলেই লাহত মোকাম্বে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবে।’ গুরু নানক বললেন, ‘বাবা, সেই সূক্ষ্ম পর্দাটির নাম কী?’ বাবা বাহালুল দানা বললেন, ‘তোমার নফসের একটি ক্ষুদ্র অংশ চায় যে, তোমার নামটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাক ॥ জেনে রাখো, ইহা একটি পর্দা। তোমার নাম দুনিয়ার অনেকে জানুক ॥ জেনে রাখো, ইহা একটি পর্দা। তোমাকে নিয়ে দুনিয়ার মানুষ প্রশংসায় ধন্য ধন্য করুক ॥ জেনে রাখো ইহা একটি পর্দা। এই পর্দাগুলো ছিন্ন করতে পারলেই তুমি অনায়াসে লাহত

মোকামে প্রবেশ করতে পরবে। লাহত মোকামে প্রবেশ করলেই তোমার রঙ-রূপ সব কিছু একদম বদলে যাবে।’ গুরু নানক বললেন, ‘কী রকম?’ ‘উহা মৌখিকভাবে বর্ণনা করলেও, বৎস, উহা বুঝতে পারবে না। সুতরাং ধ্যানসাধনাটি আরও কিছুদিন চালিয়ে যাও।’ গুরু নানক প্রশ্ন করলেন, ‘বাবা, অনেক গুলিদের নাম তো স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে, তা হলে?’ গুরু নানক বললেন, ‘উহা আল্লাহর তরফ হইতে, কিছু আপন নফসের তরফ হতে নহে।’ (খাম্বা অমৃত)।

বিখ্যাত গুলি, যার নাম তাজকেরাতুল আউলিয়া-তে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই হজরত দাউদ তায়ি বলেছেন, ‘অনেক পড়াশুনা করেছি, অনেক গুলিদের বাণী শুনেছি এবং আল্লাহকে পাবার পথটি চিনতে পেরেছি। সুতরাং এখন কেবল হেঁটে যেতে হবে আপন গন্তব্যস্থলে। বই পড়ার উপদেশবাণীর প্রয়োজন মিটে গেছে। কারণ এগুলো এখন কাঠ দিয়ে বানানো মেকি পা। এই কাঠের পায়ে ভর দিয়ে গন্তব্যে যাওয়া যায় না।’ তাই বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী পুঁথির ভাষায় বলেছেন,

দলিল কাঠের পাও চলা মহা দায়।

পদ বিনা কাঠপদে কোথা চলা যায় ॥

(নুরে হক গজে নুর)

ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার সময় বই পড়া হারাম। কারণ ধ্যানসাধনাটি বই-পড়া জ্ঞান নয়, বরং সম্পূর্ণ উল্টা বিষয়। ধ্যানসাধনার সময়ে চোখ বন্ধ করে করতে হয় আর লিখাপড়া করতে হলে চোখ খুলে পড়তে হয়। চোখ-খোলা আর চোখ-বন্ধ দু’টো জ্ঞান অর্জন দুই রকম। সুতরাং মারফতের জ্ঞান চোখ খুলে অর্জন করা যায় না। যারা এ রকম কথা বলে তাদের মারফতের প্রাথমিক জ্ঞানটির ধারণা নাই। এই বিষয়টি একদম পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য

আজ হতে শত বছর আগে বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী পুঁথির ভাষায় বলে গেছেন,

ওস্তাদে শিখায় বিদ্যা নিরখিয়া দেখ,
মোরশেদ কহেন, বাপু চুক্কু মুদে থেক ॥
চক্কুবক্ক বিদ্যা এই খুলিলে কী হবে?
খোলাজন এই ভেদ কভু নাহি পাবে ॥
(নূরে হক গঞ্জে নূর)

এই জন্য বড় বড় ওলিরা ধ্যানসাধনার সময়ে কোনো প্রকার বই পড়াটিকে হারাম বলেছেন। হজরত আমির খসরু ভালো করেই জানতেন যে, লা মোকাম্মে প্রবেশ করতে হলে একবিন্দু আমিত্ত্ব থাকা চলবে না। তিনি সঙ্গীত জগতে বিশেষ করে ভারতীয় সঙ্গীতে আড়াই হাজার রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি সেতার নামক বাদ্যযন্ত্রটির আবিষ্কারক। তিনি কাণ্ড্যালির জনক। তবলার সংস্কারক। তাঁর পীর মাহবুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়াকে ছেড়ে কোথাও যান নি। তিনি বলতেন, ‘আমার পীরকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না এবং বিয়ে করলে যদি নফসের দুর্বলতায় স্বীকে ভালোবেসে ফেলি, তাই বিয়েও করবো না।’ তাই ফারসি ভাষায় একটি অতি পরিচিত সঙ্গীতে আমির খসরু নিজেই বলেছেন যে, খসরু লা মোকাম্মে যাবার রহমত লাভ করেছেন।

কত কষ্ট করে একটি মোরাকাবার আভার প্রাইমারি স্কুল খুলেছি। একটি নির্জন অজপাড়াগায়ে। নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামের রফিক মোক্তার সাহেবের বাড়িতে। চারদিক ছয় ফুট টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে সাধকদের আরও নির্জনতা দেওয়ার জন্য। সাধকদের জন্য

মোলটি টিনের ঘর তৈরি করেছি। মেয়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তিনটি ঘর। তারপরও বলতে হচ্ছে যে, মাত্র চল্লিশটি দিন সাধনায় বসার কথা বললে অনেক মুরিদের মোচড়ানুচড়ি (করবো কি করবো না) উঠে যায় এবং এটা-সেটার দোহাই দিয়ে পার পেতে চায়। দুঃখ করে বলি, তোমাদের চেয়ে যারা তবলিগ করে তারা অনেক ভালো। অনেক সময় অভিমানে বলেই ফেলি যে, আর কত কাল ‘বাবা, বাবা’ ডাকবে অথচ পাবে না কিছুই। আসো, মাত্র তিনটি মোরাকাবা করো এবং যদি কিছু না পাও তো আম্মায় ফেলে দিয়ে অন্য গুরু ধরো। এত বড় কথাটি কয়জন সাহস করে বলতে পারবে? কারণ হজরত বু আলি শাহ কলন্ডর কখনই মিথ্যা হতে পারেন না। এমনকি অন্য পীরের মুরিদদেরকে বলি, আসুন আম্মাকে শিক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করে আপনার আপন পীরের ধ্যান করুন। আপনাকে আম্মার মুরিদ হতে হবে না। আগে পীর-ফকিরদের মাঝে কী অপূর্ব মিল ছিলো! আর এ যুগে ঠিক তার উল্টোটা। মানুষ কি সাথে ওহাবি হয়? বাধ্য হয়ে ওহাবি মতবাদে প্রবেশ করে। আসল সুফিবাদের নামে নকলের এত বেশি ছড়াছড়ি যে মানুষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। তার উপর শাস্ত্রকথার ফুলঝুরি আর অনুষ্ঠান পালনের ফতোয়াগুলো তো আঁঠার মতো লেগে আছেই। সৈনিকধর্ম পালনের উপদেশদাতা পীর সাহেবেরা আরও বিভ্রান্ত, আরও দিশেহারা করে তোলে। কথায় কথায় সুফিবাদের পরিষ্কার বিছানায় পায়খানার ছোপ ছোপ এখানে সেখানে লাগিয়ে দেয়। শরিয়ত দুধ আর মারেফত হলো মাখন ॥ কী সুন্দর কথা। এখন জীবনভর পালন করে যান সৈনিকধর্মটি। কিন্তু মাখনটি পাওয়া তো দূরে থাক জীবনে চোখেও দেখতে পায় কিনা সন্দেহ। এতেই কিছু লোক খুশি। তৃপ্তির ঢেকুর তোলে, হাঁয়াহঁয়া বলে বেড়ায় আর মনে মনে বলে, ‘আম্মি কী হনু রে!’ তিন নম্বর ছাগলের বাচ্চার মতো দুধ না

পেয়েই আনন্দে লাফাতে থাকে। আল্লাহ পাক বলেছেন, তাঁর সৃষ্টিতে বিদ্যুন্মাত্র ভুল নাই। সত্যিই কোনো ভুল নাই। কিন্তু বহুমাত্রিক লীলাখেলা যে চলছে আর চলবে অনন্তকাল এটা কিন্তু বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ির সুন্দর মডেলটি দেখেই আমরা লাফালাফি শুরু করে দেই। মডেল অনুসরণ করে বাস্তবে বানানো বাড়িতে কবে যাবো? প্রশ্ন করলেই উত্তরটি আসে : কেন, মরে যাবার পর সেই মডেল অনুসরণ করা বাড়িতে যেতে পারবে। এই দুনিয়ার জীবনে কেবল মডেলটিই দেখে যাও বললে কথাটি অনেকটা এ রকম শোনায়, ‘আজ বাকি কাল নগদ।’ কিন্তু কোরান কী বলছে? কোরান সোজাসাপ্টা বলছে, ‘তুমি যদি দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে মারা যাও তো মরার পরও অন্ধই থাকবে।’ (হবহ)। সুতরাং দুনিয়াতেই অন্ধত্ব দূর করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই অন্ধত্ব কেমন করে দূর করতে হবে সেই শিক্ষা দেবার গুরু কোথায়? ছাত্র তো অনেক, কিন্তু গুরু কোথায়? গুরু নামের অন্ধ গুরু যখন অন্ধ ছাত্রকে পথ দেখায় তো দু’জনেই গর্তে পড়ে। তাই সুফিবাদের গুরুত্ব দিন দিন কমে আসছে। কারণ আসল গুরু পাওয়াটা কষ্টকর। অন্ধ গুরু ইতিহাস পড়ায়, ধর্মীয় নিয়ম-নীতি শেখায়, অনুষ্ঠান পালন আর ধর্মের সৈনিক হবার তাগিদ দেয়। কারণ অন্ধ গুরু হজরত বু আলি শাহ কলন্দরকে মেনে নিতে পারে না। অন্ধ গুরু আসল গুরু হবার প্রেসক্রিপশন আগেই দিয়ে রেখেছে : জালালাইন তফসির পড়তে জানতে হবে, মেশকাত জানতে হবে, মাসলা-মাসায়েল জানতে হবে ইত্যাদি। এই রকম শর্তযুক্ত গুরু হতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। তবে বেশিরভাগ মানুষ এদের ফাঁদে পড়ে যায়। এটা কি তকদিরের অমোঘ লিখন? এটা কি সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতের কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে?

ইসলাম গবেষণা ও কিছু কথা

(সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ ॥ হাফ্ফানী মিশন, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, ৬ জুন ২০০৪ প্রকাশিত হয়েছিল)।

অথচ অদ্বিতীয় সয়ভু আল্লাহকে আহাদ আল্লাহ বলা হয়। এই আহাদ আল্লাহর বিষয়টি তুলে না ধরে এক তথা ওয়াহেদ আল্লাহর কথাটি বলতে গেলেই যুক্তি আর তর্কের সামনে অনেকেই টিকতে পারেন না। পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিকেরা পর্যন্ত অনেক সময় নাস্তিকদের যুক্তি-তর্কের কাছে টিকতে পারছেন না। অথচ আহাদ আল্লাহর বিষয়টি তুলে ধরলে নাস্তিকদের জনক পর্যন্ত বোকা বনে শিয়ালের গর্ভে পালাতে বাধ্য। পৃথিবীতে এমন কোনো নাস্তিক জন্মগ্রহণ করেন নি যে আহাদ আল্লাহর বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরার পর আর একটি কথা বলতে পারবে। কারণ আহাদ আল্লাহ বলতে বুঝায় যে, কোনো অস্তিত্বই নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। ‘পূর্ব এবং পশ্চিমের যে দিকেই তাকাও না কেন আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই’ কোরান-এর এই বাণীটি বোঝাতে চেয়েছে যে, আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলি যদিও জ্ঞাত তথা মূল বিষয়টি নয়, তবে জ্ঞাত তথা মূল বিষয়টি না থাকলে সিফাত তথা গুণাবলির চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু পরক্ৰমে ‘আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি’ বলার মাঝে সিফাতটিকে মোটেই বুঝানো হয় নি। আমরা শাহারগের নিকটেই আছি বলার মাঝে রুহ তথা পরমাত্মার কথাটি বোঝানো হয়েছে। তবে এই রুহ তথা পরমাত্মাটি এতই ক্ষুদ্র আকারে আছে যে ধরা পড়ার কথা নয়। এ জন্যই আল্লাহকে হেকমতওয়ালাও বলা হয়। মানব দেহের মাঝে রুহ তথা পরমাত্মা আছে বলেই মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলার বার বার তাগিদ দেওয়া

হয়েছে। এ জন্যই মহানবি তাঁর উম্মতদের শিক্ষা দেবার জন্য হেরা পর্বতের গুহায় পনের বছর এক মাস উনিশ দিন (সময়ে ও অসময়ে ॥ একটানা নয়) ধ্যানসাধনা করেছেন। ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি বাদ দিলে ধর্মের একবস্তা ভালো ভালো কথা শেখা যায় এবং সমাজে বিরাট (?) ইসলাম-গবেষক হওয়া যায়, কিছু আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না। ভালো ভালো কথা শিখে মানুষকে বোকা বানানো যায়, প্রবন্ধ লিখে চমক তৈরি করা যায়, সাময়িক জিতবার সাময়িক আনন্দ পাওয়া যায়, কিছু আখেরাতটি যে ঝরঝরা, আখেরাতটি যে অন্ধকারে ডুবে থাকে সেটা মরার আগে বুঝবার আর কোনো উপায় থাকে না। সূরা কাহাফটি বার বার পড়ে দেখুন, দেখতে পাবেন এই কথাগুলো কত নির্মম সত্য। হজরত বু আলি শাহ কলন্ডরের দেওয়া মোরাকাবাটি তিনবার তিনটি স্থানে করে দেখুন, দেখতে পাবেন সত্যের সামান্য নিদর্শন এবং তা অবশ্যই দেখতে পাবেন বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। (অধম লেখকের রচিত সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইটির প্রথম খণ্ডে হজরত বু-আলি শাহ কলন্ডরের মোরাকাবাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে)। এই জাতীয় মোরাকাবাটির মতো না হলেও তবলিগ জামাতের শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা চিল্লা বলেন। এই চিল্লার ধরন-ধারন যাই থাকুক না কেন, কিছু এটা তো অপ্রিয় সত্য যে, মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর আল্লাহর নামে ঘরসংসার ছেড়ে চিল্লায় বেরিয়ে পড়েন। সুফিবাদের কিছুটা গন্ধ যে তবলিগ জামাতের মধ্যে পাওয়া যায় সেটা কিভাবে অস্বীকার করি? সুতরাং তবলিগ জামাতের মৃত্যু হতে পারে না, বরং দিনে দিনেই এর প্রসার ঘটতে বাধ্য। কারণ আজকের দিনে পীর-ফকিরেরা মোরাকাবার বিষয়টি ঠিক মতো তুলে ধরেন না। কেবল পীরের বাড়িতে আসা-যাওয়া আর কিছু কথা শেখানো হয় যার দ্বারা

অন্যকে জুড় করা যায়। আর সৌদি আরবের ওহাবিরা তো একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই মানেন না। যেমন খারেজিরা এই একই পুরাতন কথাটি বলতো এবং সৌদি আরবে লেখাপড়া শিখে কত সুন্নিদের ছেলেমেয়েরা খাঁটি ওহাবিতে পরিণত হয়েছেন তা বেসরকারি টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোতে সুন্নি লেবাসে ওহাবি মতবাদ হরহামেশা প্রচার থেকেই দেখা যায়। সাধারণ মানুষ তো আর সুন্নি এবং ওহাবির পার্থক্য জানেন না। সৌদি ওহাবি তো পীর-ফকির আর ওরসকে শেরেক-বেদাত বলে জানেন। এমনকি মহানবি এল্‌ম্মে গায়েব মোটেই জানেন না বলে দেদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই ওহাবিদের কথাগুলো যে কী মারাত্মক রিঅ্যাকশন করতে শুরু করেছে তা অনেকেই জানেন না। একটি নমুনা তুলে ধরছি।

তাসখন্দে খ্রিস্টান পাদ্রিরা ধর্মীয় জলসার মধ্যে বলেছেন যে, আমাদের মহানবি এল্‌ম্মে গায়েব জানতেন না। সৌদি আরবের বড় বড় ওহাবি আলেম-উলামাদের দলিলগুলো তুলে ধরার পর পাদ্রিরা কোরান হতে এল্‌ম্মে গায়েব জানার দলিলটি যে যিশু খ্রিস্টের বেলায় বলা হয়েছে উহা আম জনতার সামনে যুক্তি-ব্যখ্যা দিয়ে তুলে ধরার পর অনেক মুসলমান অবশেষে খ্রিস্টান ধর্মে চলে গেছেন। এ রকম ন্যাকারজনক ঘটনাগুলো যে অহরহ ঘটে চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তা বাংলাদেশেরই সুন্নি মাওলানাদের ওয়াজের ক্যাসেট শুনলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তা ছাড়া সুন্নিদের প্রচারটি ওহাবিদের বিশাল বিভ্র-বৈভবের প্রচারটির সঙ্গে তুলনাই চলে না।

আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি (আম্মার জানা মতে) তৌহিদে বাস করেন এবং তসবিহ পাঠ করেন। অবশ্য এই তসবিহ পাঠটি আম্মাদের হাতে বানানো দানাওয়ালা তসবিহ পাঠ নয়। আম্মাদের দানাওয়ালা তসবিহ পাঠের মধ্যে আসল আর ভেজাল

দু'টোই পাওয়া যায়। (মীর জাফর দানাওয়ালা তসবিহ পাঠ করতো। কিছু কোরান-এর সূরা ইয়াসিনের উপর হাত রেখে বেঈমানি করার দরুণ আমাদেরকে দুইশত বছর ব্রিটিশের গোলামি খাটতে হলো)। তাই আবার বলছি যে, কোরান-এ যে সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য আল্লাহর তসবিহ পাঠ করছে বলা হয়েছে সেই তসবিহটি দানাওয়ালা তসবিহ নয়। আবার আল্লাহর সমস্ত জীব কেবলমাত্র নফসের অধিকারী তথা জীবাত্মার অধিকারী। জীবাত্মা আল্লাহর সিফাত, জাত নয়। সেই জীবাত্মার প্রকারভেদ থাকতে পারে এবং অবশ্যই প্রকারভেদ আছে কিছু রুহ তথা পরমাত্মাটি আল্লাহর জাত, সিফাত নয়। পরমাত্মাটি একমাত্র জিন এবং মানুষকে দেওয়া হয়েছে। তাই পবিত্র কোরান-এ রুহ তথা পরমাত্মার কথাটি মাত্র সতেরবার উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি ফেরেশতাদেরকেও পরমাত্মা তথা রুহ দেওয়া হয় নি। যদিও ফেরেশতা জিবরাইলকে অনেকেই রুহুল আম্মিন বলে থাকেন, কিন্তু জিবরাইল নামক ফেরেশতাকে রুহ তথা পরমাত্মাটি দেওয়া হয় নি। অনেকটা কানা ছেলের পদ্মলোচন নাম ধারণ করার মতো। এখানেও অনেক ইসলাম-গবেষক ভুল করে বসেন এবং লেজে-গোবরের অবস্থাটি দেখতে হয় এবং পাঠকদের পাতে পচা খাদ্য পরিবেশন করতে বাধ্য হয়। পাঠক এই জাতীয় পচা খাদ্য খেয়ে গোলকধাঁধা নামক ফেরকাবাজির রোগে ভুগতে বাধ্য হয়। আবার আরও মজার বিষয়টি হলো, এই ফেরেশতারাই রসুলরূপে আগমন করেন, যদিও রুহ তথা পরমাত্মাটি ফেরেশতাদের দেওয়া হয় নাই। পরমাত্মা তথা রুহ ফেরেশতাদের যদিও দেওয়া হয় নি, কিন্তু রসুল। তা হলে দেখতে পাচ্ছি যে, ফেরেশতাদের থেকে আল্লাহ রসুল মনোনীত করেন, যদিও রুহ দেওয়া হয় নি (সূরা ফাতিরের এক নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখুন), অথচ আরও অবাক হবেন যে, নবি বানানোর প্রশ্নে

কোনো ফেরেশতাকে নবি বানানো হয়েছে এ রকম একটি আয়াত সমগ্র কোরান-এ নেই। আমাদের কপাল এতই খারাপ যে, বিরাট (?) বিরাট (?) ইসলাম-গবেষণায় রসুলকে নবির চেয়ে বড় করে দেখানো হয়েছে। আর নব্য আরবি ভাষা জানেনেওয়াল ইসলাম-গবেষকরা কোনো কিছু গবেষণা না করেই তিন নম্বর বকরির বাচ্চার মতো লাফালাফি শুরু করে দেয়। আমরাও ভুলে যেতে চাই যে, ভাষাশিক্ষাটি মোটেই জ্ঞানশিক্ষা নয়, বরং ভাব প্রকাশের একটি নতুন বাহনমাত্র। এর বেশি নয়। আমরা অনেক সময় একটি প্রচলিত নতুন ভাষা শিক্ষার এমএ ডিগ্রিধারীকে কত বড় জ্ঞানী বলে কত বড় ভুল না করে বসি। ভারতের এক জাঁদরেল প্রধানমন্ত্রী তাঁর মেয়েকে এই শিক্ষাটি বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কোরান ফেরেশতাদের নবি বলেন নি। কোরান মানুষের মধ্যে হতে নবি নির্বাচন করেছেন। আর রসুল নির্বাচনের বেলায় কোরান মানুষ এবং ফেরেশতা উভয়ের মধ্যে হতে নির্বাচন করেছেন (সূরা হজের পঁচাত্তর নম্বর আয়াত) মানব সমাজে এই জাতীয় ইসলাম-গবেষকরা পায়খানা-প্রস্রাব এতো বেশি করে রেখেছে যে, সুইপার তথা স্বেচ্ছা পর্যন্ত এই বিশাল পর্বতপ্রমাণ পায়খানা দেখে পরিষ্কার করার ভয়ে কিছু না জানার ভান করতে বাধ্য হচ্ছে। আবার অনেক সময় ভগবানকেও এই জাতীয় গবেষকরা ভুত বানাচ্ছে। তবুও নিজেদের দোষটি অকপটে স্বীকার করেন না। এই জাতীয় গবেষকদের মুখে আছে সফ্রেটিসের বাণী আর ডেতরে শয়তানের মতো আদমকে সিজ্জা না দেবার প্রতিজ্ঞা।

মানুষ..... শয়তান

মহানবি একদিন সাহাবাদেরকে বললেন যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান দ্বিজে দেওয়া হয়েছে। এই বাণী শোনার পর এক সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন যে, ‘তবে কি আপনার সঙ্গেও?’ মহানবি বললেন, ‘হ্যাঁ। তবে আমার শয়তানটিকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি।’

মহানবির এই বাণীটির গবেষণা করা খুবই প্রয়োজন। হালকা-পাতলা চিন্তার মধ্যে এনে কিছু একটা বলেই বিষয়টি শেষ করে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। কারণ, যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে যেমন সেই ভাষার অক্ষর-পরিচয় জানতে হয় এবং অক্ষর-পরিচয় জানবার বিষয়টি অস্বীকার করলে ভাষা শিখবার প্রশ্নই উঠতে পারে না; ঠিক সেই রকম শয়তান বিষয়টি ভালো করে জানতে হবে নতুবা ধর্ম বিষয়টির উপর অচল আস্থা এবং মূল বিষয়টিকে বাদ দিয়ে তথা শয়তান বিষয়টিকে বাদ দিয়ে ইসলাম-গবেষণার প্রশ্নই উঠতে পারে না। অনেকটা অক্ষর-পরিচয় না জেনে ভাষা শিক্সা করার মতো অবাক বিষয়! তাই কোরান পাঠের আগে ‘শায়তোয়ানুর রাজ্জিম’ তথা পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

‘আমার শয়তানটিকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি’ কথাটি রূপক। একটু চিন্তা করে দেখা যাক। আমার শয়তানটিকে বলতে এখানে বাহিরে অবস্থান করা শয়তানের কথা বলা হয় নি। কারণ, আমার মনের ভিতর শয়তান বাস করে। শয়তানকে মানুষের অন্তর ছাড়া আর কোথাও বাস করার অধিকার আল্লাহ দেন নাই। সমগ্র কোরান-এ এ রকম কথা একটি আয়াতেও পাই নাই। সুতরাং মানুষের অন্তরের বাহিরে শয়তান খোঁজার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তসবিহ পাঠ করেছে। সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তোহিদে বাস করেছে। সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে

বিন্দুমাত্র ভুল পাওয়া অসম্ভব। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেও সামান্য ভুল পাওয়া যাবে না। বরং চোখ দুইটি বিস্ফারিত হয়ে নিজের কাছেই ফেরত আসবে (সূরা মূলক)। কারণ, শয়তান যেখানে ভুলটি তো সেখানেই থাকবে। অন্তরেই ভুলের অবস্থান। সুতরাং শয়তানকে কেবলমাত্র অন্তরে থাকতেই হবে। সৃষ্টিরাজ্যে বিন্দুমাত্র ভুল নাই। সুতরাং শয়তান নাই। ভুল আছে : শয়তানও আছে। ভুল হতে মুক্ত : শয়তান হতে মুক্ত। ভুল হতে মুক্ত নয় : শয়তান হতে মুক্ত নয়। সুতরাং ভুল আর শয়তান পাশাপাশি থাকে। ভুল আছে অথচ শয়তান নাই বলাটা সোনার পাথরের বাটি বলার মতো। সুতরাং মহানবির মাঝে কোনো ভুল নাই, তাই শয়তানও নাই। শয়তান আছে বলে ভাবাটা মহাপাপ। কারণ, মহানবির ভুলই নাই। সুতরাং শয়তানও নাই। আগের এবং পেছনের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হলো বলার মাঝে মহানবিকে বোঝানো যায় কী করে? কারণ, ভুল থাকলে শয়তান থাকে। আর শয়তান থাকলে পাপ থাকে। মহানবির অন্তরে শয়তান নাই, তাই ভুলও নাই। আর ভুল নাই বলে পাপও নাই। তা হলে তথাকথিত ইসলাম-গবেষকেরা কেমন করে মহানবির কথাটা তুলে ধরতে চায়? তথাকথিত ইসলাম-গবেষকদের শয়তান বিষয়টির উপর স্পর্শ ধারণা নাই বলেই এই জাতীয় জঘন্য মন্তব্য করতে পারেন। আরবি ভাষা জানা মহাপণ্ডিত, ব্যাকরণের নাচন-কুর্দন হাসেল করা ভাষায় অবাক-করা সব অলংকার রপ্ত করে গবেষণার বই লিখলে সমাজ তথাকথিত ইসলাম-গবেষকদের খাসা পণ্ডিত বলে বাহবা দিবে, আর আসল গবেষক এদের খপ্পরে পড়ে ভুতে পরিণত হবে। যেখানে গোটা সমাজটাকেই ভুল শেখানো হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে, সেখানে আসল ইসলাম-গবেষকদের তাঁই নাই। থাকতে পারে না। থাকার কথা নয়। কারণ ভুতেরাই তো ভগবান সেজে বসে আছে এলিট

সমাজে। সুতরাং আসল ভগবানটির স্থান কোথায়? চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেও এড়িয়ে যায়। কারণ, আসল ভগবানটি তো আর দশের মধ্যে একজন নয়, বরং দশের বাহিরে সম্পূর্ণ একা এবং এগারো।

ধ্যানসাধনার প্রশ্নে পৃথিবীতে অনেক রকম নিয়ম-নীতি মেনে চলা হয়। কতগুলো ধ্যানসাধনা অতিমাত্রায় পরিশ্রম ছাড়া অসাধ্য। আবার কতগুলো ধ্যানসাধনা এতই কঠিন যা পালন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এই ধ্যানসাধনার নিয়ম-নীতিগুলোতেই আমরা দেখতে পাই তা কেন এত কষ্টকর বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। সব রকম ধ্যানসাধনার মূল বিষয়টি হলো, নিজের ভিতর যে খান্নাসরুপী শয়তানটি আছে তাকে তাড়িয়ে দেবার সাধনা। (অন্য কোনো বিষয়ের ধ্যানসাধনার কথাটি এখানে বলা হচ্ছে না)। নিজের স্বাভাবিক প্রাণটাকে ধ্যানসাধনার ঘরে এনে বন্দি করে মৃদু নির্যাতন করা হয়। যেমন, কথা বলা মনো, মাছ-মাংস-ডিম খেতে মনো, সেলাই ছাড়া কাটা কাপড় পরা, সামান্য নির্জন স্থানটি বেছে নেওয়া, সারারাত জেগে আপন গুরুর ধ্যান করা, গুরুর দেওয়া ওজিফা পাঠ করা, খেমে খেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিকির করা, চল্লিশটি দিন একটি নির্দিষ্ট ঘরে থেকে ধ্যানসাধনা করা। আবার চার মাস তথা একশত কুড়ি দিনের জন্য একটানা ধ্যানসাধনা করা। (সূরা তওবা : ২)।

সাধক নিজেকে নিজের সব কিছু জেনে বুঝে এই মৃদু নির্যাতনমূলক ধ্যানসাধনা করে যায়। কিন্তু কেন? নিজের ভেতরে যে শয়তানটি খান্নাসরুপে বিরাজ করছে তাকে তাড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত। কারণ, সাধক জানে যে, আপন দেহের বাহিরে শয়তান থাকার বিধান নাই। দেহের বাহিরে শয়তান থাকে না। শয়তান থাকতে পারে না বলেই মহানবি নিজেকে দৃষ্টান্তরূপে হাজির করে বলেছেন যে,

তাঁর সঙ্গে যে শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছিল, সেই শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছেন। তাই তো উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। এই ধ্যানসাধনাটি যেহেতু কষ্টসাধ্য বিষয় তাই এটা সেটা বলে বলে তথাকথিত গবেষকরা সুখের পথে পা ফেলে। যেহেতু বৈষয়িক জীবনটা সুখের পর কেবল সুখই পেতে চায়। তাই জেনে শুনে এ রকম ধ্যানসাধনার মতো তেতো বিষয়ে পা বাড়িয়ে দিতে সাহস পায় না। যদি ভেদরহস্য জ্ঞানবার সামান্য আগ্রহ থাকে তো আপনাকে অবশ্যই ধ্যানসাধনার পথে এগিয়ে আসতে হবেই। অন্যথায় তাহা জ্ঞান অসম্ভব।

মুখের মধ্যে কাঁচকলা পুরে বড় বড় বুলি কপচানো যাবে, কিন্তু এই বুলি জ্ঞানী মানুষের সমর্থন পাবে না। বাঘ হলে মাংস খেতেই হবে, কলাগাছ পাতে দিলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। হাতি হলে কলাগাছ খেতেই হবে, মাংস পাতে দিলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেন? এটাই তকদির। এই তকদির ভেঙে ফেলার সাধ্য বাঘেরও নাই আবার হাতিরও নাই। তাই আল্লাহর ওলিরা এই লীলাখেলার বিচিত্র রং দেখে দেখে আপন মনে হাসতে থাকেন।

আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে জাবালুন নুর পর্বতের একটি অন্ধকার নির্জন গুহাতে পনের বছর একমাস উনিশ দিনের ধ্যানসাধনার প্রেসক্রিপশনটি হাতে তুলে দেবার সাহস! প্রশ্নই ওঠে না। বরং একটু মাটির ঢিলার চেয়ে নিচু স্থানে মাত্র চল্লিশটি দিনের ধ্যানসাধনার কথাটি বলতে পারি। যদিও এটা খুব হালকা নিয়মের ধ্যানসাধনা। সুতরাং সব কথার শেষ কথাটি হলো, আমার আপনার প্রত্যেকের সঙ্গে যে একটি করে শয়তান দেয়া হয়েছে সেই শয়তানটিকে মুসলমান বানাতে হবে। এই বিষয়টিকে আমরা নিজের ভিতরে যে খান্নাসরুপী শয়তানটি আছে তাকে

বাহির করে দেবার কথা বলছি। এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বাহির না করা পর্যন্ত চক্রাকারে মানুষ ভব জীবনে স্থায়ী কর্মবৃত্তের মধ্যে ঘুরতেই থাকবে। কখনও আপেক্ষিক সুখ, কখনও আপেক্ষিক দুঃখ সাথে নিয়েই মরতে হবে। কারণ, মুক্তিতে সুখ-দুঃখ থাকে না। মুক্তির শেষ সিদ্ধান্তটি হলো, সিক্কুতে মিশে যাওয়ার পর একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হয়। আর সেই কথাটি হলো, মান নামি দানম তথা ‘আমি জানি না’। ‘ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়’ শুনে আল্লাহর ওলিরা খুশি হতে পারেন না। তাঁরা তখনই খুশি হন যখন কেউ বলেন যে, ‘ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায়।’ তাই সবাইকে একটি কথা বলতে চাই যে, সুফিবাদই হলো নিজেকে চেনার একমাত্র পথ। কোরান শয়তান বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলেই প্রায় একশত বারের কিছু বেশি উল্লেখ করে সাবধান করা হয়েছে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর বিস্তারিত গবেষণা তেমন হয় নি। মানুষ মনেই করতে চায় না যে, সে দুই, অথচ সে একা নয় ॥ শয়তানটিও সঙ্গে আছে। তাই অপরের উপর শয়তানের অবস্থানটি উল্লেখ করে ঠাট্টা এবং গর্ব করতে ভালোবাসে। শয়তান বিষয়টির সম্যক জ্ঞান অর্জন না করে গুরু এবং গবেষক হতে গেলেই বিপদ। কারণ, এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে গিয়ে গোটা বিষয়টি এবং দর্শনটি অন্ধকার গর্তে গিয়ে পড়ে। ইসলামে যত উপদেশ আছে সবই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শয়তান হতে সাবধান করে দেওয়া। অথচ, এই শয়তান বাহিরে থাকে না, বরং প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই আছে। বাহিরে আল্লাহর সীফাত তথা গুণাবলি থাকে। কিন্তু ভেতরে জ্ঞাত তথা স্বয়ং আল্লাহ থাকেন বলেই কোরান বলছেন যে, তোমার শাহারগের কাছেই আছি। ছোট গাছের বীজের মধ্যে বিরাট

শক্তি যে রকম ঘুমিয়ে থাকে অনেকটা সে রকম তিনিও আমাদের মাঝে সে ভাবেই আছেন।

বৈষয়িক সভ্যতার অনেকখানি সহায়ক এই শয়তান। কথাটি শুনে অনেকেই চমকে উঠবেন। কিন্তু শয়তান কাঠমিস্ত্রির ভূমিকায় এবং মণি-মুক্তা উত্তোলনকারী ডুবুরির ভূমিকায় বৈষয়িক সভ্যতায় অবদান রেখে চলেছে ॥ এটা কোরান-এর ঘোষণা (সূরা সোয়াদ : ৩৬)। কিন্তু ‘আম্মি’-র পরিচয় জানবার প্রশ্নে শয়তান ভয়ংকর একটি বিভীষিকা এবং রুদ্রমূর্তি ধারণ করে যুক্তির অনেক রকম মারপ্যাচ দেখিয়ে চলে। আত্মহত্যা এবং আত্মাহুতি যেমন এক বিষয় নয়, যদিও দু’টিতেই মৃত্যুবরণ করতেই হয় : একটি জাহান্নামের মৃত্যু, আরেকটি জান্নাতের মৃত্যু। সার্জন ডাক্তারের চাকু এবং কসাইয়ের চাকু ॥ দু’টোই স্টিলের তৈরি। দু’টোই কাটে। একটি দিয়ে কেটে বাঁচাতে চেষ্টা চালায় আর অপরটি দিয়ে কেটে গোশত বিক্রি করে। একই গান আদনান সাম্মি গাইলে দু’হাজার টাকার টিকেটে শুনতে হয়। আর আম্মি গাইলে কেউ শুনতে চায় না।

আসুন! আমরা সত্যটি জানার জন্য গবেষণা করি। সাইনবোর্ডের জন্য নয়। আমাদের সবার প্রতিজ্ঞা হোক সত্যসাগরে কেমন করে, কী উপায়ে অবগাহন করা যায় সেই গবেষণা চালিয়ে যেতে এবং সব রকম ফেরকাবাজি ফেলে সার্বজনীন হতে।

শরিয়তি শয়তান তিনটি এবং ইহা দেখা যায়। তাই ইহাকে মূর্ত বলা হয়। মারেফতের শয়তান চারটি এবং ইহা দেখা যায় না। তাই ইহাকে বিমূর্ত বলে। শরিয়তি শয়তান না থাকলে মারেফতের শয়তানটি ধারণায় আনা কষ্টকর। তাই শরিয়তকে কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না। শরিয়তের কাবাটি দেখা

যায় এবং তোয়াফ করতে হয়। যেমন শরিয়তের শয়তানটিকে কংকর মারতে হয়। মারফতের কাবাটিকে দেখা যায় না এবং তোয়াফও করতে হয় না। মারফতের কাবাটি মোমিনের কলব (হৃদয়)। আম্মানুর কলব নয়, বরং মোমিনের কলব। সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও আম্মানুদের সঙ্গে আল্লাহ্ আছেন, এই কথা বলা হয় নি, বরং মোমিনের সঙ্গে আল্লাহ্ আছেন বলা হয়েছে। সুতরাং মোমিনের কলব জীবন্ত কাবা। এই জীবন্ত কাবার আনুগত্য গ্রহণ করা ছাড়া আল্লাহ্র ওলি হওয়া সম্ভবপর নয়। ইসলামের ইতিহাস জানা এক বিষয়, কোরান তফসির করা অন্য বিষয় এবং হাদিস অধ্যয়ন করা আরেক বিষয়। যিনি ইসলামের ইতিহাস জানেন তাকে ইতিহাসবিদ বলে, যিনি কোরান-তফসির করেন তাকে মোফাচ্ছের বলা হয়, যিনি হাদিস জানেন তাকে মোহাদ্দেস বলা হয়, কিন্তু তাকে আল্লাহ্র ওলি বলা হয় না। আল্লাহ্ যেমন মোমিনের সঙ্গে থাকেন সে রকম মোত্তাকির (তাকওয়ায়রত) সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ্ যেমন সবরকারীর সঙ্গে থাকেন সে রকম মোহসিনিনদের সঙ্গেও থাকেন। এই চারটি বিষয় ছাড়া আল্লাহ্ আর কারো সঙ্গে থাকেন না। যেমন, নামাজিদের সঙ্গে আল্লাহ্ থাকেন না। সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও পাওয়া যায় না যে, আল্লাহ্ নামাজিদের সঙ্গে আছেন। সে রকমভাবে রোজাদারদের সঙ্গেও আল্লাহ্ থাকেন না। তবে বিশেষ বেহেশত দান করেন। সমগ্র কোরান-এর একটি স্থানেও আল্লাহ্ হাজিদের সঙ্গে থাকেন বলা হয় নি। একই ভাবে আল্লাহ্ জাকাত দানকারীর সঙ্গে থাকেন বলা হয় নি, এমনকি কোরবানিকারী ও দান-খয়রাতকারীদের সঙ্গে আল্লাহ্ আছেন এই কথাটি সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও নেই। মোমিন নামক জীবন্ত কাবার অনুসরণ করতে হয়। তাই হজরত মোজাদ্দের আলফেসানি সিরহিন্দ বলেছেন যে, পীরে তাশত,

আউয়াল মাবুদ তাস্ত অর্থাৎ ‘তোমার পীরই হলো তোমার প্রথম মাবুদ।’ এই পীরকে অবশ্যই মোমিন হতে হবে। একটু লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে পীরে তাস্ত, আখের মাবুদ তাস্ত বলা হয় নি, অর্থাৎ তোমার পীরই তোমার শেষ মাবুদ ॥ এ কথাটি বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে প্রথম মাবুদ। সুতরাং প্রতিটি বিষয় শরিয়ত এবং মারফতের রহস্য দিয়ে ভরপুর।

আল্লামা ইকবালের কালজয়ী সুফিবাদভিত্তিক কবিতা ও তার অনুবাদ

কী হাকছে ফারিশতাউনে ইকবাল কী গমমাজী
 গুস্তাখ হ্যায় করতা হ্যায় ফিতরাত কি হিমা বান্দী
 খাকী হ্যায় মগার ইশকে আন্দাজ হ্যায় আফলাকী
 রুমী হ্যায় না শামী হ্যায় কাশী না সাম্মারকান্দী
 সিখলাই ফারিশতাউকো আদম কী তরফ ইছনে
 আদম কো শিখাতা হ্যায় আদাবে খোদাওয়ার্দী ॥
 হাকিমী নে মুসলমানী খুদী কী
 কালীমে রামজে পিনহানী খুদী কী
 তুঝে গুর ফখরে শাহী কা বাতাদো
 গরীবী মে নিগেবানী খুদী কী
 দায়ারে ইশক মে আপনা মাকাম প্যায়দা কর ॥
 না তু জন্মি কে লিয়ে হ্যায় না আসমাকে লিয়ে

জাহাঁ হ্যায় তেরে লিয়ে তু নেহী জাহাঁকে লিয়ে
 সেতারো সে আগে জাহাঁ আওর ভী হ্যায়
 আভী ইশক কী ইন্তেহা আউর ভী হ্যায়
 ইয়ে হিকমতে মালাকুতী ইয়ে ইলমে লাহতী
 হারাম কে দরদকা দারমা নেহী তো কুচ ভী নাহী ॥
 ইয়ে জিকরে মীম সাবী ইয়ে বোরাক বে সারুর
 তেরী খুদী কে নিগেবা নেহী তো কুচ ভী নেহী
 খিরাদ মে ক্যাহ দিয়া না ইলাহা কো কিয়া হাসিল
 দিলো নিগাহ মুসলমা নেহী তো কুচ ভী নেহী ॥
 নয়া জামানা লিয়ে ফিতরত ছে নাজি বেখুদকো
 সুখকে লালা হো গুলসে কালাম প্যায়দা কর
 উঠা না সীসা জাবা ম্যায় ফরেন দেখে গা
 ছাপালে পাকছে মিনা ওয়া জাম প্যায়দা কর
 তেরা তারিকা আন্নিরী নেহী ফকিরী হ্যায়
 খুদী না বেচে গরিবী মে নাম প্যায়দা কর
 দয়ারে ইশক মে আপন মাকাম প্যায়দা কর ॥

অনুবাদ

কোন অধিকারে ফেরেশতারা ইকবালের অতীতের ভুলগুলোর হিসাব লিখবে?
 ভুলগুলোর মাঝে আমি তো আজন্ম বন্দি হয়েই আছি।
 যদিও মাটির মানুষ আমি, কিন্তু প্রেম উচু আকাশের অধিবাসী করেছে
 আমি কামিও নই, শামিও নই, কাশিও নই আর সাম্যারকান্দিও নই।
 ফেরেশতাদেরকে শিখিয়ে দিলেন খোদা আদমের মর্যাদ্য সম্পূর্ণ
 তারপর আদমকে শিখিয়ে দিলেন কেমন করে খোদার নৈকট্য পাওয়া যায়।
 খোদা তোমার রহস্যময় পোশাকের ভেতরেই তোমার আমিটির ভেতর লুকিয়ে
 আছেন।

তুমি কি তোমার বজুর্গির অহঙ্কারের বিষয়টি আমাদেরকে বলবে?
 অথচ তুমি গরিব আমিরটির মাঝেই তোমাকে দেখতে চেষ্টা কর।
 জাগ্রত রুহের অধিকারী (প্রেমমন্দির, কামেল গুরু) প্রেমে আপন ঘরটিকে নুরময়
 করে তোল।
 তোমাকে এই পৃথিবীর তরে নহে আর ঐ আকাশের তরেও নহে
 পৃথিবীটা তোমারই জন্য তুমি পৃথিবীর জন্য নহ।
 তারকা-রাজ্যের উর্ধ্বে অরিও সৃষ্টিজগত বাহিয়াছে।
 জেনে রাখ প্রেমের পরীক্ষা তাহারও উর্ধ্বে অবস্থান করে।
 ইহা ফেরেশতা রাজ্যের রহস্যময় হিকমত। ইহা নাই-রাজ্যের জ্ঞান
 হৃদয়ের অনুভূতি না থাকলে তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।
 ইহা মিলেরই স্বরণ একমাত্র প্রশংসা ইহাই দ্রুতগামী বোরাক।
 তোমার আমিরটির প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে তো কিছুই রইলো না।
 সকাল-সন্ধ্যায় তুমি তোমার জীবনের নবযুগের সূচনী কর।
 যদি খোদা ইচ্ছা করেন তো তিনি তোমার সুন্দর আমিরের বিনাশ করতে পারেন।
 যদি তুমি তোমার আমিরের পরদাটুকু একটুখানি উঠাইতে পার তা হলে সঙ্গে সঙ্গে
 খোদাকে দেখতে পাবে।
 তাহা হইলে তুমি তোমার বিদগ্ধ দাসুতে থাকিয়াও ফলের মাঝে কালান্ন (বাণী)
 সৃষ্টি করতে পার। (অধম লিখক এই বাক্যটি বুঝতে না পেরে অনুমানে লিখলাম,
 সূতরাং ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক)।
 তুমি তোমার জুকার ডেতরে রাখা পানপাত্রটিকে যদি পবিত্র করতে পার।
 তোমার পথ তো আমিরি নহে, বরং ফকিরিই তোমার জন্য প্রযোজ্য।
 তোমার স্বকীয়তাটিকে বিক্রি না করে বরং গরিবির খাতায় নাম লিখে নাও।
 র এখানে সুফি কবি আলুলামা ইকবাল 'আলাহ' শব্দটি ব্যবহার না করে 'খোদা'
 শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই আমরাও খোদা শব্দটিই রাখলাম। যদিও আলুহ
 শব্দটিতে সোয়াব বেশি পাওয়া যায় বলে আজকের আলেম-উলামারা ফতোয়া
 দিয়েছেন, কিন্তু ইকবাল সাহেবের জামানায় বেশি সোয়াব পাবার ফতোয়াটি ছিল
 না বিধায় খোদা শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
 সুফি কবি আলুলামা ইকবালকে শিকোয়া নামক গ্রন্থের জন্য এক হাজার আলেম
 কাকের ফতোয়া দিয়েছিলেন। সেই গ্রন্থের মাত্র একটি বাক্যের জন্য কাকের
 ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। সেই বাক্যটি ছিল, 'আলাহ তুমি দয়ালু নও'। আর
 একটি বাক্যের জন্য আলেম সমাজ খুব বেজার হয়েছিল। সেই বাক্যটি হলো, 'তুমি
 সব কিছুই হয়েছ এখন একটি কথা বল তো, তুমি কি মুসলমান হতে পেরেছ? তুমি
 সব ক'ছ হো বাতাও তো মুসলমান ভি হো? দেওবন্দের জাদরেল আলেম হসানেন
 ইবনে মাদানিই কাকের ফতোয়াটি দিয়েছিলেন সে জন্য সুফি কবি আলুলামা
 ইকবাল একটি সামান্য গালিও দেন নি, বরং নিজেকেই নিজে গালি দিয়ে

বলেছিলেন যে, এই গোপন কথাগুলো তোমাকে (আল্লাহকে) বলা ঠিক হয় নি। তাই আমাকে শান্তি উপহার দাও আর যারা কাকের ফতোয়া দিয়েছেন তাদেরকে জ্ঞানাত দান কর। ভারি মাজমো মে রাজ কি বাত ম্যায়নে কাহদি, বাড়া বেয়াদব হ ম্যায় সাজা চাহাতা হ। তারপর ইয়ে জো জ্ঞানাত ত নে বানায় দে দো মোল্লা কো। সত্যি অবাক লাগে! কত বড় মহান বিরাট বিশাল মনের অধিকারী হতে পারলে এমন কথাগুলো বলতে পারেন। যে-কারণে কাকের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল তা হলো এই :

সাফায়ে দাহের সে বাতেল কো মিটায় হামনে
নগুয়ে ইনসান কো গোলামি সে ছোডায়া হামনে
তেরে কাবেকো জামিনো সে বাসায় হামনে
তেরে কোরানকো সিনোসে লাগায় হামনে
ফের বি হামসে ইয়ে গেরা হ্যায় হাম অফাদার নাই!
হাম অফাদার নাই! তু ভী তো দিলদার নাই!
বিদ্বানিকর মতবাদের কবর রচনা করেছি আমরাই
দাসতের শুলখল হতে মানুষকে মুক্ত করেছি আমরাই
ধরণির বুকে তোমার কাবাকে পরিচয় করেছি আমরাই
তোমার কোরান বুকে ধারণ করেছি আমরাই
তারপরেও অনুগত নও বলে অপবাদ দাও আমাদের!
আমরা অনুগত নই! (তা হলে) তুমিও তো দয়ালু নও।

কোরান-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কয়টি কথা

সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর তৃতীয় খণ্ডের ২য় সংস্করণে কোরান-এর মাত্র দুইটি সূরার প্রতিটি শব্দের অর্থসহ হুবহু বাক্যগঠন করতে চেষ্টা করেছি এবং এই দুইটি সূরার কিছু কিছু অংশের সামান্য হালকা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছি। আমরা হাদিসের রেফারেন্স টেনে এনে হাটু-ভাঙা, কোমর-ভাঙা ব্যাখ্যা ইচ্ছা

করেই দেই নাই। এই অনুবাদ ও সামান্য ব্যাখ্যা কেমন হলো তারই জন্য পাঠকের মতামতটুকু অগ্রত জানতে পারবো।

হাটু-ভাঙা, কোমর-ভাঙা অনেক কোরান-এর তফসির বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু হবহ অনুবাদের সঙ্গে সামান্য ব্যাখ্যাটি কেমন লাগলো আশা করি পাঠক মনে মনে ভাবতে চাইবে। গোঁজামিল, মনগড়া অনেক কোরান-এর তফসির বাজারে পাওয়া যায়, তাই আমরা হবহ অনুবাদটি তুলে ধরতে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং বিবেকের নিরপেক্ষতা দিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

যদি এই অনুবাদ এবং হালকা ব্যাখ্যাটির প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তা হলে পুরো কোরানুল করিম-টি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে চাই এবং এই বিশাল কাজটি করতে গেলে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন মনে করি এবং সেই সঙ্গে জাকাতের একটি ক্ষুদ্র অংশ অথবা কোরবানির পশুর চামড়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ দান করার আহ্বানটি জানিয়ে একটি দায়িত্বের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে দিলাম।

সূরা : আশ্বিয়া

মক্কী র আয়াত : ১১২, রুকু : ৭

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর নামের সাথে (বিস্মিল্লাহে) যিনি একমাত্র দাতা (আর রাহমান)
একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)

১. কাছে আসিয়াছে (ইক্কারাবা) মানুষের জন্য (লিন্ নাসি) তাহাদের হিশাব (হিসাবুহম্) এবং তাহারা (ওয়াহম্) উদাসীনতার মধ্যে (ফি গাফ্লাতিন্) বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে (মুরিদুন)।

তাহাদের হিশাব মানুষের কাছে আসিয়াছে অথচ তাহারা উদাসীনতার মধ্যে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে।

২. না (মা) তাহাদের কাছে আসিয়াছে (ইয়াতিহিম্) হইতে (মিন্) জিকির (জিকরিন্) হইতে (মির্) তাহাদের রব (রাব্বিহিম্) নূতন (মুহদাসিন্) একমাত্র (ব্যতীত) (ইল্লাস্) তাহা তাহারা শুনে (তাম্মাউহ) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্) খেলায় মাতিয়া থাকে (ইয়াল্আবুন)।

তাহাদের রব হইতে (এমন কোনো) নূতন জিকির হইতে তাহাদের কাছে আসে নাই যে তাহা তাহারা শুনে এবং তাহারা খেলায় মাতিয়া থাকে।

৩. মশগুল (বিভোর, তন্ময়) (লাহিয়াতান্) তাহাদের কলব (অন্তর)-গুলি (কুলুবুহম্) এবং (ওয়া) তাহারা লুকাইয়া রাখে (আসাররুন) গোপন আলোচনা (নাজ্ওয়া) যাহারা (আল্লাজিনা) জুলুম করিয়াছে (জালামু) নয় কি (হাল)? এই (হাজ্জা) একমাত্র (ইল্লা) মানুষ (বাশারুম্) তোমাদের মতো (মিসলুকুম্) তবে কি তোমরা আসিয়া পড়িবে (আফাতাতুনাস্) জাদু (সিহরা) এবং (ওয়া) তোমরা (আনতুম্) দেখিতেছ (তুবসিরুন)।

তাহাদের অন্তরগুলি (অন্য চিন্তায়) মশগুল এবং জালেমেরা লুকাইয়া গোপন আলোচনা করে (যে) নয় কি এই (ব্যক্তি) একমাত্র তোমাদের মতো মানুষ? তোমরা কি তবে জাদুর (কবলে) পড়িবে? এবং তোমরা দেখিতেছ।

৪. (নবি) বলিলেন (কাল) আমার রব (রাব্বি) জানেন (ইয়ালান্নুল) কথা (কাউলা) মধ্যে (ফিস) আকাশগুলির (সাম্মায়ি) এবং (ওয়া) জমিনের (আরদি) এবং (ওয়া) তিনিই (হয়াস) সব কিছু শোনে (সাম্মিউন) (এবং) সব কিছু জানেন (আলিমুন)।

(নবি) বলিলেন, ‘আকাশগুলি এবং জমিনের মধ্যে আমার রব জানেন (সব) কথা এবং তিনি সব কিছু শোনে এবং সব কিছু জানেন।

কোরান-এর এই আয়াতটি দিয়ে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা বলে থাকেন যে, যেখানে আল্লাহ আসমান-জমিনের সব কথা জানেন, শোনে সেইখানে পীর নামক উসিলা ধরার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বাক্সা ডাকবে, রব শুনবে ॥ এক কথায় ওহাবিরা পীর নামক উসিলা ধরাটিকে অস্বীকার করেন। যদি আমরা তথা আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা পাল্টা প্রশ্ন করি যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা হবার পরেও তাঁর কালামগুলো বাক্সাদের কাছে পাঠাতে গিয়ে দুইটি উসিলা কেন গ্রহণ করলেন? জিবরাইল এক উসিলা এবং তার পরের উসিলা মহানবির মাধ্যমে আল্লাহর কালামসমূহ কেন পাবো? সরাসরি আল্লাহর কালাম আল্লাহ কি পাঠাতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। তা হলে এই দুইটি উসিলা তথা জিবরাইল ও মহানবির মাধ্যমে কোরান পাঠাবার মধ্যে একটি গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। জগতের লক্ক লক্ক ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা কেন পীর নামক উসিলার মাধ্যমে আল্লাহকে নিজের মধ্যে বিকশিত ও প্রকাশিত করে গেছেন? যদি শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদের কথাটি মেনে নিই, তা হলে এই লক্ক লক্ক ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা কি আমাদেরকে ভুল শিক্ষা দিয়ে গেলেন? যদি বলি, না, ভুল শিক্ষার প্রশ্নই আসে না, তা হলে ওহাবি ভাইদের কথার কোনো

মূল্যই থাকে না। মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাই উসিলা ধরাটিকে একটি বোঝা মনে করে। সুতরাং ওহাবি ভাইদের কথাগুলো শুনতে চমৎকার লাগে, কিছু বিরাট বিরাট ভুলের বিরাট বিরাট গর্ত লুকিয়ে থাকে।

৫. বরং (বাল) তাহারা বলে (কালু) অলীক (অমূলক, বৃথা, অসার) (আদগাসু) স্বপ্নগুলি (কল্পনা) (আহলামিন) বরং (বাল) তাহা সে উদ্ভাবন (আবিষ্কার, বিরচন) (ইফতারাহ) বরং (বাল) সে (হয়া) একজন কবি (শাইরুন) সুতরাং আনুক আমাদের কাছে (ফাল্ইয়াতিনা) কোনো আয়াত (নিদর্শন, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, প্রমাণ, চিহ্ন) (বিআয়াতিন) যেমন (কাম্মা) প্রেরিত (আদেশপ্রাপ্ত, অনুপ্রাণিত, যাহাকে পাঠানো হইয়াছে, প্রেরণাপ্রাপ্ত) (উরসিলাল) আগেকার (পূর্ববর্তী, অতীতের) (আউয়ালুনা)।

বরং তাহারা বলে (এই সমস্ত) অলীক স্বপ্নসমূহ বরং তাহা সে উদ্ভাবন করিয়াছে বরং সে একজন কবি। সুতরাং কোনো নিদর্শন আনুক আমাদের কাছে, যেমন পূর্ববর্তীগণ (নিদর্শন নিয়া) প্রেরিত হইয়াছিল।

৬. ইমান আনে নাই (মা আম্মানাত্) তাহাদের আগে (কাব্লাহম) কোনো (মিন) জনবসতি (কার্ইয়াতিন) যাহাকে আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস (বিনাশ, সংহার, বিলোপ) করিয়াছি (আহলাক্নাহা) সুতরাং ইহারা কি (আফাহম) ইমান আনিবে (ইউম্মিনুন)?

তাহাদের পূর্বে (যে-সকল) জনবসতি ইমান আনে নাই (তাহাদেরকে) আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস করিয়াছি। সুতরাং ইহারাও কি ইমান আনিবে?

আধুনিক বেশ কিছু পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা অধম লিখককে প্রশ্ন করেন যে, আগেকার দিনে আল্লাহতে ইমান না আনার দরুন, অনেক জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু এই যুগে ইমান আনার প্রশ্ন তো বহু দূরের কথা, বরং বলে থাকেন যে, ‘আল্লাহই নাই।’ ইমান না আনা এক কথা আর ‘আল্লাহই নাই’ বলা আর এক কথা। সুতরাং এই ক্ষমার অযোগ্য ‘আল্লাহই নাই’ কথাটি যে সব জাতি তথা কমিউনিষ্টরা বলে বেড়ায় তাদের একটি কণ্ঠস্বর ধ্বংস করা হয় নি। আদ আর সামুদ্র জাতিকে মূর্তিপূজার দরুন ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু অখণ্ড বিশাল ভারতে আজও বহাল তবিত্যে বহু মূর্তির পূজা চলে আসছে। তা হলে এদেরকে কেন ধ্বংস করা হলো না? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অধম লিখক দিতে পারে নাই বলেই সরল-সহজ মনে তুলে ধরলাম এ জন্য যে কোনো জ্ঞানী পাঠক এর সুন্দর উত্তরটি দিতে পারেন এবং সেই আশায় অপেক্ষায় রইলাম।

৭. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা পাঠাইয়াছি (আরসালনা) আপনার আগে (কাবলাকা) একমাত্র (ইল্লা) মানুষ (রিজালান) আমরা ওহি করিতাম (নুহি) তাহাদের কাছে (ইলাইহিম) সুতরাং জিজ্ঞাসা করো (ফাসআলু) অধিবাসী (ধারণ করে আছে, মালিক, ওয়ালা) (আহলাজ) জিকিরকারী (জিকরি) যদি (ইন) তোমরা (কুনতুম) না (লা) জানো (তায়ালামুন)।

এবং (হে নবি) আমরা পাঠাইয়াছি আপনার আগে (কোনো রসুলকে) একমাত্র মানুষ (-কেই) আমরা ওহি করিতাম তাহাদের কাছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা করো জিকিরকারীদের মধ্যে আছেন, যদিও তোমরা জান না (অবগত নও)।

‘আপনার আগে’ কথাটি এই আয়াতে আছে, কিন্তু ‘কোনো রসুলকে’ কথাটি নাই এবং থাকতে পারে না। তাই অধম লিখক ‘কোনো রসুলকে’ শব্দটিকে

ব্রাকেটে রেখে দিয়েছি। এখানে ‘ইল্লা রেজালান্’ অর্থাৎ একমাত্র পুরুষের কথাটি বলা হয়েছে। কোরান বার বার ঘোষণা করেছে যে আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ মানুষ এবং ফেরেশতাদের থেকে নির্বাচন করেছেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ সূরা হজের ৭৫ নম্বর আয়াতটি (আল্লাহ ইয়াস্তাফি মিনান্ মালাইকাতি রসুলাও ওয়া মিনান্ নাস) এবং ইহার একদম লেংটা প্রমাণ হলো সূরা ফাতির-এর ১-নম্বর আয়াতটি। এখানে মানুষকেও যে রসুলরূপে পাঠানো হয় সেই কথাটি বলা হয় নি, বরং সোজাসুজি বলা হয়েছে যে ফেরেশতাদেরকে রসুলরূপে পাঠানো হয়েছে (আল্হাম্দুলিল্লাহে ফাতিরিস্ সাম্মাওয়াতি ওয়াল্ আরদি জাইলিল্ মালাইকাতি রসুলান্)। সুতরাং আল্লাহ কখনই ‘রেজাল’ তথা মানবরূপী পুরুষ হতে একমাত্র রসুল নির্বাচন করার কথাটি বলতে পারেন না। ইহা অজ্ঞানী অধম লিখক বলতে পারে, তাই ব্রাকেটে ‘কোনো রসুলকে’ শব্দটি উল্লেখ করেছি। কিন্তু মজার কথাটি হলো কোরান-এর একটি আয়াতেও ফেরেশতাদেরকে নবি বলে উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং নবি বড়, রসুল ছোট। অথচ প্রচলিত বাজারে রসুলকে বড় বলা হয়। এই আহান্নকের স্বর্গে অধম লিখকও অবস্থান করেছিল, পরে বহু গবেষণার পর নবি বড় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। আমাকে যদি কেহ কোরান-এর একটি আয়াতে ফেরেশতাকে নবি বলা হয়েছে, দেখিয়ে দিতে পারেন তা হলে অবশ্যই রসুলকে বড় বলব। আরও একটি মজার কথা হলো যে, ফেরেশতাদেরকে নফস এবং রুহ তথা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একটিও দেওয়া হয় নি, তথা স্বাধীন নির্বাচন করার কোনো অধিকারই দেওয়া হয় নি। সুতরাং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রোবট (?) ও বলা যেতে পারে।

৮. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) তাহাদের বানাই (জাআলনাহুম) দেহবিশিষ্ট (জাসাদাল) না (লা) তাহারা খাইত (ইয়াকুলুনাত্) খানা (খাদ্য) (তোয়াম্মা) এবং (ওয়া) না (মা) তাহারা ছিল (কানু) চিরস্থায়ী (খালিদিনা)।

এবং আমরা (আল্লাহ) (এমন কোনো) দেহবিশিষ্ট (করিয়া) তাহাদের বানাই নাই (যে) তাহারা খাইত না খাদ্য এবং না তাহারা ছিল চিরস্থায়ী।

৯. তারপর (সুম্মা) আমরা (আল্লাহ) তাহাদের পূর্ণ (পুরা, কমতি বা ঘাটতি নাই) করিয়াছি (সাদাক্নাহুম) ওয়াদা (ওয়াদা) সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে রক্ষা (উদ্ধার, পরিদ্রাণ, অব্যাহতি, নিস্তার, তত্ত্বাবধান) করিয়াছি (ফাআন্জাইনাহুম) এবং (ওয়া) যাহাদেরকে (মান) আমরা চাহিয়াছি (নাসাউ) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস করিয়াছি (আহলাক্নাহ) সীমালঙ্ঘনকারীদের (প্রান্তাতিক্রমকারী, ধার ডিঙাইয়াছে যে, সীমানা অতিক্রমকারী) (মুস্‌রিফিন)।

তারপর আমরা (আল্লাহ) পূর্ণ করিয়াছি তাহাদের (প্রতি) ওয়াদা সুতরাং আমরা তাহাদেরকে রক্ষা করিয়াছি এবং যাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) চাহিয়াছি এবং আমরা ধ্বংস করিয়াছি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে।

১০. নিশ্চয়ই (লাকাদ্) আমরা নাজেল করিয়াছি (আন্জাল্‌না) তোমাদের দিকে (ইলাইকুম) কিতাব (কিতাবান্) ইহার মধ্যে (ফিহি) তোমাদের জন্য রহিয়াছে জিকির (জিক্‌রুকুম) তবে কি না (আফালা) তোমরা বুঝিবে (তাকিলুন)।

নিশ্চয়ই আমরা নাজেল করিয়াছি তোমাদের দিকে কিতাব, ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে জিকির, তবে কি তোমরা বুঝিবে না?

১১. এবং (ওয়া) কত (কাম) আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস (বিস্বস্ত, বিনাশিত, সম্পূর্ণ বিনষ্ট, চূর্ণ-বিচূর্ণ) করিয়াছি (কাসাম্‌না) হইতে (মিন) জনবসতিকে (লোকালয়কে) (কারিয়াতিন) যাহা ছিল (কানাত) জালিম (জালিমাতান) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি করিয়াছি (আনশানা) তাহার পরে (বাদাহা) জাতি (কাওমান) অপর (অন্য) (আখারিন)।

এবং আমরা ধ্বংস করিয়াছি কত জনবসতি (লোকালয়)-কে যাহারা ছিল জালিম (জুলুমকারী, উৎপীড়ক) এবং তাহার পরে আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি (নির্মাণ, উদ্ভব, রচনা) করিয়াছি অপর জাতি।

এই আয়াতটি পড়লে মনে হয় কত সহজ, কিন্তু ইহা মোটেই সহজ নয়। কারণ আল্লাহ পাক বহু জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি করার দরুন যে ধ্বংস করে দিচ্ছেন তার দৃষ্টান্ত কোরান হতে বেশ অনেকবার আমরা জানতে পারি। আমরা জানতে পারি, আদ ও সামুদ জাতির মতো মুসা নবির জামানার আগেও বহু জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি করার দরুন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। (সূরা তোয়াহা দ্রষ্টব্য)। প্রশ্ন আসতে পারে : কতদিন, কত কাল, কত যুগ আল্লাহ সেই সমস্ত জালিম জাতিদেরকে সহ্য করার পর ধ্বংস করে দিচ্ছেন। কারণ বর্তমান যুগে পৃথিবীতে বহু জুলুমের ঘটনা অহরহ ঘটে চলছে এবং আল্লাহ ধৈর্যধারণ করে সেই জালিম জাতিগুলোকে ধ্বংস করার অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু আল্লাহ এই অপেক্ষাটি কতদিন, কত যুগ ধারণ করবেন উহা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। সুতরাং কোরান-এর এই আয়াতটির অর্থ সহজ মনে হলেও অধম লিখকের নিকট অনেক কঠিন। তাই এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি দিতে পারলাম না তথা এই আয়াতের অর্থটি অধম লিখকের জানা নাই। অনুমানের ঢিল ছোঁড়া আপন বিবেকের কাছে

অপরাধ বলে মনে করি। তাই অকপটে স্বীকার করে নিলাম যে এই আয়াতের মর্মার্থটি জানা নাই।

১২. সুতরাং যখন (ফালাম্মা) তাহারা অনুভব করিল (আহাস্‌সু) আমাদের (আল্লাহ) শাস্তি (বাসানা) তখন (ইজা) তাহারা (হম) তাহা হইতে (মিন্‌হা) পালাইতে লাগিল (ইয়ারকুদুন)।

সুতরাং যখন তাহারা অনুভব (জ্ঞান, উপলব্ধি, বোধ) করিল আমাদের (আল্লাহ) শাস্তি (সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ) তখন তাহারা তাহা হইতে পালাইতে (চম্পট, দৃষ্টির বাহিরে গমন) লাগিল।

১৩. না (লা) তোমরা পালাইবে (তারকুদু) এবং (ওয়া) তোমরা ফিরিয়া যাও (ইরজিউ) দিকে (ইলা) তাহার (মা) আমাদের আরাম দেওয়া হইয়াছিল (উত্‌রিফতুম) ইহার মধ্যে (ফিহি) এবং (ওয়া) আমাদের ঘরবাড়িগুলিকে (মাসাকিনিকুম) আমাদের যাহাতে (লাআল্লাকুম) জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে (তুসআলুন)।

তোমরা পালাইও না এবং তোমরা ফিরিয়া যাও তাহার দিকে ইহার মধ্যে আমাদের আরাম (নিয়ামত, ভোগসম্ভার, বিলাসিতা, সম্ভোগ, তোহফা, অনুগ্রহ) দেওয়া হইয়াছিল এবং আমাদের ঘরবাড়িগুলিকে যাহাতে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে।

১৪. তাহারা বলিয়াছিল (কালু), হায় আমাদের দুর্ভোগ (ইয়াওয়াইলানা) নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না) ছিলাম (কুননা) জালিম (জোয়ালেমিন)।

তাহারা বলিয়াছিল, হায় আমাদের দুর্ভোগ, নিশ্চয়ই আমরা জালিম (অত্যাচারী) ছিলাম।

১৫. সুতরাং (ফান্না) চলিতে থাকে (জালাত্) ওই (তিল্কা) তাহাদের আর্থনাদ (দাওয়াহ্) যতক্ষণ না (হাত্তা) তাহাদেরকে আমরা পরিণত করি (জাআল্নাহ্) কর্তিত শস্য (কাটা শস্য) (হাসিদান্) আগুন-নিভানো ছাই (খাম্বিদ্দিন)।

সুতরাং তাহাদের ওই আর্থনাদ (কাতর বা আকুল চিৎকার) চলিতে থাকে যতক্ষণ না তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ্) পরিণত করি কাটা শস্য, আগুন-নিভানো ছাই।

১৬. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ্) সৃষ্টি করিয়াছি (খালাক্নাশ্) আকাশ (সাম্মাত্) এবং (ওয়া) জম্বিনকে (আর্দা) এবং (ওয়া) যাহা কিছু (মা) দুইটির মধ্যে (বাইনাহ্মা) খেলার ছলে (কৌতুক, আমোদ, ক্রীড়া, মজা, ঠাট্টা, তামাশা, পরিহাস, কৌতূহল) (লাইবিন্)।

এবং আমরা আকাশ এবং জম্বিনকে এবং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কিছু (আছে) (উহা) খেলার ছলে সৃষ্টি করি নাই।

১৭. যদি (লাও) আমরা (আল্লাহ্) চাহিতাম (আরাদনা) যে (আন) আমরা গ্রহণ করিব (নাত্তাখিজা) খেলারূপে (লাহয়াল্) নিশ্চয়ই আমরা তাহা লইতাম (লাত্তাখাজ্নাহ্) হইতে (ম্বিন) আমাদের নিকট (লাদুন্না) যদি (ইন্) আমরা (কুন্না) করার হইতাম (ফাইলিন্)।

যদি আমরা (আল্লাহ্) চাহিতাম যে আমরা খেলারূপে আমরা গ্রহণ করিব তাহা আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে খেলা হিসাবে লইতাম। আমরা যদি (খেলা) করিবার হইতাম।

১৮. বরং (বাল) আমরা নিক্লেপ করি (নাক্জিফু) সত্য দিয়া (বিল্হাক্কি) উপরে (আলাল) মিথ্যা (বাতিলি) সুতরাং চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয় (ফাইয়াদ্মাগ্গহ) সুতরাং তখন (ফাইজা) তাহা (হয়া) নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় (জাহিকুল) এবং (ওয়া) তোমাদের জন্য আছে (লাকুমুল) আক্লেপ (দুর্ভোগ) (ওয়াইলু) সেই কারণে যাহা (মিম্মা) তোমরা রচনা করিয়াছ (তাসিফুন)।

বরং আমরা সত্য দিয়া নিক্লেপ করি অথবা আঘাত করি মিথ্যার উপরে, সুতরাং (উহা) চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়, সুতরাং তখন তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং তোমাদের জন্য (আছে) আক্লেপ তথা দুর্ভোগ সেই কারণে (যাহা) তোমরা রচনা করিয়াছ।

১৯. এবং (ওয়া) তাঁহারই (লাহ) যাহা কিছু (মান) মধ্যে আছে (ফি) আকাশগুলি (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়াল) জমিনের (আর্দি) এবং (ওয়া) যাহা আছে (মান) তাঁহার কাছে (ইন্দাহ) না (লা) তাহারা অহংকার (-বশে) বিরত থাকে (ইয়াস্তাক্বিরুনা) হইতে (আন) তাঁহার এবাদত (ইবাদাতিহি) এবং (ওয়া) না (লা) তাহারা ক্লান্ত হয় (ইয়াস্তাহসিরুনা)।

এবং আকাশগুলি এবং জমিনের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাঁহারই। এবং যাহা (আছে) তাঁহার কাছে তাহারা অহংকার (-বশে) বিরত থাকে না তাঁহার (আল্লাহ) এবাদত হইতে এবং তাহারা ক্লান্ত (পরিশ্রান্ত) হয় না।

২০. তাহারা তসবিহ করে (ইউসাব্বিহনাল) রাত্রে (লাইল) এবং (ওয়া) দিনে (নাহার) না (লা) তাহারা চিলান্নি (শৈখিল্য) (ইয়াফতুরুন)।

দিনে এবং রাত্রে তাহারা তসবিহ করে (এবং) তাহারা চিলান্নি (শৈখিল্য, যেম্বে যাওয়া, কুঁড়েমি) (করে) না।

২১. কি (আমিত) তাহারা বানাইয়া লইয়াছে (তাখাজু) ইলাহরূপে (আলিহাতাম) মধ্য হইতে (মিনাল) মাটি (আরদি) তাহারা (হম) উঠাইতে পারে (ইউনশিরুন)।

তাহারা কি ইলাহরূপে (মাবুদরূপে) বানাইয়া লইয়াছে মাটির মধ্য হইতে। তাহারা উঠাইতে পারে (কি)?

২২. যদি (লাও) হইত (কানা) তাহাদের উভয়ের মধ্যে (ফিহিমা) ইলাহ (মাবুদ) (আলিহাতুন) ছাড়া (ব্যতীত) (ইল্লা) আল্লাহ (আল্লাহ) অবশ্যই উভয়েই ফ্যাসাদ (ধ্বংস) করিত (লাফাসাদাতা)। সুতরাং ভাসমান (ফাসুবহানা) আল্লাহ (আল্লাহ) রব (রাব্বিল) আরশের (আরশি) তাহা হইতে যাহা (আম্মা) তাহারা বর্ণনা করে (ইয়াসিফুন)।

আল্লাহ ছাড়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে যদি (আরও অনেক) ইলাহ হইত অবশ্যই উভয়েই ফ্যাসাদ (ধ্বংস) করিত। সুতরাং আরশের রব আল্লাহ ভাসমান। তাহা হইতে যাহা তাহারা বর্ণনা করে।

২৩. না (লা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে (ইউসআলু) ওই বিষয়ে যাহা (আম্মা) তিনি করেন (ইয়াফআলু) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) জিজ্ঞাসিত হইবে (ইয়ুসআলুন)।

ওই বিষয়ে, তিনি যাহা করেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে না, বরং তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।

২৪. কি (আমিত) তাহারা গ্রহণ (প্রাপ্তি, ধারণ, অবলম্বন, বরণ, মানিয়া লওয়া) তাহারা গ্রহণ করিয়াছে (তাখাজু) হইতে (মিন) তাহাকে ছাড়া (বদলান, পরিবর্তন করা, উপেক্ষা করা, বহির্ভূত, ব্যতীত) (দুনিহি) ইলাহরূপে (মাবুদরূপে)

(আলিহাতান) বলুন (হে নবি) (কুল), পেশ করো (উপস্থিত, আনয়ন, প্রস্তাবন, অবতারণা, উত্থাপন করো) (হাতু) তোমাদের দলিল (প্রমাণ, স্বত্বসাব্যস্তকারী পত্র) (বুরহানাকুম) এইটা (হাজ্জা) জিকির (জিক্র) যাহারা (মান) আমাদের সাথে (মাইয়া) এবং (ওয়া) জিকির (জিক্র) যাহারা (মান) আমার আগে (কাবলি) বরং (বাল) অধিকাংশই (আক্সার) তাহাদের (হম) না (লা) জানে (ইয়ালামুন) একমাত্র সত্যকে (আল্ হাক্কা) তাহার ফলে (ফাহম) মুখ ফিরাইয়া লয় (মুরিদুন)।

তাহারা গ্রহণ করিয়াছে কি তাঁহাকে (আল্লাহকে) ছাড়া ইলাহরূপে তথা উপাস্যরূপে? বলুন (হে নবি), তোমাদের দলিল (প্রমাণ) পেশ করো এইটা জিকির যাহারা আমার সাথে (আছেন) এবং জিকির আমাদের আগে যাহারা (তাহাদেরও)। বরং তাহাদের অধিকাংশই একমাত্র সত্যকে জানে না। তাহার ফলে মুখ ফিরাইয়া লয়।

২৫. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) পাঠাইয়াছি (আরসালনা) হইতে (মিন) আপনার আগে (কাবলিকা) রসূলকে (রাসূলিন) একমাত্র (ইল্লা) আমরা (আল্লাহ) ওহি করিয়াছি (নুহি) তাহার দিকে (ইলাইহি) নিশ্চয়ই তিনি (আননাহ) নাই (লা) কোনো ইলাহ (ইলাহা) একমাত্র (ইল্লা) আমি (আনা) সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো (ফাবুদুন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) পাঠাই নাই আপনার আগে কোনো রসূলকে আমরা একমাত্র তাহাদের কাছে ওহি করিয়াছি। নিশ্চয়ই তিনি, নাই কোনো ইলাহ একমাত্র আমি (আল্লাহ) (ছাড়া) সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো।

২৬. এবং (ওয়া) তাহারা বলে (কালু) গ্রহণ করিয়াছেন (তাখাজ্জার) রহমান (রাহমান) সন্তান(ওয়ালাদান) তিনিই ভাসমান (সুবহানাহ) বরং (বাল) বান্দা (ইবাদুন) সন্তানিত (মুক্‌রামুন)।

এবং তাহারা বলে রহমান (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই ভাসমান বরং সন্তানিত বান্দা।

নফস তথা জীবাত্মা সন্তান গ্রহণ করে, কিন্তু রুহ তথা আল্লাহর সন্তান গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না বরং খান্নাসমুক্ত নফসের অধিকারী বান্দারা আল্লাহর নিকট সন্তানিত। এই বিষয়টি না বোঝার দরুন অনেকেই ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। এমনকি জিনও যখন কিছু বলে তা মানুষের সুরতেই বলে। সুরতে মানুষ, কিছু কথা বলছে জিন, তাই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। সুরতে মনসুর হাল্লাজ, কিছু কথা বলছেন আল্লাহ। সুরতে মানুষ বায়েজিদ বোস্তামি, কিছু বায়েজিদের কণ্ঠ হতেই বলা হচ্ছে, আনা সুবহানি মা আজামুশ শানি তথা ‘আমিই সুবহানি এবং সব শান আমারই।’ বায়েজিদের কণ্ঠে আল্লাহ স্বয়ং এই কথাটি বলছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে এই কথাটি বায়েজিদই বলছেন। কিন্তু আসলে যার কথা সে-ই বলছেন। ভুল আর বিভ্রান্তির অবকাশ তো থাকারই কথা; তাই ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে এবং আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের অনুসারীদেরকে ‘বুৎপরস্তু’ বলে গালি দেয়। অবশ্য চরম সত্যে ওহাবিদেরকেও দোষারোপ করা যায় না। কারণ তকদিরে তাদেরকে বুঝবার রহমতটি দান করা হয় নি। ওহাবিরা মনে করেন, কী! এ রকম কথা বায়েজিদ বলছেন! অথচ বায়েজিদের কণ্ঠে আল্লাহ সুবহানু তায়ালা স্বয়ং বলছেন। আর ওহাবিদের দোষ দিয়েই বা কী লাভ? কারণ রুহকেও তারা ‘নূরানি মাখলুক’

আখ্যা দিয়ে ফেলেছেন। নুরানি অর্থ নুরের আর মাখলুক অর্থ হলো সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি কখনও স্রষ্টা হয় না, তদ্রূপ স্রষ্টাও কখনও সৃষ্টি হয় না। নফস মানুষেরই আছে, কিন্তু আল্লাহ নফস হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আপন নফসের সঙ্গে আল্লাহ বান্দাকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানকে দিয়েছেন। আবার সেই সঙ্গে আল্লাহ বলেন যে, আমরা (আল্লাহ) তোমাদের শাহারগের তথা জীবনরগের কাছেই আছি। ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বান্দা যখন আপন নফসকে খান্নাসমুক্ত করতে পারেন, তখনই সেই বান্দার কণ্ঠে আল্লাহ কথা বলেন। সেই বান্দার চোখে আল্লাহ দেখেন। সেই বান্দার কানে আল্লাহ শোনে। সেই বান্দার হাতে আল্লাহ স্পর্শ করেন। যদিও বুখারি শরিফ-এর ইহা একটি মশহুর হাদিস ॥ কিন্তু ওই যে, ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকানোর দরুন ভুল সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা একান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং হাকিকতে কাকে দোষ দেব?

২৭. না (লা) তাহারা আগে বাড়িয়া তাঁহার (আল্লাহর) (ইয়াস্বিকুনাহ) কথার দ্বারা (বিলকাউলি) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) তাঁহার (আল্লাহর) হকুম মতো (বিআমরিহি) কাজ করেন (ইয়ামালুন)।

এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহর) আগে বাড়িয়া কথা বলেন না এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহর) হকুমমতো কাজ করেন।

২৮. তিনি জানেন (ইয়ালানু) যাহা (মা) মধ্যে (বাইনা) তাহাদের সামনে (আইদিহিম) এবং (ওয়া) যাহা (মা) তাহাদের পিছনে (খাল্ফাহম) এবং (ওয়া) না (লা) তাহারা শাফায়াত (সুপারিশ) করেন (ইয়াশ্ফাউনা) একমাত্র (ইল্লা) তাহাদের জন্য (লিমানির) রাজি হন (তাদওয়া) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) হইতে (মিন) তাহারা ভয়ে (খাশ্ইয়াতিহি) ভীত সন্ত্রস্ত (মুশ্ফিকুন)।

তিনি (আল্লাহ) জ্ঞানে যাহা তাহাদের সামনে এবং যাহা তাহাদের পিছনে (আছে) এবং তাহারা সুপারিশ করিবেন না একমাত্র তাহাদের জন্য (যাহাদের প্রতি আল্লাহ) রাজি হন এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহর) ভয়ে ভীতসম্বৃত।

২৯. এবং (ওয়া) কেহ (মাই) বলে (ইয়াকুল) তাহাদের মধ্য হইতে (মিন্‌হুম) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) একজন ইলাহ (ইলাহুম) ব্যতীত (মিন্) তিনি (দুনিহি) সুতরাং ওই কারণে (ফাজালিকা) আমরা তাহাকে শাস্তি দিব (নাজ্জিহি) জাহান্নামে (জাহান্নাম) ওইরূপে (কাজালিকা) আমরা শাস্তি দেই (নাজ্জিজ্) জালিমদিগকে (জালেমিন)।

এবং কেউ (যদি) বলে তাহাদের মধ্য হইতে নিশ্চয়ই আমিও একজন ইলাহ (মাবুদ) তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত, ওই কারণে আমরা তাহাকে শাস্তি দিব জাহান্নামে ওইরূপে আমরা জালিমদেরকে শাস্তি দেই।

৩০. কি (আওয়া) না (লাম্) ভাবিয়া দেখে (ইয়ারাল্) যাহারা (লাজিনা) অস্বীকার করিয়াছে (কাফারু) যে (আন্নাস্) আকাশমণ্ডলি (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়াল্) জমিন (আরদা) উভয়েই ছিল (কানাতা) মিলিত অবস্থায় (রাত্কান্) সুতরাং উভয়কে আমরা পৃথক করিয়া দিয়াছি (ফাফাতাক্‌নাহুমা) এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআল্‌না) হইতে (মিনাল্) পানি (মায়ি) প্রত্যেক (কুল্লা) জিনিস (শাইয়িন্) জীবন্ত (হাইয়িন্), তবুও কি না (আফালা) তাহারা ইমান আনে (ইউমিনুন)।

যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (তাহারা) কি ভাবিয়া দেখে না যে আকাশমণ্ডলি এবং জমিন উভয়েই ছিল মিলিত অবস্থায়, সুতরাং আমরা (আল্লাহ) উভয়কে পৃথক

করিয়া দিয়াছি এবং আমরা প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস পানি হইতে বানাইয়াছি, তবুও কি তাহারা ইমান আনে না?

এই আয়াতটি হতে আমরা দুটি বিষয় জানতে পারলাম : একটি হলো, আসমান এবং জমিন মিলিত অবস্থায় ছিলো এবং এই দুটিকে আল্লাহ আলাদা করে দিয়াছেন। আর অপরটি হলো, সৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হলো পানি হতে। পানি হতেই প্রতিটি জীবকে বানানো হয়েছে রূপান্তর এবং বিবর্তনের মাধ্যমে এবং এই রূপান্তর ও বিবর্তন কোটি কোটি বছরের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই দুইটি বিষয় এই আয়াত হতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারি যে যেখানে পানি নাই সেখানে নফসওয়ালা জীবেরও অস্তিত্ব নাই এবং ফেরেশতারা যে জীবের বহির্ভূত সেকাতি নুরের সত্তা ইহাও পরিষ্কার বোঝা যায়। কারণ ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই। সুতরাং জীবের আওতায় ফেরেশতাদেরকে কোনো অবস্থাতেই ধরা যায় না।

৩৬. এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআলনা) মধ্যে (ফিল) জমিন (আর্দি) পর্বতগুলি (রাওয়াসিয়া) যেন (আন) তাহা চলিয়া পড়ে তাহাদের-সহ (তাম্বিদাবিহিম) এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআলনা) ইহার মধ্যে (ফিহা) প্রশস্ত (চওড়া) (ফিজাজান) রাস্তাগুলি (সুবুলান) তাহারা যেন (লাআল্লাহম) গন্তব্যস্থলে যাইতে পারে (ইয়াহকাদুন)।

এবং জমিনের মধ্যে পর্বতগুলি আমরা (আল্লাহ) বানাইয়াছি যেন তাহা চলিয়া (না) পড়ে তাহাদের সহ এবং প্রশস্ত রাস্তাগুলি ইহার মধ্যে বানাইয়াছি যেন তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে পারে।

৩২. এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআলনাস্) আকাশকে (সাম্মাতা) ছাদস্বরূপ (সাক্ফাম্) সুরক্ষিত (মজবুত) (মাহ্ফুজ্) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্) হইতে (আন) তাঁহার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলি) (আয়াতিহা) মুখ ফিরাইয়া নেয় (মুরিদুন)।

এবং আমরা আকাশকে মজবুত ছাদস্বরূপ বানাইয়াছি এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহর) আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়।

৩৩. এবং (ওয়া) তিনিই যিনি (হয়াল্লাজি) সৃষ্টি করিয়াছেন (খালাকাল্) রাত্রি (লাইলা) এবং (ওয়া) দিন (নাহার) এবং (ওয়া) সূর্য (শাম্স) এবং (ওয়া) চন্দ্র (কাম্মার) সবই (কুল্লু) মধ্যে (ফি) কল্পপথে (ফালাকিন্) বিচরণ করে (ইয়াস্বাহন)।

এবং তিনিই যিনি দিন এবং রাত্রি(-কে) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র ও সূর্য (-কে)। প্রত্যেকেই কল্পপথের মধ্যে বিচরণ করিতেছে।

৩৪. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) বানাইয়াছি (জাআলনা) কোনো মানুষের জন্য (লে বাশারিন্) হইতে (মিন্) আপনার আগে (কাবলিকাল্) অনন্ত জীবন (খুলদা) যদি তবে কি (আফাইন্) আপনি মৃত্যুবরণ করেন (মিত্তা) সুতরাং তাহা হইলে (ফাহমুল্) চিরজীব (খালেদুন)।

এবং (হে নবি) আপনার আগে কোনো মানুষের জন্য আমরা বানাই নাই অনন্ত জীবন যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন তবে কি তাহারা চিরজীব হইবে?

৩৫. প্রত্যেক (কুল্লু) নফসই (নাফসিন্) স্বাদ গ্রহণ করিবে (জায়িকাতুল্) মৃত্যু (মউত্) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করি (নাবলুকুম্) মন্দ

দিয়া (বিশ্শাররি) এবং (ওয়া) ভালো (খাইরি) পরীক্ষা (ফিত্নাতান) এবং (ওয়া) আমাদের দিকেই (ইলাইনা) তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে (তুরজাউন)।

প্রত্যেক নফসই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং তোমাদেরকে আমরা পরীক্ষা করি ভালো এবং মন্দ দিয়া এবং আমাদের দিকেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

৩৬. এবং (ওয়া) যখন (ইজা) আপনাকে দেখে (রাআকা) যাহারা (আল্লাজিনা) অস্বীকার করিয়াছে (কাফার) না (ইন) আপনাকে তাহারা গ্রহণ করিবে (ইয়াত্থাখেজুনাকা) একমাত্র (ইল্লা) তাঁটার পাত্ররূপে (হজুআ) এই কি (আহাজাল) যে (আল্লাজি) সমালোচনা করে (ইয়াজ্কুর) তোমাদের ইলাহগুলিকে (আলিহাতাকুম) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) জিকিরের সহিত (বিজিকরি) রহমানের (রাহমানি) তাহারাই (হম) কাফের (কাফরুন)।

এবং যখন আপনাকে দেখে (এবং) যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (এবং) আপনাকে তাহারা গ্রহণ করিবে না একমাত্র তাঁটার পাত্ররূপে (এবং বলে) এই কি (সেই ব্যক্তি) যে সমালোচনা করে তোমাদের ইলাহগুলিকে এবং তাহারাই রহমানের জিকিরের অস্বীকারকারী।

৩৭. সৃষ্টি করা হইয়াছে (খুলিকাল) মানুষকে (ইনসান) হইতে (মিন) তাড়াহড়া (আজালিন) তোমাদেরকে অচিরেই আমি দেখাইব (সাউরিকুম) আমার আয়াতগুলি (আয়াতি) সুতরাং না (ফালা) আমার কাছে তোমরা তাড়াহড়া করিও (তাস্তাজিলুন)।

মানুষকে তৈরি করা হইয়াছে (আপন খেয়ালখুশির) তাড়াহড়া দিয়া আমার আয়াতগুলি অচিরেই তোমাদেরকে আমি দেখাইব। সুতরাং আমার কাছে তোমরা (খেয়ালখুশির বশবর্তী হইয়া) তাড়াহড়া করিও না।

যেহেতু মানুষকে আল্লাহই চঞ্চলমতির করে তৈরি করেছেন সেহেতু প্রতিটি কাজে-কর্মে মানুষের মধ্যে তাড়াহড়া করার প্রতিচ্ছবিটি ফুটে ওঠে। তাড়াহড়া করার পেটেই জন্ম নেয় অস্থিরতা, চঞ্চলতা। মানুষের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আল্লাহই দুনিয়াতে পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন। তাই তাড়াহড়া করার চঞ্চলতাটি থাকা একান্ত স্বাভাবিক। স্থিরতা তখনই আসে যখন মানুষ ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে অথবা আপন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে অথবা যার যার নফসের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসটিকে মুসলমান বানাতে পারে। তখনই আপন নফস তথা আপন প্রাণ শান্ত হয়ে যায়। তাই খান্নাসমুক্ত নফসটিকে তথা প্রাণটিকে বলা হয় নফসে মোৎমায়েন্না এবং তখনই সেই মোৎমায়েন্না নফস জাহ্নামের সুসংবাদ পাবার ঘোষণার মর্মার্থটি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারে।

৩৮. এবং (ওয়া) তাহারা বলে (ইয়াকুলুনা) কখন (মাতা) এই (হাজাল) ওয়াদা (ওয়াদু) যদি (ইন) তোমরা (হও) (কুনতুম) সত্যবাদী (সোয়াদেকিন)।

এবং তাহারা বলে এই ওয়াদা কখন (পূর্ণ হইবে) যদি তোমরা (হও) সত্যবাদী।

৩৯. যদি (লাও) জানিত (ইয়ালামুন) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) সেই সময় (হিনা) না (লা) তাহারা প্রতিরোধ (নিবারণ, বাধাদান, নিরোধ, অবরোধ, প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত) করিতে পারিবে (ইয়াকুফুনা) হইতে (আন) তাহাদের মুখমণ্ডলগুলি (আনন, বদন) (উজুহিহিম) আগুন (অগ্নি, অনল,

বহিঃ, পাবক, হতাশন, বৈশ্বানর) (নার) এবং (ওয়া) না (লা) হইতে (আন) তাহাদের পৃষ্ঠ (পিঠ, বন্ধের বিপরীত দিক, পিছন দিক)-সমূহ (জুহরিহিম) এবং (ওয়া) না (লা) তাহাদের (হম) সাহায্য (সহায়তা, আনুকূল্য) করা হইবে (ইউনসারুন)।

যাহারা কুফরি করিয়াছে (হায়) যদি জ্ঞানিত সেই সময় (যখন) তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না তাহাদের মুখমণ্ডলগুলি হইতে আগুন। এবং না তাহাদের পৃষ্ঠসমূহ হইতে এবং তাহাদের সাহায্য করা হইবে না।

৪০. বরং (বাল) তাহাদের কাছে আসিবে (তাতিহিম) অতর্কিতভাবে (অসতর্ক অবস্থায়, হঠাৎ, অচিন্তিতভাবে, অবিবেচিতভাবে, অলক্ষিতে) (বাগ্‌তাতান) সুতরাং তাহাদেরকে হতভম্ব (কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতবুদ্ধি, কর্তব্য স্থির করিতে অক্ষম) করিয়া দিবে (ফাতাব্‌হাতুহম) সুতরাং না (ফালা) তাহারা সক্ষম (সমর্থ, শক্তিয়ুক্ত, পারগ, উপযুক্ত, কর্মক্ষম) হইবে (ইয়াস্তাতিউনা) তাহারা রোধ (বাধা, অবরোধ) করিতে (রাহ্‌দাহা) এবং (ওয়া) না (লা) তাহাদের (হম) অবকাশ (বিরাম, ফুরসত, অবসর, ছুটি) দেওয়া হইবে (ইউনজারুন)।

বরং অতর্কিতভাবে তাহাদের কাছে আসিবে সুতরাং তাহাদেরকে হতভম্ব করিয়া দিবে তখন না তাহা রোধ করিতে (না) তাহারা সক্ষম হইবে এবং না তাহাদেরকে অবকাশ দেওয়া হইবে।

৪১. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাহ্) ঠাট্টা (বিদ্রুপ, শ্লেষমিশ্রিত উপহাস) করা হইয়াছে (ইস্তুহজিয়া) রসুলদের সহিত (বিরুসুলিম) হইতে (মান) তোমার আগে (কাবলিকা) সুতরাং ঘিরিয়া (বেষ্ঠন করিয়া, আচ্ছাদিত করিয়া, আবৃত করিয়া) (ফাহাকা) তাহাদেরকে (বিল্লাজিনা) ঠাট্টা করিয়াছিল (যাহারা) (সাখিরু)

তাহাদের মধ্য হইতে (মিন্‌হম্ম) যাহা (ম্মা) তাহারা ছিল (কানু) যাহা লইয়া (বিহি) বিদ্রুপ করিত (ঠাট্টা করিত) (ইয়াস্তাহজিউন)।

এবং নিশ্চয়ই আপনার আগের রসুলদেরকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদেরকে ঘিরিয়া লইয়াছিল (যাহারা) ঠাট্টাবিদ্রুপ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে ওই জিনিস (বিষয়) যাহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্রুপ করিত।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের শুরু হতে কেবল নবি এবং রসুলেরাই ঠাট্টাবিদ্রুপের পাত্র হন নি, বরং সাধারণ মানুষের মধ্য হতে যারা একটু অসাধারণ তারাও সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে উপহাসের পাত্রে যে পরিণত হয়েছেন তারও অনেক অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায় এবং এখনও এই দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটতে দেখি। নবি-রসুলেরা কতটুকু নুরের তৈরি তা আল্লাহই ভালো জানেন, কিন্তু মহানবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (আ.) আল্লাহর জাতনুর হতে বিচ্ছিন্ন করা একটি টুকরো, যাকে আমরা ভাষায় বুঝবার জন্য আল্লাহর নুরের সৃষ্টি বলে থাকি। হাকিকতে মহানবির জন্য ‘সৃষ্টি’ শব্দটি অবৈধ। কিন্তু একই আল্লাহর একই নুরকে খণ্ডিত করলেই উহা আর সৃষ্টির আওতায় পড়ে না। তাই হজরত হাজি এমদাদুল্লাহ মোহাম্মদের মক্কি বলে গেছেন যে, মহানবি এবং আল্লাহ একই নুর এবং যারা উহাকে অস্বীকার করবে তারা কাফের। তা ছাড়া কোরান-হাদিস হতেও মহানবি যে আল্লাহর জাত নুর হতে ছিন্ন করা অপর একটি নুর উহার দলিল আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা উনিশবার তুলে ধরেছেন। যদিও ওহাবিরা শত দলিল দিলেও মানবে না এবং মানেও নাই। উহাতেও ওহাবিদের অনেক গালি দেওয়া যায়, কিন্তু হাকিকতে একটিও গালি দেওয়া যায় না। আল্লাহ ওহাবিদের মেনে নেবার তকদির দিয়ে বানান নাই। তকদিরে যদি না থাকে তা হলে হাজার

রকম দলিল দিলেও মেনে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, যদিও আট পুরুষ আগের মানুষটির নাম ছিল শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌহান। শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌহানের বাপ-দাদারা গীতা-উপনিষদ-বেদ-রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে গেছেন। কিন্তু শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌহানের ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে যখন মিয়াজান নাম ধারণ করলেন তখন থেকেই আমরা মুসলমান এবং অধম লিখকও মুসলমান। সুতরাং কোরান-হাদিস নিয়েই গবেষণা করছি এবং কোরান-হাদিস-এর গবেষণালব্ধ বিষয়গুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। কিন্তু আজ যদি আমি হিন্দুই থাকতাম তা হলে এই কোরান-হাদিস-এর গবেষণাটি করতাম কিনা জানি না। হয়ত তখন বেদ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-চণ্ডী ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করতাম। তা হলে বুকে হাত রেখে পাঠকদেরকে একটি প্রশ্নই করতে চাই যে জন্মই আমার আজন্ম আশীর্বাদ, না হয় অভিশাপ, না হয় তকদির। এই তকদিরকে কয়জনে খণ্ডন করতে পেরেছে? এই তকদিরের বলয় হতে বেরিয়ে আসা চারটিখানি কথা নয়, বরং একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং আবার বলছি, শেষবারের মতো বলছি, প্রতিটি মানুষের জন্মই তার আজন্ম আশীর্বাদ, নয়তো অভিশাপ, নয়তো কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ থাকা তকদির।

৪২. বলুন (হে নবি) (কুল) কে (মান) তোমাদেরকে রক্ষা (উদ্ধার, পরিত্রাণ, অব্যাহতি, নিষ্কার, তত্ত্বাবধান) করিতে পারে (ইয়াক্লাউকুম) রাতে (বিল্লাইলি) এবং (ওয়া) দিনে (নাহারি) হইতে (মিন) রহমান (রাহমান) বরং (বাল) তাহারাই (হম) হইতে (আন) জিকির (জিকরি) তাহাদের রব (রাব্বিহিম) মুখ ফিরাইয়া লয় (মুরিদুন)।

বলুন (হে নবি) কে তোমাদেরকে রক্ষা করিতে পারে রাতে এবং দিনে রহমান (আল্লাহ) হইতে, বরং তাহারাই তাহাদের রবের জিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

জিকির শব্দটির অর্থ হলো যোগাযোগ অথবা সংযোগ। অতি সূক্ষ্ম এবং অতি উচ্চমার্গের ভাষাটি হলো, ‘স্মরণ’। জাহেরি জিকির করতে হলে পীরে কামেলের চেহারা-সুরত ধ্যানের মাধ্যমে সামনে রেখে করতে হয়। এই জিকিরটি একদম নির্জনে অথবা কোনো পর্বতগুহায় কামেল পীরের ধ্যানসহ একাগ্রমনে ধৈর্যধারণ করে কয়টি বছর করতে পারলেই আল্লাহর রহস্যলোকের কিছু না কিছু দর্শন করা যাবেই। সবাই মিলে জিকির করাও সুন্দর এবং ভালো। কিন্তু আল্লাহর গোপন রহস্যগুলো ইহাতে ধরা পড়বে না। আল্লাহর সঙ্গে গুপ্তমিলনের আশা থাকলে কোনো নির্জন স্থানে ছোট্ট একটি ঘর বানিয়ে একাকী জিকিরে মগ্ন থাকলে অবশ্যই রহস্যলোকের দর্শন পাওয়া যায়। এই জিকিরের মাধ্যমে এবং অতি অল্প সময়ে কেমন করে আল্লাহকে পাওয়া যায় তারই বিস্তারিত ফর্মুলাটি যিনি অতি সুন্দর করে বলে গেছেন পৃথিবী বিখ্যাত ঠলিয়ে কামেল হজরত বাবা শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দর। সুতরাং যেখানে সেখানে আউরাতাউরা (উলটাপালটা) খেয়ালখুশিমতো এই জিকির করলে অবশ্যই কাঁচকলা পাওয়া যাবে। তাই আমরা পঁচিশ বিঘা জমির উপরে একটি নির্জন স্থানে ৫৫ বান চেউটিন দিয়ে ঘেরাও দিয়ে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদা করার জন্য বেশ কয়েকটি ঘর তৈরি করেছি। অনেকে এই ধ্যানসাধনার স্থানটিকে ধ্যানসাধনার স্কুলও বলে থাকেন। আসুন, মাত্র ১২০ দিন এই স্কুলে হজরত শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দর পানিপথির দেওয়া মোরাকাবাটিকে অনুসরণ করে জিকিরে মগ্ন থাকুন, অবশ্যই কিছু না কিছু

রহস্যলোকের দর্শন পাবেন। অন্যথায় অধম লিখককে যা-ইচ্ছা-তাই বললেও মাথা নিচু করে থাকবো।

৪৩. কি (আম) তাহাদের আছে (লাহম) অনেকগুলি ইলাহ (ইলাহসমূহ, ইলাহগুলি, রূপক ভাষায় : দেবদেবী) (আলিহাতুন) তাহাদেরকে রক্ষা (উদ্ধার, পরিব্রাণ, অব্যাহতি, নিস্তার, তড়াবধান) করিতে পারে (তাম্নাউহম) হইতে (মিন) আমাদের ছাড়া (দুনিনা) না (লা) তাহারা সক্ষম (সমর্থ, শক্তিযুক্ত) (ইয়াস্তাতিউন) সাহায্য (সহায়তা, আনুকূল্য) করিতে (নাসরা) তাহাদের নফসের (নিজেদের) (আনফুসিহিম) এবং (ওয়া) না (লা) তাহাদের (হম) আমাদের পক্ষ (তরফ, দিক) হইতে (মিননা) সহযোগিতা (সহায়তা, সাহায্য) দেওয়া হইবে (ইউস্হাবুন)।

তাহাদের রক্ষা করিতে পারে (এই রক্ষম) ইলাহগুলি তাহাদের আছে কি? (একমাত্র) আমাদের ছাড়া? না তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে তাহারা সক্ষম এবং আমাদের (আল্লাহ) পক্ষ হইতে সহযোগিতা তাহাদের দেওয়া হইবে না।

র নিছক মাটি পাথর অথবা অন্য যে কোনো ধাতুর তৈরি মূর্তিগুলি যে কোনো কিছুই করতে পারে না সেই কথাটি এখানে বলা হয়েছে। আমার মনে হয় বিভিন্ন ধাতুতে তৈরি এই মূর্তিগুলিকে কাফেরেরা দেবদেবীর মর্যাদার আসনে বসিয়ে উপাস্যরূপে গ্রহণ করতো সেই বিষয়টিতেই আল্লাহ নবির মাধ্যমে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। মানুষই মানুষের উপকারও করতে পারে আবার ক্ষতিও করতে পারে ইহা একটি অপ্রিয় সত্য কথা, কিন্তু নিজেদের নফসের খেয়ালখুশিমতো বানানো মূর্তিগুলো না পারে উপকার করতে আর না পারে কোনো অপকার করতে। এইসব বানানো মূর্তিগুলোকে যদি চেন্সিস খাঁ, হালাকু খাঁ, তৈমুর লঙ্,

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, হিটলার, মুসোলিনি-র মতো জঘন্য এবং চিরঘৃণ্য মানুষরূপী অসুরগুলির নামও দেওয়া হয় তবু এরা মানুষরূপী অসুর নয়। এরা কেবলমাত্র নিজেদের নফসের খেয়ালখুশিমতো বানানো অথর্ব মূর্তিমাত্র।

৪৪. বরং (বাল) আমরা ধনদৌলত (ভোগসামগ্রী) দিয়াছি (মাত্তানা) তাহাদেরকে (হাউলাই) এবং (ওয়া) পূর্বপুরুষ (পিতৃপুরুষ)-দেরকে (আবাতা) তাহাদের (হম) এমনকি (হাত্তা) লম্বা (দীর্ঘ) হইয়াছিল (তাআলা) তাহাদের জন্য (আলাইহিম) আয়ুষ্কাল (বয়স) (উমুরু) সুতরাং না কি (আফালা) তাহারা দেখে (ইয়ারাউনা) যে আমরা (আননা) আনিয়াছি (নাতিল) জমিনকে (আরদা) তাহা আমরা সংকুচিত (গুটাইয়া গিয়াছে এমন, সর্পিণ, অপ্রসারিত) করিয়াছি (নানকুসুহা) হইতে (মিন) চতুর্দিক (আত্ৰা) ইহার মধ্যে (ফিহা) সুতরাং তাহারা কি (আফাহম) বিজয়ী হইবে (গালিবুন)।

বরং তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) ভোগসামগ্রী দিয়াছি এবং এমনকি তাহাদের পূর্বপুরুষদেরকে(ও), তাহাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহারা কি দেখে না যে আমরা (আল্লাহ) জমিনকে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি তাহাদের চতুর্দিক হইতে? তারপরেও কি তাহারা বিজয়ী হইবে?

র সূরা আশ্বিয়ার এই আয়াতটির প্রকৃত অর্থটি কী হতে পারে অনেক গবেষণা, পরিশ্রম এবং বহু কোরান-এর তফসির পড়েও পাড়-কুল করতে পারলাম না। গৌজামিলের বস্তুটি দাঁড় করাতে চাইলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লেখাটা মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার ছিল। এবং তাতে নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়া হতো। তাই এর প্রকৃত ব্যাখ্যাটি লিখতে পারলাম না। কত রকমের যে গৌজামিলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে আর সেই ব্যাখ্যাটিকে আবার পাঠকের সামনে তুলে

ধরতে চাইলাম না। অনেকে লিখেছেন, কাফেরদের জন্য জমিনকে সংকুচিত করা হয়েছে ॥ কিন্তু এই জমিন কি মাটির জমিন? যদি ধরে নিই ইহা মাটির জমিন, তা হলে কমনবেশি সবার জন্যই এই জমিনকে সংকুচিত করা হয়েছে। যদি বলি বৈষয়িক বিষয়ের প্রস্নে মুসলমানদের জমিন দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে, তা হলেও সঠিক অর্থটি মিলাতে পারছি না। যদি বলি কাফেরদের দেহগুলিকে মনের প্রসারতার প্রস্নে সংকুচিত করা হচ্ছে, তা হলে এই আয়াতের অর্থটির মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই রকম অর্থটি না করে সোজাসুজি পাঠকদেরকে বলে দিলাম যে, এই আয়াতের অর্থটি অধম লিখকের জানা নাই। যে যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে সে সেই-ধর্মের গীত গায় তথা প্রশংসা করে। তা হলে এই জন্মগ্রহণ করাটাই কি একটি বিরাট আশীর্বাদ, না কি বিরাট একটি অভিশাপ, নাকি একটি বিরাট তকদির? পাঠকদের কাছে এই প্রশ্নটির উত্তর চাইলাম। তা হলে কোন ধর্মটি শুদ্ধ আর কোন ধর্মটি অশুদ্ধ এই বিষয়ের প্রস্নে আজীবন তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকবে। দুধ বিক্রি করে যারা তাদেরকে গোয়ালী বলা হয় এবং সব গোয়ালীই বলে যে তার দুধই ভালো। অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই কোরান-হাদিসের গবেষণা করছি। কিন্তু অন্য যে কোনো ধর্মে যদি জন্মগ্রহণ করতাম তা হলে অধম লিখকের অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? তা হলে জন্মটাই কি একটি আজন্ম বিরাট আশীর্বাদ, নাকি একটি বিরাট জগদ্বল পাথরের মতো ঠায় বসে থাকা তকদির?

৪৫. (আপনি) বলুন (কুল), নিঃসন্দেহে (মূলত) (ইন্নালা) আমি তোমাদের সাবধান (সতর্ক) করিতেছি (উন্জিরুকুম) ওহির দ্বারা (মাধ্যমে, সহিত) (বিলওয়াহি) এবং (কিন্তু) (ওয়া) না (লা) শোনে (ইয়াস্মাউ) বধির (কানে শোনে

না) (সুম্নু) কোনো আস্থান (ডাক) (দুয়াআ) যখন (ইজা) না (মা) তাহাদেরকে সতর্ক (সাবধান) করা হয় (ইউন্জারুন)।

হে নবি, (আপনি) বলুন, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করিয়াছি ওহির মাধ্যমে এবং (কোনো) বধির শোনে না কোনো ডাক (আস্থান) যখন তাহাদেরকে সতর্ক করা হয়।

র মানুষকে সতর্ক করা হয় অনেক রকম মাধ্যমে। অবশ্য এই আধুনিক যুগে অনেক রকম মাধ্যম আবিষ্কার করা হয়েছে। মুখের কথার দ্বারাও মানুষকে সাবধান করা যায় এবং রেডিও-টেলিভিশনের মতো বিভিন্ন মাধ্যমেও সতর্ক করা যায়। কিন্তু এখানে মানুষকে যে সতর্ক করা হচ্ছে উহা ওহির মাধ্যমে। নবি-রসুলরাই ওহির মাধ্যমে সাবধান করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহর মনোনীত রসুলকে দিয়ে আল্লাহর তরফ হতে মানুষদেরকে এখানে সাবধান করা হচ্ছে। সুতরাং এই সাবধানতার গুরুত্বটি অপরিগম্য। কিন্তু যে কানে শুনতে পায় না তথা বধির, তাকে ওহির মাধ্যমে সাবধান করে দিলেও সেই সাবধানবাণীটির উপর কোনো খেয়াল থাকে না। এই বধিরতা শব্দটি দিয়ে কানে একদম শুনতে পায় না যারা তাদের কথাটি বলা হয় নি, বরং যারা কানে পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু কোনো গুরুত্বই দেয় না ॥ এই জাতীয় মানুষদেরকেও কোরান বধির বলে আখ্যায়িত করেছে।

৪৬. এবং (ওয়া) যখন (যদি, অবশ্য) (লাইম) তাহাদেরকে স্পর্শ করে (মাস্‌সাত্‌হম) কিছুমাত্র (নাফ্‌হাতু) হইতে (মিন) আজাব (আজাবি) তোমাদের রবের (রাব্বিকা) তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে (লাইয়াকুলুনা) হায় আম্মাদের দুর্ভোগ (আক্লেপ) (ইয়াওয়াইলানা) নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না) ছিলাম আমরা (কুননা) জালম (জালিমিন)।

এবং নিশ্চয়ই যদি (তোমাদের রবের) সামান্য কিছু আজাব তাহাদেরকে স্পর্শ করে তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! নিশ্চয়ই আমরা জালিম ছিলাম।

এখানে যারা আল্লাহর ওহির মাধ্যমে যে সতর্কবাণীগুলো জানিয়ে দেওয়া হয় উহা কানে শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করে তথা মেকি বধির তাদেরকেই যখন আল্লাহর সামান্য শাস্তি স্পর্শ করে তখনই হঁশ আসে। হঁশ থাকা সত্ত্বেও যারা বেহঁশের ভান করে তারাই যখন আল্লাহর আজাবের সামান্য স্পর্শ অনুভব করে তখনই এই জাতীয় বধিরেরা অকপটে বলে ফেলে যে, ‘হায় আফসোস! আমরা আসলেই জালিম ছিলাম।’ ওহির মাধ্যমে শুনেও এই বধিরেরা কুছ-পরোয়া-নাহি ভাবখানা প্রদর্শন করেছে, কিন্তু যেইমাত্র আল্লাহর অতি সামান্য আজাব এই মেকি বধিরদেরকে স্পর্শ করেছে তখনই চিল্লাচিল্লি, কান্নাকাটি এবং হায় আফসোসের বিলাপ করার কথাটি এই আয়াতে জানতে পারলাম। এবং আরও জানতে পারলাম যে, এই মেকি বধিরেরা আজাবের স্পর্শে বিবেকের চৈতন্য জালিম হবার স্বীকৃতিটি দেয়। যেমন এরা মেকি বধির সাজে তেমনি আবার আজাবের স্পর্শ লাগলেই অকপট স্বীকৃতিটি এই আয়াতে দেখতে পাই। তাই এই মেকি বধিরেরা বলে ফেলে যে, ‘নিশ্চয়ই আমরা জালিম ছিলাম।’

৪৭. এবং (ওয়া) বিশেষরূপে স্থাপন (সংস্থাপন, প্রতিষ্ঠা) আমরা (আল্লাহ) (নাদাউল) মানদগুগুলি (দাঁড়িপাল্লাসমূহ) (মাওয়াজিনাল) ন্যায্যের (সুবিচারের, সততার) (কিস্তা) দিনের জন্য (লিইয়াওমিন্) কেয়ামতের (কিয়ামাতি) সুতরাং না (ফালা) জুলুম করা হইবে (তুজ্লামুন) নফসকে (নাফসুন) কিছুমাত্রও (শাইয়ান্) এবং (ওয়া) যদি (আন) হয় (কানা) পরিমাণও (মিস্কাল) একদানা

(হাব্বাতিন) হইতে (মিন) শস্যের (খার্দালিন) আমরা আনিব (আতাইনা) তাহাকে (বিহা) এবং (ওয়া) যথেষ্ট (কাফা) আমরাই (বিনা) হিশাব-গ্রহণকারীরূপে (হাসিবিন)।

এবং আমরা ন্যায়ের মানদণ্ডসমূহ বিশেষরূপে স্থাপন করিব কেয়ামতের দিনের জন্য সুতরাং কিছুমাত্র (কোনো) নফসকে জুলম করা হইবে না। এবং যদি (কৃতকর্মের) হয় শস্য হইতে একদানা পরিমাণও, তাকেও (সামনে) আমরা আনিব। এবং হিশাব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।

নিঃসন্দেহে এই ‘কেয়ামতের দিনের জন্য’ কথাটির দ্বারা একটি নফসের মৃত্যুঘটনাকেই বোঝানো হয়েছে বলে মনে করতে চাই। কারণ আমরা জানি, কেয়ামত দুই প্রকার : একটি বড় কেয়ামত, অপরটি ছোট কেয়ামত। যেদিন আল্লাহপাক সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য ধ্বংস করে দেবেন, সেই দিবসটিকেই বড় কেয়ামত বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার কোটি বছরের কম নয়। তারপরেও কথা থাকে যে বড় কেয়ামতের দিন আল্লাহ যখন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য ধ্বংস করে ফেলবেন তখন আর কোনো সৃষ্টিই থাকবে না। আর ছোট কেয়ামত হলো, একটি নফসের মৃত্যু-ঘটনা। সুতরাং কেয়ামত দিবসে যখন প্রতিটি নফসকে হিশাব গ্রহণের জন্য ওঠানো হবে তখন এই কথাটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো একরূপ ধারণ করে এই ধরাধামে আবার আসতে হবে। আমরা আল্লাহর একমাত্র দ্বীন তথা ধর্মটিকে যুগে যুগে অনেক ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছি। যদি খোদা না খাস্তা কেহ হিন্দুধর্মে জন্মগ্রহণ করেই ফেলে তো পুনর্জন্মবাদটিকে সে মেনে নেবে। এমনকি জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্মেও জন্মগ্রহণ করলে পুনর্জন্মবাদটিকে মেনে নেয়। যেহেতু আমরা মোহাম্মদি ইসলাম ধর্মে

জন্মগ্রহণ করেছি সেই হেতু পুনর্জন্মবাদটিকে পাশ কেটে কেয়ামত-দিবস তথা একটি নফসের মৃত্যুদিবসটিকে মেনে নেই। অতীব সূক্ষ্মবিষয় গুলো ধরা পড়ার কথা নয়, কিন্তু যারা সূক্ষ্ম জ্ঞানের সন্ধানে নিজেদের জীবনটিকে নিরপেক্ষ গবেষণায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাদের কাছে এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর রহস্য পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। পোড়া কপাইলা আরজ আলী মাতুব্বর কোরান-এ বর্ণিত সম্পত্তি-বণ্টনের হিসাবটিকে তথা আউলটিকে ভুল বলে প্রমাণ করতে অপচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বরের কি জানা ছিল না যে সেই সম্পদ-বণ্টনের হিসাবটি তথা আউলটি মাওলা আলি আলাইহেস সালাতুস সালাম (সম্ভবত) আটশ সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ করে সমাধানটি করে গেছেন? পোড়া কপাইলা আরজ আলী মাতুব্বরের সারসংক্ষেপ বক্তব্যটি এই ছিল যে, সামান্য অঙ্কশাস্ত্রটির সামনে সূক্ষ্ম হিসাবটি নেবার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আরজ আলী মাতুব্বর কি জানতেন না যে কী করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল? এই সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যিনি এই সৃষ্টি রহস্যের বিগ ব্যাং থিওরিটি দিয়ে গেছেন তিনিই অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই বিগ ব্যাং থিওরিটি দেড় হাজার বছর আগে কোরানুল করিম ঘোষণা করে গেছে। এ রকম অনেক বিজ্ঞানের বিষয়ে পরিষ্কার সমাধানগুলো যে কোরান দেড় হাজার বছর আগে দিয়ে গেছে তা দিনের পর দিন সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে চলছে। অথচ আরজ আলী মাতুব্বর, হাতে-গোনা কয়েকজন কাঠমোলা তাঁরই মায়ের জানাজা পড়তে অস্বীকার করার দরুন, তিনি সমগ্র মুসলিম জাতিকে নেতিবাচক মনোবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করতে কার্পণ্য করেন নি। দৃষ্টিভঙ্গি যখন কারো পুরোটাই নেতিবাচক হয়ে যায় তখন তার কাছে হতাশা ছাড়া আর কীইবা আশা করা যায়? কথায় বলে, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। আরজ আলী

মাতুষ্যের ম্লান দিগে মোহানন্দকে বিচার করে বিরাট ভুলটি করে গেছেন এবং এই ভুলের খেসারতটি আজও অনেককে বিভ্রান্ত করছে।

আল্লাহ এই আয়াতে আমাদেরকে এই বলে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, যদি তোমাদের একটি কর্মের তিলপরিমাণ গুণনও হয়, উহা তুলে ধরা হবে। সেই কর্মটি ভালো হোক আর মন্দই হোক অথবা মন্দের চেয়ে একদম জঘন্য মন্দও যদি হয়। এখানে জঘন্য কর্মের ফলটি বলতে বান্দার হককে অস্বীকার করা অথবা বান্দার হক আত্মসাৎ করা অথবা বান্দার হক বেমানান হজম করে ফেলা তথা মেরে দেওয়াটাকে আল্লাহ পাক জঘন্য কর্মফলের চেয়েও জঘন্য বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ এবাদত-বন্ধেগির প্রশ্নে যত না জাহান্নামে যাবে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি মানুষ বান্দার হক মেরে দেবার প্রশ্নে জাহান্নামে যাবে, কারণ আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, বান্দার হক মেরে দিলে কল্যাণ করার বিধানটি রাখা হয় নি, যতক্ষণ না যে-বান্দার হক মেরে দেওয়া হয়েছে সেই বান্দা কল্যাণ করে দেন। মানুষ বুঝতেই পারে না যে, বান্দার হক মেরে দিলে কী ভয়ংকর শাস্তিটি অপেক্ষা করছে।

আমরা অভিজ্ঞতার সাথে দেখে আসছি যে মানুষ যে-ধর্মের এমনকি একটি ধর্মের তেহাওর ফেরকার যে-ফেরকায় জন্মগ্রহণ করে সেই-ফেরকাটিকে শ্রেষ্ঠ ফেরকা বলে জাহির করে। ধর্ম তো অনেক বড় কথা, কিন্তু ধর্মের অনেক ফেরকাগুলো যখন সমাজের বুকে কিলবিল করছে এবং সেই কিলবিল-করা যে কোনো একটি ফেরকার অনুসারী মানুষটি সেই ফেরকাটিকে শ্রেষ্ঠ ফেরকা বলে জাহির করে। পৃথিবীতে মাত্র হাতে-গোনা কিছু লোক যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে সেই-ধর্মটিকে পরিত্যাগ করতে পেরেছে। কথায় বলে, মানুষ ঘরবাড়ি, ভিটামাটি

এমনকি জন্মভূমি পর্যন্ত হাসি-মুখে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে সেই-ধর্মটিকে কিছুতেই ফেলতে পারে না। যে কেউ যে কোনো ধর্মের অনুসারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করাটি কি একটি আশীর্বাদ নাকি একটি অভিশাপ, নাকি একটি তকদির? এই প্রশ্নের উত্তরে নিরপেক্ষ মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে মন্তব্য করাটিও যে কত বড় ভয়ংকর বিষয় তা আর বলার প্রয়োজন হয় না। ধর্মের বন্ধনটি যে কত ভয়ংকর শক্ত তা সবাই কমবেশি বুঝতে পারে। আজ অধম লিখক মোহাম্মদি ইসলাম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি এবং তেহাওর ফেরকার একটি ফেরকাতে অবস্থান করার কথাটি ঘোষণা করছি আর সেই ফেরকার নামটি হলো আহলে সুন্নাতুল জামাত। আবার এই আহলে সুন্নাতুল জামাতের কয়েকটি উপশাখাও আছে। অধম লিখক নিজেকে যতই ‘নিরপেক্ষ’, ‘নিরপেক্ষ’ বলে চিৎকার করছি, কিন্তু আসলেই কি আমি নিরপেক্ষ, নাকি কাঁধের ওপর সাইনবোর্ডটি ঝুলছে? অধম লিখক যদি অন্য যে কোনো ধর্মে জন্মগ্রহণ করতাম, তা হলে কি সেই ধর্মের যাবতীয় গ্রন্থসমূহের গবেষণা ও জাহির করতাম না? সুতরাং জন্মের আগেই এই দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ আজন্ম বোঝাটি বইছে ॥ এ জন্য দায়ী কে? আমি, না যিনি আমাকে তৈরি করেছেন? কেন এই ধর্মের দেয়ালগুলো ভেঙে সার্বজনীন সনাতন একটিমাত্র ধর্মের ছায়াতলে আমরা সমবেত হতে পারছি না? আমার কথাগুলো আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে হালকা, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই কথাগুলো যে কত ভয়ংকর গভীর তা বুঝেও বুঝতে চাই না। পরিশেষে একটি অতীব গুঢ় রহস্যময় সত্যকথাটি বলতে চাই আর সেই সত্যকথাটি হলো : স্রষ্টা যাকে যেখানে বসিয়ে রেখেছেন, স্রষ্টার অনুমতি ছাড়া সেই স্থান হতে এক চুলও বেরিয়ে আসার ক্ষমতা কারও নাই। ইহাই বিধির বিধান। ইহাই নিয়তির রহস্যময় লীলাখেলা।

৪৮. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (অবশ্যই) (লাকাদ্) আমরা দিয়াছি (আতাইনা) মুসাকে (মুসা) এবং (ওয়া) হারুনকে (হারুন) ফুরকান (সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার কিতাব, মীমাংসাকারী কিতাব) (ফুরকান) এবং (ওয়া) জ্যোতি (আলো, দীপ্তি, দ্যুতি, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য, ময়ূখ) (দিয়াও) এবং (ওয়া) জিকির (যোগাযোগ, সংযোগ) (জিকিরাল) মুঠাকিদের জন্য (যাহারা তাকওয়ায় ডুবে আছে তাহাদের জন্য) (লিলমুঠাকিন)।

এবং নিশ্চয়ই হারুন এবং মুসাকে আমরা (আল্লাহ) ফুরকান দিয়াছি এবং জ্যোতি (দিয়াছি) এবং মুঠাকিদের জন্য দিয়াছি জিকির।

র যাহা সত্য এবং মিথ্যাকে পরিষ্কার ভাগ করে দেয় উহাকেই ‘ফুরকান’ বলা হয়। যদিও কোরান এবং কিতাব অর্থেও অনেকেই ব্যবহার করেন এবং এতে দোষের কিছু নেই। তবে একটি কথা বলতে চাই যে, আল্লাহ পাক তো ‘ফুরকান’-এর স্থলে কোরান অথবা কিতাব শব্দটি ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে ‘ফুরকান’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যিনি বা যারা তাকওয়ায় রত আছেন তথা ধ্যানসাধনায় আল্লাহকে পাবার আশায় ডুবে আছেন তাদেরকে জিকিরের মাধ্যমে তথা সংযোগ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সত্য এবং মিথ্যাকে পার্থক্য করার জ্যোতি লাভ করার সুসংবাদটি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নুর তথা জ্যোতিতে একটি নফস যখন অবগাহন করতে পারে তখনই সেই নফসটি ফুরকান জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে যায়। আল্লাহর এই উপদেশটি মোটেই সাধারণের জন্য নয়, বরং যারা ধ্যানসাধনায় মুঠাকি হয়ে জিকিরে তথা সংযোগ-প্রচেষ্টায় রত থাকেন। সেই কথাটি হজরত মুসা (আ.) এবং হজরত হারুন (আ.)-কেও এই বলে বলা হয়েছে যে তাদেরকে অবশ্যই ফুরকান এবং জ্যোতি দান করা হয়েছে।

৪৯. যাহারা (আল্লাজিনা) ভয় করে (ইয়াখশাউন্) তাহাদের রবকে (রাব্বাহুম) না দেখিয়া (অদৃশ্য অবস্থায়) (বিল্গায়িব) এবং (ওয়া) তাহারাই (হুম) হইতে (মিন) সেই নির্দিষ্ট সময় (সাত্বাতি) ভীত সঙ্কল্প (ভয়ে শঙ্কিত) (মুশফিকুন)।

যাহারা না দেখিয়া তাহাদের রবকে ভয় করে এবং তাহারাই নির্দিষ্ট সময় হইতে ভীতসঙ্কল্প।

র যারা ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় ডুবে থাকা মুঠাকি, তারা তাদের রবকে না দেখেই সাধনায় রত থাকেন এবং তারা নির্দিষ্ট সময়টি হতে তথা সাত্বাত হতে তথা মৃত্যু-ঘটনা ঘটনার বিষয়টিতে সব সময় ভীতসঙ্কল্প থাকেন। যারা সংসার করেও সময়-সুযোগে নির্জন স্থানে অথবা পর্বতগুহায় মাসের পর মাস ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকেন তাদেরকেই হাকিকতে মুঠাকি বলা হয়।

এই ধ্যানসাধনার সময়ে আল্লাহকে না দেখেই এবং নির্দিষ্ট মৃত্যু-ঘটনার সময়টিকে মনে রেখেই ভীতসঙ্কল্প হয়ে এবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন থাকে। এভাবে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করতে করতে একদিন নিজের মধ্যেই আল্লাহ পাক রূহরূপে জাগ্রত হয়ে নফসটিকে দর্শন দান করেন। আল্লাহ তখনই একটি নফসকে রূহরূপে দর্শন দান করেন যখন একটি নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে অথবা মুসলমান বানাতে পারে। যতদিন পর্যন্ত একটি নফস এবং সেই নফসের সঙ্গে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে যে দেওয়া হয়েছে উহা পরিত্যাগ না করা হয় ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর দর্শন তথা রবের দর্শন তথা রূহরূপে জাগ্রত হয়ে দর্শন দান করার প্রশ্নটি অনেকটা অবান্তর। সুতরাং

আল্লাহকে না দেখেই প্রথমে ধ্যানসাধনার পথে সাধককে তথা মুঠাকিকে এগিয়ে যেতে হয়।

মুসায়ি ইসলামের সময় অনেক মুঠাকি যে বিরাট বিরাট আল্লাহর ওলি হয়েছিলেন তার জাজ্বল্য প্রমাণ আমরা আগেই জানতে পেরেছি এবং মোহাম্মদি ইসলামের জন্যও যে ধ্যানসাধনার বিষয়টি অতীব গুরুত্ব বহন করে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা পাই যখন মহানবি সময়ে-অসময়ে (একটানা নয়) পনেরটি বছর জাবালুন নুর নামক উঁচু পর্বতের একটি গুহায়, যে গুহার নাম হেরাগুহা, সেখানে একাকী ধ্যানসাধনা করে তাঁর উন্মতদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে যদি সত্যিকার মুঠাকি হতে চাও তো এ রকম ধ্যানসাধনার দিকে এগিয়ে যাও। মেজাজি মুঠাকিরা এ রকম নির্জনে একাকী ধ্যানসাধনাটিকে ভীষণ কষ্টদায়ক ব্যাপার মনে করে কৌশলে এড়িয়ে যান। এই এড়িয়ে যাওয়াটাও মেজাজি মুঠাকিদের তকদির। সুতরাং কাহাকেও দোষারোপ করা ঠিক নয়, বরং নীরব থাকাই সমীচীন মনে করি।

৫০. এবং (ওয়া) এই (হাজা) জিকির (জিক্রুম) বরকতময় (মুবারাকুন) তাহা আমরা নাজিল করিয়াছি (আনজালনাহ) তবুও কি তোমরা (আফাআনতুম) তাহাকে (লাহ) অস্বীকারকারী হইবে (ইনকার করিবে) (মুনকিরুন)।

এবং এই জিকিরটি (হয়) বরকতময় যাহা আমরা নাজিল করিয়াছি। তবুও কি তোমরা তাহাকে অস্বীকারকারী হইবে?

র এই জিকির তথা সংযোগ তথা যোগাযোগটি যে কতখানি বরকতময় যাহা আল্লাহ ‘আমরা’ রূপ ধারণ করে নাজিল করেছেন তাহা একমাত্র নির্জনে ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকা মুঠাকিরাই হাতে হাতে প্রমাণ পায় বলেই ইহা নিঃসন্দেহে

বরকতময়। এতবড় এবং এত সুন্দর বরকতময় জিকির নাজেঁল করার কথাটি বলার পরেও অনেকেই অবহেলায়, আলস্যে, পাগ্গা না দিয়ে এই উলঙ্গ সত্যটিকে অস্বীকার করে বসে তথা এনকার করে।

৫১. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাদ) আমরা দিয়াছি (আতাইনা) ইব্রাহিমকে (ইব্রাহিমা) সততা (সচ্চরিত্রতা, ন্যায়পরায়নতা) (রুশ্দাহ) হইতে (মিন) পূর্বে (আগে) (কাবলু) এবং (ওয়া) আমরা ছিলাম (কুননা) তাহার সম্পর্কে (বিষয়ে) (বিহি) খুব জ্ঞানতাম (খুব অবহিত, সম্যক পরিজ্ঞাত, অবগত) (আলিমিন)।

এবং নিশ্চয়ই ইব্রাহিমকে আমরা দিয়াছিলাম সততা ইতিপূর্বেও (আগে হইতে, পূর্ব হইতে) এবং আমরা ছিলাম তাহার সম্পর্কে খুব অবহিত।

৫২. যখন (ইজ) (ইব্রাহিম) বলেছিলেন (কাল) তাঁহার বাবাকে (লিআবিহি) এবং (ওয়া) তাঁহার কণ্ঠকে (কাণ্ঠমিহি) কি (মা) এই সমস্ত (এই সকল) (হাজ্জিহি) মূর্তিগুলি (তাম্মাসিলু) যাহার (লাতি) তোমরা (আনতুম) তাহাদের জন্য (লাহা) পূজায় রত (নিবদ্ধ) আছ (আকিফুন)।

যখন (ইব্রাহিম) বলেছিলেন তাঁহার বাবাকে এবং তাহার কণ্ঠকে, এই সমস্ত মূর্তিগুলো কি, তোমরা যাহার পূজায় রত আছ তাহাদের জন্য।

৫৩. (তাহারা) বলিল (কালু), আমরা পাইয়াছি (ওয়াজাদনা) আমাদের বাপ-দাদাদেরকে (আবাআনা) তাহাদের জন্য (লাহা) এবাদতকারীরূপে (আবিদিন)।

(তাহারা) বলিল, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা পাইয়াছি তাহাদের জন্য এবাদতকারীরূপে।

৫৪. (ইব্রাহিম) বলিলেন (কাল), নিশ্চয়ই (লাকাদ) আছ (কুনতুম) তোমরা (আনতুম) এবং (ওয়া) তোমাদের বাপ-দাদারা (আবাউকুম) মধ্যে (ফি) পথভ্রষ্টতার (ডুলপথে) (দালালিম) সুস্পষ্ট (পরিষ্কার) (মুবিন)।

(ইব্রাহিম) বলিলেন, নিশ্চয়ই তোমরা আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (ছিল) সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

৫৫. (তাহারা) বলিল (কালু), আমাদের নিকট আনিয়াছ কি (আজিতানা) সত্যের সহিত (বিল্হাক্কি) না (আম্ম) তুমি (আন্তা) হইতে (মিনাল) কৌতুককারীদের (লাইবিন)।

(তাহারা) বলিল, আমাদের কাছে আনিয়াছ কি সত্যের সহিত না (কি) তুমি কৌতুককারীদের হইতে (অত্তুর্জু)?

৫৬. (তিনি) বলিলেন (কাল) বরং (বাল) তোমাদের রব (রাব্বুকুম) যিনি রব (রাব্বুস) আকাশগুলির (আকাশসমূহের, আকাশমগুলির) (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়া) জমিনের (আর্দি) তিনি (আল্লাজি) তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন (ফাতারাহননা) এবং (ওয়া) আমি (আনা) উপর (আলা) ওই সকলের উপর (জালিকুম) হইতে (মিনাশ্) প্রত্যক্ষদর্শীদের (সাক্ক্যদাতাদের, বৃত্তান্তজ্ঞদের, কোনো বিষয় বা ঘটনা প্রত্যক্ষকারীদের) (শাহিদিন)।

বরং বলিলেন তোমাদের রব আকাশগুলি এবং জমিনের রব যিনি তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ওইসবের উপর আমি প্রত্যক্ষদর্শীদের হইতে (একজন)।

৫৭. এবং (ওয়া) আল্লাহর শপথ (প্রতিজ্ঞা, দিব্য) (তাল্লাহি) নিশ্চয়ই আমি ব্যবস্থা (বন্দোবস্ত, আয়োজন, নিয়ম) নিব (লাআকিদাননা) তোমাদের মূর্তি

(প্রতিমা, বিগ্রহ)-গুলির (আসনামাকুম) পরে (বাদা) তোমাদের চলিয়া যাওয়ার (আনতুয়াল্লু) পিঠ (পৃষ্ঠ, পশ্চাৎ) ফিরাইয়া (মুদ্বিরিন)।

এবং আল্লাহর শপথ তোমাদের মূর্তিগুলির (বিষয়ে) নিশ্চয়ই আমি ব্যবস্থা নিব পিঠ ফিরাইয়া তোমাদের চলিয়া যাইবার পরে।

৫৮. সুতরাং তিনি তাহাদেরকে করিয়া দিলেন (ফাজ্জাআলাহম) টুকরা টুকরা (জুজ্জান) ব্যতীত (বাদে, ভিন্ন, ছাড়া, বিনা) (ইল্লা) বড়টা (কাবিরাল) তাহাদের (লাহম) তাহারা যাহাতে (লাআল্লাহম) তাহাদের দিকে (ইলাইহি) লক্ষ্য আরোপ (অর্পণ, স্থাপন) করে (ইয়ার্জিউন)।

সুতরাং তিনি তাহাদেরকে (মূর্তিগুলিকে) টুকরা টুকরা করিয়া দিলেন একমাত্র বড়টা (ছাড়া) তাহারা যাহাতে তাহার (বড়টার) দিকে লক্ষ্য আরোপ করে।

এই আয়াতটিতে নিরপেক্ষভাবে লক্ষ্য করে দেখুন যে, মূর্তিগুলোর কথা বলা হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, মূর্তিগুলো তৈরি হয় মাটি, পাথর, প্লাস্টার অব প্যারিস, চীনামাটি ইত্যাদি দিয়ে। এইসব মূর্তির না আছে নফস তথা প্রাণ আর রুহ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। এগুলো নিরেট জড়পদার্থ। এগুলোর মানুষের কোনো ভালো এবং মন্দ করার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মানুষ নফস এবং রুহের অধিকারী হবার পরেও এগুলোর পূজা-অর্চনা, এবাদত-বন্দেগি করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তারপরেও মানুষ অজ্ঞতার বশে এগুলোর পূজা দিয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ মানুষের ভালোও করতে পারে এবং মন্দও করতে পারে। মানুষের যার-পর-নাই খুব ভালো করার ফলে মানুষ ধন্যবাদ পাবার অমরতা লাভ করে। আবার পরক্লে খুব খারাপ কাজ করার দরুন মানুষের স্মৃতিতে অভিশপ্ত হয়ে থাকে। এই অমর এবং অভিশপ্ত হবার কোনো কারণই থাকতে পারে না এই মূর্তিগুলোর, কারণ এই

মূর্তিগুলোর নফসও নাই রুহও নাই, তথা জীবাত্মাও নাই এবং পরমাত্মার প্রশ্নটি তো আরও অবাস্তব। ইতিহাসের পাতায় জঘন্য জালিমরূপ ধারণ করে মানবসমাজের বুকে কঠিন অত্যাচার চালিয়ে বহু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে চেন্সিস খাঁ, হালাকু খাঁ, ইসলামের ইতিহাসের হিটলার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুসোলিনি, হিটলার এবং আরও অনেকে। এরাই মানুষের চেহারা, মানুষের সুরতে একেকজন বড় বড় অসুর। সুতরাং অতি সহজেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া যায় যে, মানুষ মানুষের মঙ্গলও করতে পারে আবার অমঙ্গলও করতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টির সামনে পাথরের বানানো মূর্তিগুলোর কোনো ভূমিকার কথাটি কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু কিছু ধর্ম-গবেষক মূর্তির সঙ্গে মানুষটিকেও জড়িয়ে ফেলেন এবং সহজ-সরল পাঠকেরা এই বিষয়গুলো পরিষ্কার বুঝতে না পেরে লাভড়া পাকিয়ে ফেলে। অনেকে তো বলেই ফেলেন যে পীরের ধ্যান করা আর মূর্তিপূজা করা একই কথা। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখুন যে, কোথায় পাথরের মূর্তি আর কোথায় রক্ত-মাংসে-গড়া নফস আর রুহের অধিকারী মানুষ! এই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটো বিষয়কে এক করে সরল-সহজ কাঁচা-গলা মোমের মতো মানুষগুলোকে ভুলপথে ঠেলে দেবার ব্যবস্থাপত্রটি করে গেছেন। মানুষ খুন করা আর মূর্তি টুকরা টুকরা করা কোনো অবস্থাতেই এক বিষয় নয়।

৫৯. তাহারা বলিল (কালু) কে (মান) করিয়াছে (ফাআলা) এইটা (হাজ্জা) আমাদের ইলাহগুলির সহিত (বিআলিহাতিনা) নিশ্চয়ই সে (ইন্নাহ) অবশ্যই অস্ত্র ভূক্ত (অস্ত্রগত, মধ্যস্থিত) (লামিন) জালিমদের (অত্যাচারীদের, সীমালঙ্ঘনকারীদের) (জালিমিন)।

তাহারা বলিল, এইটা কে করিয়াছে আমাদের ইলাহগুলির সাথে নিশ্চয়ই সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৬০. তাহারা বলিল (কালু), আমরা শুনিয়াছি (সামিনা) এক যুবককে (ফাতাই) সমালোচনা করিতে (ইয়াজ্জুরু) তাহাদের (হম) বলা হয় (ইউকালু) তাহার (নাম) (লাহ) ইব্রাহিম (ইব্রাহিমু)।

তাহারা বলিল, এক যুবককে তাহাদের (ব্যাপারে) সমালোচনা করিতে আমরা শুনিয়াছি। বলা হয়, তাহার (নাম) ইব্রাহিম।

৬১. তাহারা বলিল (কালু), সুতরাং আনো (ফাতু) তাহাকে (বিহি) উপরে (আলা) চোখের (আইউনি) মানুষদের (নাসি) তাহারা যাহাতে (লাআল্লাহম) সাক্ষ্য দিতে পারে (ইয়াশ্হাদুন)।

তাহারা বলিল, সুতরাং তাহাকে আনো মানুষদের চোখের উপরে যাহাতে তাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে।

৬২. তাহারা বলিল (কালু) তুমি কি (আআলতা) করিয়াছ (ফাআলতা) এইটা (হাজা) আমাদের ইলাহগুলির সহিত (বিআলিহাতিনা) হে (ইয়া) ইব্রাহিম (ইব্রাহিম)।

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের ইলাহগুলির সহিত এইটা করিয়াছ, হে ইব্রাহিম?

৬৩. (ইব্রাহিম) বলিলেন (কালু) বরং (বাল) তাহা করিয়াছে (ফাআলাহ) প্রধান (কাবিরু) তাহাদের (হম) এইটা (হাজা) সুতরাং জিজ্ঞাসা করো (ফাসআলু) তাহাদেরকে (হম) যদি (ইন) পারে (কালু) তাহারা কথা বলিতে (ইয়ানতিকুন)।

বরং (ইব্রাহিম) বলিলেন তাহা করিয়াছে তাহাদের (মূর্তিগুলির) বড়টা (প্রধান, মুখ্য) এইটা তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করো তবে যদি তাহারা (মূর্তিগুলি) কথা বলিতে পারে।

৬৪. সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিল (ফারাজাউ) দিকে (ইলা) তাহাদের নফসের (আনফুসিহিম) সুতরাং তাহারা বলিল (ফাকালু) নিশ্চয়ই তোমরা (ইন্নাকুম) তোমরাই (আন্তুম) জালিম (জালিমুন)।

সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিল তাহাদের নফসের দিকে, সুতরাং তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই তোমরা তোমরাই জালিম।

কোরান-এর এই আয়াতটি আমাদেরকে কিছুটা অবাক করে দেয় এ জন্য যে, যারা মূর্তিপূজা করে তারা নিজেদের নফসের উপর যে জুলুম করছে সেটা অনেক সময় অবচেতন মনে বুঝতে পারে এবং মাঝে মাঝে মেনেও নেয় তথা স্বীকার করে নেয়। আমরা অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানের মাধ্যমে এটুকু জেনে অবাক হলাম বৈ কি! কারণ যারা মূর্তিপূজা করে তারা শেরেকে ভুবে আছে এবং কোরান-এ অন্যত্র এদেরকে কাফেরও বলা হয়েছে। কিন্তু এই কাফেরেরাও মাঝে মাঝে নিজেদের দোষত্রুটিগুলোকে নিজেরাই স্বীকার করে ফেলে এবং প্রকাশ্যে সবার সামনে বলে ফেলে আন্তুমুজ্ জোয়ালেমুন, ‘তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী তথা জালিম।’ এই যে নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো নিজেরাই মাঝে মাঝে ধরে ফেলতে পারে তারই একটি অনন্য দলিল এই আয়াতটি। তা ছাড়া যারা মূর্তিপূজা করে আসছে তাদের শিকড় তথা রুট যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাই যে এই মূর্তিপূজারকদের বাপ-দাদারাও মূর্তিপূজা করে আসছে। সুতরাং মূর্তিপূজারকের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে মূর্তিপূজা করাটাই একান্ত স্বাভাবিক।

অবশ্য এই মূর্তিপূজারকদের জন্মটাই কি একটি জ্বলন্ত অভিশাপ, নাকি একটা নির্ভুর তকদির? ইহার ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা অধম লিখকের নাই। হিন্দু হরিমোহনের ছেলে জগৎমোহন যখন ধর্মবিষয়ে গবেষণা করতে এগিয়ে আসবে তখন প্রথমেই যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই ধর্মের উপর রচিত বেদ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত এবং আরও যেসব গ্রন্থ আছে সেগুলোর মাঝে গবেষণায় ডুবে থাকারই কথা। যেমন অধম লিখক মুসলমান পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই এক কোরান-এর ৪২ রকম তফসির তথা ব্যাখ্যা এবং প্রায় যতগুলো হাদিসগ্রন্থ আছে এবং আরও অনেক গ্রন্থগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং এই গবেষণা করার শেকড়টি তথা মূলটি হলো মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। সুতরাং এই কথাটি কি অকপটে বলতে পারি না যে, জন্মই আমার আজন্ম বিরাট একটি আশীর্বাদ অথবা রহমতপ্রাপ্ত একটি তকদির? আমার মনে হয়, যারা মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা আমার এই কথাগুলো যতটুকু মেনে নেবেন ততটুকু অন্যান্য ধর্মের গবেষকেরা কখনই মেনে নেবেন না। কেন মেনে নেবেন না বলে যদি কেউ প্রশ্ন করেই ফেলেন তো উত্তরটি অধম লিখকের জানা নাই।

৬৫. ইহার পর (সুম্মা) অবনত হইয়া গেল (নুকিসু) উপরে (আলা) তাহাদের মাথাগুলি (রুউসিহিম) নিশ্চয়ই (লাকাদ) তুমি জানিয়াছ (আলামতা) না (মা) এইসব (হাউলাই) কথা বলিতে পারে (ইয়ানতিকুন)।

ইহার পর তাহাদের (মূর্তিপূজারকদের) মাথাগুলি অবনত হইয়া গেল। (আলা তথা 'উপরে' শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে মিলাইতে পারিলাম না)। তাহারা

(মূর্তিপূজারকেরা) বলিল, নিশ্চয়ই তুমি (ইব্রাহিম) জানিয়াছ এইসব (মূর্তিগুলি) কথা বলিতে পারে না।

৬৬. (ইব্রাহিম) বলিলেন (কাল), তোমরা ইবাদত করিবে তবুও কি (আফাতাবুদুনা) হইতে (মিন) ছাড়া (ব্যতীত, বিনা) (দুনি) আল্লাহ (আল্লাহ) যাহা (মা) না (লা) তোমাদের উপকার (মঙ্গলসাধন, কল্যাণ, সাহায্য, অনুগ্রহ) দিতে পারে (ইয়ান্‌ফাউকুম) কিছুমাত্র (কয়েক, অল্প, কিয়ৎ) (শাইয়াঙ) এবং (ওয়া) না (লা) তোমাদের ক্ষতি (হানি, অনিষ্ট, ক্ষয়, লোকসান, ন্যূনতা) করিতে পারে (ইয়াদুর্‌রুকুম)।

(ইব্রাহিম) বলিলেন, তবুও কি তোমরা ইবাদত করিবে আল্লাহ ছাড়া যাহা তোমাদের কিছুমাত্র উপকার দিতে পারে না এবং তোমাদের ক্ষতি (-ও) করিতে পারে না।

মূর্তি এবং মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কারণ পাথরের মূর্তিগুলির সামান্যতম নফসও নাই এবং রুহ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ অপরপক্ষে একটি মানুষ যেমন নফসের অধিকারী তেমনি রুহেরও অধিকারী তথা একটি মানুষকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ের সমন্বয়ে আল্লাহ পাক বানিয়েছেন। মানুষের মর্যাদার সামনে মূর্তিগুলির সামান্যতম মর্যাদা আছে বলে মনে হয় না। একটি মানুষ ইচ্ছাশক্তির অধীন। একটি মানুষকে আল্লাহ সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। মানুষ এই ইচ্ছাশক্তিটি প্রয়োগ করে উপকারও করতে পারে আবার অপকারও করতে পারে। কিন্তু মূর্তিগুলির এ রকম করার প্রশ্নটি অবান্তর। একটি সাধারণ মানুষকে যেখানে অপর একটি মানুষের উপকার ও অপকার উভয়টি করার দৃশ্যটি সমাজের বুকে অহরহ দেখে চলছি, সেইখানে আপন নফসের কাছেই

থাকা রুহটিকে যিনি ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে জাগ্রত করতে পেরেছেন তিনিই তো ইনসানে কাম্মেল। রুহ একটি মানুষের নফসের উপর তখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন আপন নফসের সঙ্গে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। আপন নফসের অভ্যস্তরে যে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেই পরীক্ষায় তখনই একটি নফস কৃতকার্য হতে পারে যখন খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। এবং যেইমাত্র খান্নাসরুপী শয়তানটি আর নফসের সঙ্গে থাকে না, তখনই সেই নফসটি নামধারণ করে পরিতৃপ্ত নফস তথা নফসে মোৎমায়েন্না। এই জাতীয় নফসকেই কোরান-এ জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই জাতীয় নফসের উপরেই রুহ পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হয়। হিন্দুধর্মে রুহ জাগ্রত-করা নফসটির নাম দেওয়া হয়েছে নররুপী নারায়ণ, ফারসি ভাষায় বলা হয় বান্দা নেওয়াজ আর আরবিতে বলা হয় ওয়াজহুল্লাহ তথা আল্লাহর চেহারা। এই নররুপী নারায়ণ, এই বান্দা নেওয়াজ, এই ওয়াজহুল্লাহর কাছেই মারেকত-রাজ্যে প্রবেশ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা অগ্রসর হতে চায় তাদেরকে আনুগত্য গ্রহণ করতে হবে। তাই বলা হয়ে থাকে, ‘যার গুরু নাই, শয়তান তার গুরু।’ মোজাদ্দের আলফেসানি, সিরহিন্দ তো একদম পরিষ্কার এবং খোলামেলা ভাষায় বলেই দিয়েছেন যে, পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত, তথা ‘তোমার পীরই হলেন তোমার প্রথম মাবুদ।’ (মাতলাউল উলুম, ৮৬ পৃ.)। ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা কৌশলে একজন ইনসানে কাম্মেলকেও মূর্তি বানিয়ে ফেলেছেন এবং বিভ্রান্ত তৈরি করার তরে অনেক রকম কথা বলে থাকেন। যেমন টেলিভিশনের পর্দায় কিছুদিন আগেও বিভ্রান্ত করার কৌশল অবলম্বন করে প্রচার করা হতো, ‘পীরপূজা ইসলামেতে নাই।’

দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যত লক্ক লক্ক ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে, সত্যসাগরে অবগাহন করতে চাইলে ইনসানে কাম্মেলকে অবশ্যই গুরুরূপে গ্রহণ করে নিতে হবে। অপরপক্ষে ওহাবি মোল্লারা ধুমসে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য গুরু ধরার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি ওহাবি মোল্লাদের কথাটি সত্য বলে ধরে নিই, তা হলে এই লক্ক লক্ক ওলি-গাউস-কুতুবেরা প্রতারকরূপে চিত্রিত হন, আবার পরক্ষণে যদি লক্ক লক্ক ওলি-গাউস-কুতুব-আবদালদের কথাগুলো সত্য হয়ে থাকে তা হলে ওহাবি মোল্লাদের অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? মেশকাত শরিফ-এর একটি হাদিসে দুনিয়াদার আলেমদের চেহারা-নকশা কেমন হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। আমরা বিস্তারিত না লিখে এই হাদিস হতে একটি কথা তুলে ধরতে চাই আর সেই কথাটি হলো : এই দুনিয়াদার আলেমদের মধ্যে এমনও কিছু আলেম নামের কলঙ্ক পাওয়া যাবে যারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। স্রষ্টার যতগুলো নাম আছে তার মধ্যে গভীর রহস্যপূর্ণ এবং জ্ঞাত ও সিফাতের তথা মূল এবং গুণ দুটোরই একত্রিত সমন্বয়কারী যে নামটি স্রষ্টাকে পরিপূর্ণরূপে বোঝায় সেই নামটি হলো আল্লাহ। মূলের প্রকাশ ও বিকাশের নামটিকে বলা হয় সিফাত তথা সৃষ্টি তথা গুণাবলি। আল্লাহ সিফাতরূপে তাঁর সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে বিরাজিত। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞাত তথা মূল নুরটি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মাঝে দুইটি স্থানে এবং সৃষ্টির বাহিরে লা-মোকাম নামক স্থানে অবস্থান করেন। আল্লাহ জ্ঞাতরূপে যে লা-মোকামে অবস্থান করেন তার দলিলটি সূরা নজ্জেই দেখতে পাই। আবার পরক্ষণে সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে দুটি জীবের সঙ্গে আল্লাহ যে জ্ঞাতরূপে অবস্থান করছেন সেই কথাটিও পাই। যেমন নাহনু আক্রাবু ইলাইহে মিন্ হাবলিন্ ওয়ারিদ অর্থাৎ

‘আমরা তোমার শাহারগের তথা জীবনরগের নিকটেই আছি।’ সেই জীব দুটির নাম হলো জিন এবং ইনসান। আল্লাহ যে স্বয়ং জাতরূপে প্রতিটি মানুষের নিকটেই থাকেন, সেই জাতরূপটি আপন মহিমায় মহিমাবিত হয়ে আপনার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখনই, যখন একটি মানুষ তার আপন সত্তার মধ্য হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। মানুষের পরম সৌভাগ্য যে আল্লাহ পাক জাতরূপে মানুষের জীবনরগের নিকটেই আছেন। সেই জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষকে উপেক্ষা করে, অবহেলা করে, অস্বীকার করে অজানার পূজা করার উপদেশটি যারা দেন তাদেরকেই বা বলার কী থাকতে পারে? শুধু একটুকুই বলা যায় যে এরা আল্লাহর রহস্যের জ্ঞান হতে নিজেরাই নিজের মূখ ফিরিয়ে রেখেছে।

৬৭. পরিতাপ (আফসোস, দিক্, দুঃখ, মনস্তাপ) (উফ্ফি) তোমাদের জন্য (লাকুম) এবং (ওয়া) তাহাদের জন্যও (লিহা) তোমরা এবাদত কর (তাবুদুনা) হইতে (মিন) ছাড়া (দুনি) আল্লাহ (আল্লাহ) তবুও কি না (আফালা) তোমরা বুঝবে (তাকিলুন)।

তোমাদের জন্য পরিতাপ এবং (তাহাদের) জন্যও, যাহাদের তোমরা এবাদত করো আল্লাহকে ছাড়া, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

৬৮. (মূর্তিপূজারকগণ) বলিল (কালু) তাহাকে পোড়াইয়া ফেল (হাররিকুহ) এবং (ওয়া) তোমরা সাহায্য কর (আনসুরু) তোমাদের ইলাহগুলিকে (আলিহাতাকুম) যদি (ইন) তোমরা (কুনতুম) করিতে পার (ফাইলিন)।

তাহারা বলিল, তাঁহাকে (ইব্রাহিমকে) পোড়াইয়া ফেল এবং তোমাদের ইলাহগুলিকে তোমরা সাহায্য করো যদি তোমরা করিতে পার।

৬৯. আমরা (আল্লাহ) বলিলাম (কুলনা) হে (ইয়া) আগুন (নারু) হইয়া যাও (কুনি) শীতল (ঠাণ্ডা, উদ্বেগরহিত, শান্তিপ্ৰাপ্ত) (বারুদা) এবং (ওয়া) নিরাপদ (নির্বিন্ম, আপৎশূন্য, বিপন্মুক্ত) (সালামান্) উপরে (আলা) ইব্রাহিমের (ইব্রাহিম)।

আমরা (আল্লাহ) বলিলাম, হে আগুন, শীতল হইয়া যাও এবং ইব্রাহিমের উপর নিরাপদ (হও)।

এই আয়াতটি যারা ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখে তাদের জন্য একটি বিরাট ওজিফা। কারণ আল্লাহ পাক তকদিরে মুবরাক তথা যে তকদির বদলানো হয় না, সেই আগুনের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার তকদিরটিকেও কিছুক্ষণের জন্য বদলিয়ে ফেলার হুকুম প্রদান করলেন, যাতে নবি ইব্রাহিমকে পোড়াতে না পারে। বরং আগুনের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রটি ধারণ করতে নির্দেশ দিলেন এই বলে যে, নিরাপদ-ও শীতল-রূপটি ধারণ করো। আগুনের পক্ষে এই তকদিরে মোবরাকটি বদলিয়ে ফেলার কোনো উপায় নেই বলেই আল্লাহ আগুনকে শীতল ও নিরাপদ হতে বললেন।

গুনেছি সাধকেরা এই আয়াতটিকে ওজিফারূপে প্রতিদিন ধ্যানযোগে হাজার হাজারবার পড়তেন এবং এই আয়াতটিকে ওজিফারূপে গ্রহণ করে কামিয়াব হবার পর বাঘ, সিংহ এবং হিংস্র প্রাণীদের পিঠে চড়ে এখানে সেখানে বেড়াতেন। গুনেছি এই আয়াতটি ১১ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিলে এবং সেই পানি পান করলে অনেক রকম বালান্মুসিবত হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

৭০. এবং (ওয়া) তাহারা চাহিয়াছিল (আরাদু) তাহার সাথে (বিহি) অন্যায় (ক্লতি) আচরণ করিতে (কাইদান্) সুতরাং তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) করিয়া

দিয়াছিলাম (ফাজ্জাআল্‌নাহ্‌ম) সবচাইতে বেশি (সর্বাধিক) ক্বতিগ্রস্ত (ক্বতি ভোগ করিতেছে) এমন, যাহার ক্বতি হইয়াছে) (আখ্‌সারিন)।

এবং তাহারা চাহিয়াছিল তাহার সহিত অন্যায় আচরণ করিতে সুতরাং তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ্‌) সর্বাধিক ক্বতিগ্রস্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

৭১. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ্‌) তাহাকে উদ্ধার (মুক্ত, রক্ষা, পরিব্রাণ, নিষ্কৃতি, উদ্ধোলন) করিলাম (নাঈজ্‌জাইনাহ্‌) এবং (ওয়া) লুতকে (লুতান) দিকে (ইলা) জমিনে (মাটিতে, দেহতে) (আর্দি) যেথায় (যেখানে, যেস্থানে) (লাতি) আমরা (আল্লাহ্‌) বরকত (কল্যাণ, হিত, মঙ্গল, কুশল, সুখসমৃদ্ধি) দিয়াছি (বারাক্‌না) ইহার মধ্যে (ফিহা) সমস্ত আলমের জন্য (লিল্‌আলামিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ্‌) তাহাকে এবং লুতকে উদ্ধার করিয়াছিলাম জমিনের দিকে যেথায় আমরা বরকত দিয়াছি ইহার মধ্যে সমস্ত আলমের জন্য।

৭২. এবং (ওয়া) আমরা দিয়াছি (ওয়াহাব্‌না) তাহাকে (লাহ্‌) ইসহাক (ইস্‌হাক্‌) এবং (ওয়া) ইয়াকুব (ইয়াকুবা) অতিরিক্ত হিসাবে (নাফিলাতান্‌) এবং (ওয়া) প্রত্যেককে (কুল্লান্‌) আমরা বানাইয়াছি (জাআল্‌না) সালেহিন (সালিহিন)।

এবং তাহাকে আমরা (আল্লাহ্‌) দিয়াছি ইসহাক এবং অতিরিক্ত হিসাবে ইয়াকুব, এবং প্রত্যেককে আমরা (আল্লাহ্‌) বানাইয়াছি সালেহিন।

৭৩. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ্‌) তাহাদেরকে বানাইয়াছিলাম (জাআল্‌নাহ্‌ম) নেতাগণ (আইম্মাতাই) তাহারা পথ দেখাইত (ইয়াহ্দুনা) আমাদের (আল্লাহ্‌) কথামতো (বিআম্মরিনা) এবং (ওয়া) আমরা ওহি করিয়াছিলাম (আওহাইনা) তাহাদের দিকে (ইলাইহিম্‌) কাজ করিতে (ফিলান্‌)

ভালো ভালো (খাইরাতি) এবং (ওয়া) কায়েম করিতে (ইকামাস) নামাজ (সালাত) এবং (ওয়া) প্রদান করিতে (ইতাআজ) জাকাত (জাকাত) এবং (ওয়া) তাহারা ছিল (কানু) আমাদের জন্য (লানা) এবাদতকারী (আবেদিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে বানাইয়াছিলাম নেতাগণ, আমাদের (আল্লাহ) কথামতো তাহারা পথ দেখাইত এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাদের প্রতি ওহি করিয়াছিলাম ভালো ভালো কাজ করিতে এবং নামাজ কায়েম করিতে এবং জাকাত আদায় করিতে এবং তাহারা ছিল আমাদের (আল্লাহর) জন্য এবাদতকারী।

৭৪. এবং (ওয়া) লুতকে (লুতান) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে দিয়াছিলাম (আতাইনাহ) হেকমত (গুপ্তবিদ্যা, রহস্যলোকের জ্ঞান) (হক্‌মাঐ) এবং (ওয়া) জ্ঞান (ইল্‌মাঐ) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম (নাজ্‌জাইনাহ) হইতে (মিনাল) জনপদ (কারিয়াতি) যাহা (ল্লাতি) ছিল (কানাত্) লিপ্ত (তাম্বালু) খব্বিস কর্মগুলিতে (খাবাইসা) নিশ্চয়ই তাহারা (ইন্নাহম্) ছিল (কানু) জাতি (কাওমা) খারাপ (সাউইন) ফাসেক (ফাসিকিন)।

এবং লুতকে আমরা (আল্লাহ) দিয়াছিলাম হেকমত এবং জ্ঞান এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম জনপদ হইতে যাহা লিপ্ত ছিল খব্বিস কর্মগুলিতে, নিশ্চয়ই তাহারা ছিল খারাপ জাতি (এবং) ফাসেক।

৭৫. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে দাখিল (সামিল) করিয়াছিলাম (আদখাল্নাহ) মধ্যে (ফি) আমাদের (আল্লাহর) রহমতের (রাহ্মাতিনা) নিশ্চয়ই (ইন্নাহ) হইতে (মিনাস) সালেহিনদের (সৎকর্মশীলদের) (সোয়ালেহিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাকে দাখিল (সামিল) করিয়াছিলাম আমাদের (আল্লাহর) রহমতের মধ্যে নিশ্চয়ই সে (ছিল) সালেহিনদের হইতে।

৭৬. এবং (ওয়া) নুহকে (নুহান) যখন (ইজ) ডাকিয়াছিলেন (নাদা) হইতে (মিন) পূর্বে (কাবলু) সুতরাং আমরা সাড়া দিয়াছিলাম (ফাস্তাজাবনা) তাকে (লাহ) সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম (ফানাঙ্জাইনাহ) এবং (ওয়া) তাহার আহাল (পরিবার)-কে (আহলাহ) হইতে (মিনাল) কঠিন বিপদ (সংকট) (কারবিল) বড় (আজিম)।

ল্ট এবং যখন নুহকে পূর্ব হইতে তিনি ডাকিয়াছিলেন, সুতরাং আমরা (আল্লাহ) সাড়া দিয়াছিলাম তাকে, সুতরাং আমরা তাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং তাহার আহাল (পরিবার)-কে কঠিন (বড়) বিপদ (সংকট) হইতে।

এখানে অধিকাংশ অনুবাদক ‘স্মরণ করুন’ কথাটি গৎবাধাভাবে লিখে থাকেন। এখানে আমি ‘স্মরণ করুণ’ শব্দটি পেলাম না, তাই দিলাম না। যে-বিষয়টির উপর কোনো কিছুই জানা নাই, দেখা নাই ॥ সেই বিষয়টি ‘স্মরণ করুন’ বলাটাও কি একটি আত্মবিরোধী কথা বলে মনে হয় না? আর সেই দিনে কী করে স্মরণ করা যায়, যেখানে রেডিও-টেলিভিশন, ফোন-ফ্যাক্সের জামানার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং লিখিত কাগজ আবিষ্কার হয়ে থাকলেও সেই কাগজ ছিল অতি নিম্নমানের ফেড়ফেড়ে কাগজ এবং খুব কমই পাওয়া যেত। এইসব অপ্রপঞ্চাৎ চিন্তা না করেই আধুনিক যুগের মাপকাঠি দিয়ে সেই যুগের ঘটনাগুলো মাপা যায় না। সুতরাং নবি এবং রসূল তাঁরাই হতে পারেন যাঁরা ত্রিকালদর্শী তথা সব কিছু জানেন তথা পূর্ণ এলমে গায়েবের মালিক। তবে এলমে গায়েবের প্রশ্নেও অনেক প্রকারভেদ আছে। এবং এই প্রকারভেদের সর্বোচ্চ এলমে গায়েবের অধিকারটি আল্লাহ আবদুহকে

দিয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে যে, আমরা (আল্লাহ) আবদুহকে তথা আল্লাহর বান্দাকে মেরাজে নিয়ে গেলাম। এখানে রসূল এবং নবির নামটি উচ্চারণ না করে আবদুহ তথা আল্লাহর বান্দা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৭৭. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) সাহায্য করিয়াছিলাম তাকে (নাসারনাহ) হইতে (মিনাল) কওম (সম্প্রদায়, জাতি) (কাওমি) যাহারা (আল্লাজিনা) মিথ্যারোপ (অস্বীকার করা) করিয়াছিল (কাজ্জাবু) আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলিকে (বিআয়াতিনা) নিশ্চয়ই তাহারা (ইন্নাহ) ছিল (কানু) কওম (সম্প্রদায়, জাতি) (কাওমা) খারাপ (মন্দ) (সাওয়িন) সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহাদের ডুবাইয়া দেই (ফাআগ্রাক্নাহম্) সকলকেই (সবাইকেই) (আজ্মাঈন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) সাহায্য করিয়াছিলাম তাকে কওম হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল আমাদের আয়াতগুলিকে, নিশ্চয়ই তাহারা ছিল খারাপ কওম সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহাদের সকলকেই ডুবাইয়া দেই।

একটি খারাপ জাতি অথবা সম্প্রদায়কে আল্লাহর আয়াতের উপর মিথ্যা আরোপ করার দরুণ সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছেন বলা হয়েছে। আল্লাহর এই কথাটি সেই হজরত নুহ (আ.)-এর জামানায় ঘটেছিল, কিন্তু এখন এই আধুনিক যুগে একটি সমগ্র কওমকে এ রকম শাস্তিপ্রদান করার ঘটনাটি চোখে পড়ছে না, তবে অবশ্যই একদিন না একদিন পড়বে। সম্ভবত মনে হয়, আগের জামানার মানুষগুলো খুবই জঘন্য এবং ঘৃণিত প্রকৃতির ছিল বলেই সবাইকে পাইকারিভাবে শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হতো। কিন্তু এ আধুনিক যুগ দিনে দিনেই সভ্যতার দিকে

এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও অপরাধ প্রবণতাটিও কম নেই। তাই এখন আর সে রকম পাইকারি শাস্তি দেবার দৃশ্যটি দেখতে হয় না। আমরা অনেক সময় আগের দিনগুলো খুব ভালো ছিল বলে আফসোস করি, কিন্তু আগেকার দিনের মানুষেরা কতটুকু জঘন্য এবং ঘৃণিত পর্যায়ে উপনীত হলে আল্লাহ্ একটি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই আধুনিক যুগেও অনেক মানুষ আছে যারা সত্যিই ঘৃণিত এবং জঘন্য। কিন্তু একটি জাতির প্রশ্নে সবাই ঘৃণিত এবং জঘন্য বলে আল্লাহর কাছে মনে হয় না বলেই এ রকম পাইকারি ধ্বংসযজ্ঞটি আমরা দেখতে পাই না। এই ৭০/৮০ বছর আগেও ইলিশ মাছ খেয়ে বৃহত্তর বরিশাল জেলায় কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু লোক মারা যাবার কথাটি শুনেছি, কিন্তু বরিশালের সব লোক মারা গেছে এ রকম শুনি নি। আমরা আরও দেখেছি, যখন গুটিবসন্ত রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না তখন গ্রামে গ্রামে মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সবাই মারা গেছে এ রকম ঘটনাটি ঘটে নি। যেদিন এবং যখন সবাই আল্লাহর দৃষ্টিতে জঘন্য এবং ঘৃণিত বলে বিবেচিত হবে সেদিন হজরত নুহের (আ.) জামানার মতো একটি কণ্ঠস্বর দিয়ে তাকে তিনি সামান্য দ্বিধাবোধও করবেন না।

৭৮. এবং (ওয়া) দাউদকে (দাউদা) এবং (ওয়া) সোলায়মানকে (সুলায়মানা) যখন (ইজ) দুইজনে বিচার করিতেছিলেন (ইয়াহকুম্বানি) মধ্যে (ফিল) শস্যক্ষেত (হারসি) যখন (ইজ) রাত্রি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল (নাফাশাত্) ইহার মধ্যে (ফিহি) মেষ (গানামুল) কিছু লোকের (কাওমি) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) ছিলাম (কুন্বা) তাহাদের বিচারের জন্য (লিহক্‌মিহিম্) পর্যবেক্ষক (পরিদর্শক, নিরীক্ষক, মনোযোগের সহিত লক্ষ্যকারী) (শাহিদিন)।

এবং দাউদকে এবং সোলায়মানকে যখন দুইজনে বিচার করিতেছিল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে যখন কিছু লোকের স্বেচ্ছা রাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ইহার মধ্যে এবং আমরা (আল্লাহ) ছিলাম তাহাদের বিচারের প্রত্যক্ষকারী (পর্যবেক্ষক)।

৭৯. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহা বুঝাইয়া দেই (ফাফাহ্‌হাম্‌নাহা) সোলায়মানকে (সুলায়মানা) এবং (ওয়া) প্রত্যেককেই (কুল্লান) আমরা (আল্লাহ) দিয়াছি (আতাইনা) হেকমত (হক্‌মাত্‌) এবং (ওয়া) জ্ঞান (ইল্মাত্‌) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) অধীন করিয়া দিয়াছিলাম (সাখ্‌খার্না) সাথে (মাত্‌) দাউদের (দাউদাল) পাহাড়গুলিকে (জিবাল) তাহারা তসবিহ করিত (ইউসাব্বিহ্না) এবং (ওয়া) পাখিদেরকেও (তোয়াইরা) এবং (ওয়া) আমরা ছিলাম (কুন্না) কর্তা (সম্পাদনকারী, নির্বাহনকারী, নিয়ন্ত্রণকারী) (ফাইলিন)।

সুতরাং আমরা সোলায়মানকে তাহা বুঝাইয়া দেই এবং (তাহাদের) প্রত্যেককেই আমরা (আল্লাহ) দিয়াছি হেকমত এবং এলেক্স তথা জ্ঞান এবং আমরা (আল্লাহ) অধীন করিয়া দিয়াছিলাম দাউদের সাথে পাহাড়গুলিকে, তাহারা তসবিহ করিত এবং পাখিদেরকেও এবং আমরা (আল্লাহ) ছিলাম কর্তা তথা সম্পাদনকারী।

এখানে ছোট্ট একটি কথা বলার আছে বলে মনে করি আর সেই কথাটি হলো যে, পাহাড়-পর্বত এবং পাখিরা সব সময়েই আল্লাহর তসবিহ-পাঠ করে ইহা কোরান-এরই ঘোষণা। তা হলে দাউদের (আ.) সঙ্গে পাহাড় এবং পাখিগুলো তসবিহ-পাঠ করে বলার মাঝে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব হলো, পাহাড় এবং পাখিগুলো যে দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে তসবিহ-পাঠ করেছে উহা সেই সময় অনেকেই দেখতে পেয়েছে। কিন্তু কোনো নবি বিহনে পাহাড় এবং

পাখিরা সব সময়েই যে তসবিহ-পাঠ করছে ইহা কোরান-এর কথা হলেও মানুষ সহজে বুঝে উঠতে পারে না। এ জন্যই জ্ঞানের সঙ্গে হেকমত তথা রহস্যলোকের বিশেষ জ্ঞানটি দেবার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে। হজরত দাউদ (আ.) সেই হেকমতের বলে পাহাড় এবং পাখিকে যে তসবিহ-পাঠ করিয়েছেন উহা প্রকাশ্যে অবলোকন করা যায়, তাই হজরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পাহাড় এবং পাখিরা যে তসবিহ পাঠ করেছে সেই তসবিহ-পাঠ একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ তসবিহ-পাঠ।

৮০. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাকে শিখাইয়াছিলাম (আল্লামনাহ) শিল্প (সান্‌আতা) বর্ম (তনুদ্রাণ, কবচ, আঘাত হইতে রক্ষা করিবার দেহাবরণ) (লাবুসিল) তোমাদের জন্য (লাকুম) তোমাদের রক্ষা করিতে পারে (লিতুহসিনাকুম) হইতে (মিন) তোমাদের যুদ্ধের (বাসিকুম) সুতরাং কি (ফাহাল) তোমরা (আনতুম) কৃতজ্ঞ হইবে (শাকিরুন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাকে শিখাইয়াছিলাম বর্ম (-নির্মাণ) শিল্প তোমাদের, (যেন) তোমাদের রক্ষা করিতে পারে তোমাদের যুদ্ধের (আঘাত) হইতে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে (না)?

এ আয়াতটি প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি কথা বলতে চাই যে যুদ্ধ করার নানা প্রকার অস্ত্র তৈরি করাটাকেও শিল্প বলা হয়েছে এবং এই বর্মনির্মাণ শিল্পটি আল্লাহই দিয়েছেন। শত্রুপক্ষ হতে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এই শিল্পটি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য পরে তথা যুগে যুগে এই বর্মনির্মাণ শিল্পটি শত্রু-মিত্র উভয়পক্ষই কমবেশি জানতে পেরেছে। যুদ্ধ মানেই হত্যা, যুদ্ধ মানেই হারখার করে দেওয়া, যুদ্ধ মানেই কিছুটা সজ্জাত ॥ এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষ এবং শত্রুপক্ষ উভয়কেই কমবেশি জীবন ও বৈষয়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অধম লিখকের মনে হয়, এই যুদ্ধটি নিছক

বৈষয়িক যুদ্ধ ॥ তবে কেহ যদি প্রমাণ করতে পারেন যে ইহাও একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধ তবে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো।

৮১. এবং (ওয়া) সোলায়মানের জন্য (লিসুলাইমান) বাতাসকে (বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীরণ) (রিহা) অত্যন্ত প্রবল (তীব্র, উদ্দাম, সাস্রাতিক, তুচ্ছ, মারাত্মক, কঠিন, দুর্দমনীয়, অসংযত, বন্ধনহীন, স্বেচ্ছাবিহারী) (আসিফাতান) প্রবাহিত (হইত) (তাজরি) তাঁহার হুকুমে (তাঁহার নির্দেশে) (বিআম্রিহি) দিকে (অভিমুখে) (ইলা) জমিনে (পৃথিবীতে, মাটিতে, মানবদেহে) (আর্দি) যাহা (ল্লাতি) আমরা (আল্লাহ) বরকত (কল্যাণ, সৌভাগ্য, প্রাচুর্য) দিয়াছি (বারাক্না) ইহার মধ্যে (ফিহা) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) হইলাম (কুননা) সম্পর্কে (বিকুল্লি) সব বিষয়ে (শাইয়িন) সম্যক অবগত (খুব অবহিত) (আলিমিন)।

এবং সোলায়মানের জন্য অত্যন্ত প্রবল বায়ুকে তাহার (সোলায়মানের) হুকুমে প্রবাহিত হইত সেই জমিনে যেখানে আমরা (আল্লাহ) বরকত দিয়াছি ইহার মধ্যে এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা (আল্লাহ) সম্যক অবগত তথা খুব অবহিত।

আল্লাহ যা কিছু বান্দাকে দান করেন সেই দানের রূপটি কখনই ‘আমি’-রূপ ধারণ করে দান করেন না, বরং একই বহুরূপ ধারণ করে দান করেন; তাই দানের প্রশ্নে আল্লাহ ‘আমি’ শব্দটি ব্যবহার না করে সব সময় ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ যেন $২+২=৪$ হবার মতো অংকের হিশাব। এই অংকের হিশাবের বাইরে আল্লাহ কোনো কিছু করেন না। তাই আমরা কোরান-এ অন্যত্র দেখতে পাই যে আল্লাহ বলছেন যে, তাঁর আইন কখনই বদলায় না। এই আয়াতটিতে মারাত্মক একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা সাধারণ মানুষের মন-মগজে না-ও ধরা পড়তে পারে আর সেই বিষয়টি হলো হজরত নবি সোলায়মানের (আ.)

হকুম্বে অত্যন্ত প্রবল বাতাস শান্ত হয়ে যেত এবং জমিনের সেইদিকেই প্রবাহিত করতেন যেখানে আল্লাহর বরকত রয়েছে। হজরত সোলায়মানের (আ.) হকুম্বে প্রকৃতির বায়ু যেখানে প্রবাহিত হতো সেখানে কি শেরেকের গন্ধ পাওয়া যায়? কারণ আল্লাহর হকুম্বে কথাটি না বলে সোলায়মানের (আ.) হকুম্বে প্রকৃতির প্রচণ্ড বায়ু শান্ত হয়ে যেত এবং যে দিকে আল্লাহর বরকত রয়েছে সেইদিকে প্রবাহিত হত। কত বড় ক্ষমতার অধিকারটি আল্লাহ হজরত সোলায়মানকে (আ.) দিয়েছিলেন ভাবতেও অবাক লাগে। এ রকমভাবে একেক নবি-রসুলকে একেক রকম বিশেষ ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছেন। জাঁদরেল নবি হজরত মুসা (আ.)-কে যেখানে বেলায়েতপ্রাপ্ত এবং আবদিয়াতের অধিকারী হজরত খিজির ধৈর্যধারণের প্রশ্নে সংশয় প্রকাশ করেছেন, সেই ওলি এবং আবদিয়াতের অধিকারী খিজিরকে আল্লাহ কত বড় ক্ষমতা দান করেছেন ভাবতেও অবাক লাগে। বড়পীর সাহেব এবং খাজা গরিব নেওয়াজের মতো ওলিরা যে সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই কথাটি কেমন করে কী উপায়ে অস্বীকার করা যায়? নবি সোলায়মানের (আ.) হকুম্বে যেখানে প্রচণ্ড বাতাস শান্ত হয়ে যায় এবং যেদিকে ইচ্ছা নবি সোলায়মান (আ.) তাঁর হকুম্বে সে দিকেই প্রবাহিত করতে পারেন, সেখানে বেলায়েত এবং আবদিয়াতের অধিকারী বড়পীর সাহেব, খাজা গরিব নেওয়াজ, মারুফ কুখরি, জুনুন মিসরি, বশরে হাফি, সমনুন মোহেব, দাতা গঞ্জি বখশ, শাহাবাজ কলন্দর, মাংগো পীর, শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দর পানিপাথি, শেখ ফরিদ, মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া ॥ এ রকমভাবে লরু লরু ওলি-গাউস কুতুব-আবদাল-আরেফেরা কি আরও বেশি, আরও চমকপ্রদ, আরও বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না? এই সামান্য বিষয়টি যাদের বুঝতে কষ্ট হয় তারা কি

ওহাবি নয়? তারা কি খাস্‌সুলখাস ওহাবি দর্শনের অনুসারী নয়? তারা কি পোড়া কপাইলা তকদিরের অধিকারী নয়? যেখানে আল্লাহ পোড়া কপাইলা করে বানিয়েছেন সেখানে চরম সত্যে কোনো গালিই থাকে না। আল্লাহর বরকতময় স্থানগুলোতেই তো নবি সোলায়মানের (আ.) হকুমে সেই বিশেষ বাতাস প্রবাহিত হতো। তা হলে হজরত সোলায়মানের (আ.) দোহাই দিলে কি দোষের বিষয় হবে? খাজাবাবার মাজারে খাজাবাবার কাছে কিছু চাইলে কি কোনো দোষের বিষয় হবে? যে কোনো ওলি-আল্লাহর কাছে চাইলে কি অন্যায় হবে? কোরান-এর এই আয়াতে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই ‘বিআমরিহি’ তথা সোলায়মানের (আ.) হকুমে বাতাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হতো। তা হলে আল্লাহর ওলিদের কাছে কিছু চাওয়া কি শেরেক হয়? আল্লাহর ওলিরা আল্লাহকে সঙ্গে নিয়েই ওলি হয়েছেন। আল্লাহ সঙ্গে না থাকলে কেহই ওলি হতে পারেন না। সুতরাং একজন আল্লাহর ওলি কখনই আল্লাহ হতে আলাদা নন। গাছের ডাল সম্পূর্ণ একটি গাছ নয়, বরং গাছের একটি অংশ। সোজা কথায় গাছের ডাল গাছ নয়, আবার গাছ হতে আলাদাও নয়। তকদিরে বুঝবার, জানবার অধিকারটি যদি আল্লাহ দিয়ে থাকেন তো অতি সহজেই বুঝতে পারবে, আর না দিলে হাজারও বুঝালেও বুঝতে পারবে না।

৮২. এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনাশ্) শয়তানদের (শাইয়াতিন্) যাহারা (মাই) ভুবুরির কাজ করিত (ইয়াগুসুন্) তাহার জন্য (লাহ্) এবং (ওয়া) করিত (ইয়ামালুন্) কাজ (আম্মালান্) ছাড়াও (দুনা) ওইটা (জালিকা) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ্) ছিলাম (কুননা) তাহাদের জন্য (লাহম্) রন্ধাকারী (সংরক্ষকারী, হেফাজতকারী, তত্ত্বাবধানকারী) (হাফেজিন্)।

এবং শয়তানদের মধ্য হইতে যাহারা ডুবুরির কাজ করিত তাহার জন্য (সোলায়মানের জন্য) এবং কাজ করিত ওইটা ছাড়াও এবং আমরা (আল্লাহ) ছিলাম তাহাদের জন্য রক্ষাকারী।

এই আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে এবং ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে শয়তান শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে জিন, অথচ এই আয়াতে জিন শব্দটির নামগন্ধও নাই। কিছু শয়তান জিনজাতি হতে আগমন করেছে বলেই পাইকারিভাবে জিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতেই আমরা দেখতে পাই যে, জিনজাতির মধ্যেও আল্লাহর ওলি, ভালো এবং মন্দ সবই ছিল ॥ যে রকম মানবজাতির মধ্যেও পাওয়া যায়। জিনজাতির মধ্যে নবি-রসূল আছেন কি না জানি না, তবে আল্লাহর ওলি যে আছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং শয়তান বলতেই যে সমগ্র জিনজাতিকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা লিখতে হবে বা বলতে হবে, এটা ঠিক নয়। আল্লাহ বিশেষ অবাস্তবতার প্রতীকরূপেও শয়তান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিশেষ অবাস্তবতার প্রতীকটি যেভাবে জিনজাতির মধ্যে আছে তেমনি মানবজাতির মধ্যেও অনেক আছে। এখানে যারা আল্লাহর বিশেষ অবাস্তবতা তাদেরকেই শয়তানরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর এই অবাস্তবতা হজরত সোলায়মানের (আ.) জন্যে ডুবুরির কাজ করত এবং এই কাজ ছাড়াও আরও অনেক রকম কাজ করত। যেহেতু এই বিশেষ অবাস্তবতা তথা শয়তানেরা ডুবুরির কাজ এবং আরও অন্যান্য কাজ হজরত সোলায়মানের জন্য করত এবং এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নটি ওঠে বলেই ‘হাফেজিন’ তথা নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় আল্লাহকে দেখতে পাই।

৮৩. এবং (ওয়া) আইউব (আইউবা) যখন (ইজ্জ) তিনি ডাকিয়াছিলেন (নাদা) তাহার রবকে (রাব্বাহ) নিশ্চয়ই আমি (আননি) আম্মাকে স্পর্শ করিয়াছে (ধরিয়াছে) (মাস্‌সানি) দুঃখ-কষ্ট (দুরূ) এবং (ওয়া) তুমি (আন্তা) সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (আরহামু) সব দয়ালুদের (রাহিমিন)।

এবং আইউব (আ.) যখন ডাকিয়াছিলেন তাহার রবকে নিশ্চয়ই আমি আম্মাকে ধরিয়াছে দুঃখকষ্ট এবং তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, সব দয়ালুদের (মধ্যে)।

৮৪. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) সাড়া দিলাম (ফাস্তাজাবনা) তাহার (আইউব) জন্য (লাহ) সুতরাং আমরা দূর করিয়া দিলাম (ফাকাশাফনা) যাহা (মা) তাহার সহিত (বিহি) হইতে (মিন) দুঃখকষ্ট (দুররিউ) এবং (ওয়া) আমরা তাহাকে দিলাম (আতাইনাহ) তাহার পরিবারকে (আহলাহ) এবং (ওয়া) তাহাদের মতো (মিস্লাহম) তাহাদের সহিত (মাআহম) রহমতরূপে (রাহমাতাম) হইতে (মিন) আমাদের (আল্লাহর) পক্ষ (ইন্‌দিনা) এবং (ওয়া) জিকির (জিক্রা) এবাদতকারীদের জন্য (লিল্‌ আবেদিন)।

সুতরাং আমরা (আল্লাহ) সাড়া দিয়াছিলাম তাহার (আইউব) ডাকে, সুতরাং আমরা (আল্লাহ) দূর করিয়া দিলাম যাহা তাহার সাথে দুঃখকষ্ট হইতে এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাকে দিলাম তাহার পরিবারকে এবং তাহাদের মতো তাহাদের সাথে রহমতরূপে আমাদের (আল্লাহ) পক্ষ হইতে এবং এবাদতকারীদের জন্য জিকির।

৮৫. এবং (ওয়া) ইসমাইলকে (ইসমাইলা) এবং (ওয়া) ইদ্রিসকে (ইদরিসা) এবং (ওয়া) জুলকিফালকে (জাল্কিফলি) প্রত্যেকে (কুল্লু) হইতে (মিনাস) সবারকারীদের (সাবরিন)।

ল্ট এবং ইসমাইলকে এবং ইদ্রিসকে এবং জুলকিফালকে প্রত্যেকে সরকারীদের হইতে।

৮৬. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে দাখিল (সামিল) করিয়াছি (আদখাল্‌নাহুম) মধ্যে (ফি) আমাদের রহমতে (অনুগ্রহে) (রাহ্মাতিনা) তাহারা নিশ্চয়ই (ইন্নাহুম) হইতে (মিনাস্) সংকর্মশীল (পুন্যকর্মশীল, ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ)-দের (সালিহিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে দাখিল (সামিল) করিয়াছি আমাদের রহমতের মধ্যে, নিশ্চয়ই তাহারা সংকর্মশীলদের হইতে।

৮৭. এবং (ওয়া) জুননুকে (মাছওয়ালাকে, ইউনুস নবিকে) (জান্নুনি) যখন (ইজ্) চলিয়া গিয়াছিল (জাহাবা) দ্রুত (রাগাবিত, রুশ্ট) হইয়া (মুগাদিবান) সুতরাং মনে করিয়াছিল (ফাজ্জান্না) যে (আন্) না (লান) ধরিতে পারিব (নাক্দিরা) তাহার উপর (আলাইহি) সুতরাং তিনি ডাকিয়াছিলেন (ফানাদা) মধ্যে (ফি) অন্ধকারে (জুলুম্বাতি) যে (আন্) নাই (লা) কোনো ইলাহ (ইলাহা) একমাত্র (ছাড়া) (ইল্লা) তুমি (আন্তা) ভাসমান (সুবহানাকা) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) ছিলাম (কুনতু) হইতে (মিনাজ্) জালিমদের (সীমালঙ্ঘনকারীদের) (জালেমিন)।

এবং যখন দ্রুত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল জুননুকে সুতরাং মনে করিয়াছিল যে ধরিতে পারিব না তাহার উপর সুতরাং তিনি ডাকিয়াছিলেন অন্ধকারের মধ্যে যে নাই কোনো ইলাহ তুমি ছাড়া, তুমিই ভাসমান, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম জালিমদের হইতে।

৮৮. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ডাকে সাড়া দিলাম (ফাস্তাজাবনা) তাহার জন্য (লাহ) এবং (ওয়া) তাহাকে আমরা উদ্ধার করিয়াছিলাম (নাজ্জাইনাহ)

হইতে (মিন্) দুশ্চিন্তা (উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা) (গাম্‌মি) এবং (ওয়া) ওইরূপেই (কাজালিকা) আমরা উদ্ধার করি (নুন্‌জিল) মোমিনদেরকে (মুমিনিন)।

সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ডাকে সাড়া দিলাম তাহার জন্য এবং তাহাকে আমরা উদ্ধার করিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং ওইরূপেই আমরা উদ্ধার করি মোমিনদেরকে।

এ -আয়াতে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে, আল্লাহ ইমানদারদেরকে উদ্ধার করার কথাটি না বলে তথা আম্মানুদের কথাটি না বলে বলা হলো, ‘মোমিনদেরকে উদ্ধার করি।’ এবং ‘এইরূপে’ না বলে ‘জালিকা’ তথা ‘ওইরূপে’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘আম্মানু’ তথা ইমানদার এবং ‘মোমিন’-দের মাঝে যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আমরা দেখতে পাই উহাই এই আয়াতে প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ আল্লাহ আম্মানুদের সঙ্গে থাকেন, এ রকম একটি আয়াতও কোরান-এ নাই, বরং মোমিনদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বলে কোরান-এ ঘোষণা করা হয়েছে।

৮৯. এবং (ওয়া) জাকারিয়াকে (জাকারিয়া) যখন (ইজ্) তিনি ডাকিয়াছিলেন (নাদা) তাহার রবকে (রাব্বাহ্) হে আমার রব (রাব্বি) না (লা) আম্মাকে ছাড়িও না (তাজারনি) একাকী (ফারদাও) এবং (ওয়া) তুমি (আনতা) উত্তম (খাইরু) উত্তরাধিকারীদের (ওয়ারেসিন)।

এবং জাকারিয়াকে যখন তিনি তাহার রবকে ডাকিয়াছিলেন, (হে) আমার রব, আম্মাকে (একাকী) ছাড়িও না, এবং উত্তরাধিকারীদের তুমিই উত্তম।

৯০. সুতরাং আমরা ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম (ফাস্তাজাবনা) তাহার জন্য (লাহ্) এবং (ওয়া) আমরা দিয়াছিলাম (ওয়াহাবনা) তাহার জন্য (লাহ্) ইয়াহিয়াকে (ইয়াহইয়া) এবং (ওয়া) আমরা উপযোগী (উপযুক্ত, কার্যকর, অনুকূল) করিয়াছিলাম (আস্লাহনা) তাহার জন্য (লাহ্) তাহার স্বীকে (জাওজাহ্)

নিশ্চয়ই তাহারা (ইব্রাহিম) ছিল (কানু) প্রাণপণ (স্থায়ী প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া কার্যসাধনের সঙ্কল্পপূর্ণ) চেষ্টা (ইউসারিউন) মধ্যে (ফি) ভালো কাজগুলিতে (খাইরাতি) এবং (ওয়া) আমাদেরকে ডাকিত (ইয়াদউনানা) আগ্রহ (ঐকান্তিক ইচ্ছা, বশ্বতা) (রাগাবাও) এবং (ওয়া) ভীতি (ভয়, শঙ্কা) সহকারে (রাহাবান) এবং (ওয়া) ছিল (কানু) আমাদের কাছে (লানা) ভীত (খাশিয়িন)।

সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম তাহার জন্য এবং আমরা দিয়াছিলাম ইয়াহিয়াকে তাহার জন্য এবং আমরা উপযোগী করিয়া দিয়াছিলাম তাহার জন্য তাহার স্বীকে নিশ্চয়ই তাহারা প্রাণপণ (চেষ্টা) করিত ভালো কাজগুলির মধ্যে এবং আগ্রহ (লইয়া) আমাদেরকে (আল্লাহকে) ডাকিত এবং ভীতি সহকারে এবং তাহারা ছিল আমাদের (আল্লাহ) কাছে ভীত।

৯১. এবং (ওয়া) যে (ল্লাতি) রক্ষা করিয়াছিল (সংরক্ষণ করিয়াছিল, বজায় রাখিয়াছিল, টিকাইয়া রাখিয়াছিল) (আহসানাত্) তাহার কামপ্রবৃত্তিকে (তাহার সতীত্বকে, যৌন সম্বোগকে) (ফারজাহা) সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ফুৎকার দিয়াছিলাম (ফানাফাখনা) তাহার (মরিয়ম) মধ্য (ফিহা) হইতে (মিন) আমাদের রুহ (রুহিনা) এবং (ওয়া) তাকে বানাইয়াছিলাম (জাআল্নাহা) এবং (ওয়া) তাহার পুত্রকে (আব্নাহা) একটি আয়াত (নিদর্শন) (আয়াতাল্) জন্য (লিল্) সমস্ত আলমের (বিশ্ববাসীদের) (আলআমিন)।

এবং যিনি (মরিয়ম) তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন সুতরাং আমরা ফুৎকার দিলাম তাহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তাকে বানাইয়াছিলাম এবং তাহার পুত্রকে একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য।

এই আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, আল্লাহ কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই রুহ ফুৎকার করেন না, বরং মানুষের তৈরি সমাজে অবহেলিত নারীর মধ্যেও আল্লাহর রুহ ফুৎকার করেন। নারী জাতিকে দুর্বল পেয়ে পুরুষরা নারীদেরকে সমাজের বুকে তেমন মর্যাদা দেয় না, কিন্তু এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে নারীর মধ্যেও আল্লাহ রুহ ফুৎকার করেন। যদি সেই নারী রুহ ফুৎকার করার উপযুক্ততা আল্লাহর দৃষ্টিতে পাবার যোগ্য হন তো অবশ্যই রুহ ফুৎকার করা হয়। আমরা কোরান হতে জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রথম রুহ ফুৎকারটি আদমের মধ্যে করেছিলেন। আরও একটু ভালো করে লক্ষ করুন যে, এখানে তথা এই আয়াতে নফস ফুৎকার করার কথাটি বলা হয় নি, এবং নফস ফুৎকার করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আল্লাহর কোনো নফস নাই। যেহেতু আল্লাহর কোনো নফসই নাই, সুতরাং ফুৎকার দেবার প্রশ্নই ওঠে না। নফস জীবন-মৃত্যুর অধীন। নফস সুখ-দুঃখ ভোগ করে। নফসের ক্লান্তি-অবসাদ-ঘুম-আলস্য আছে। সুতরাং আল্লাহ এইসব বিষয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে তথা মৃত্যু-ঘটনাটির মুখোমুখি নফসটিকেই হতে হয়, যাকে আমরা বাংলায় জীবাত্মা বলে থাকি। প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, বলা হয়েছে কোরান-এ, কিন্তু কোরান মৃত্যুতে নফসটি ধ্বংস হয়ে যাবে এই কথাটি একবারও বলে নি। যেমন কোরান বলছে, কুললু নাফসুল জায়েকাতুল মউত, তথা প্রতিটি নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু ‘তাবাকাতুল মউত’ তথা মৃত্যুতে ধ্বংস হয়ে যাবে, এই কথাটি বলা হয় নি। ‘জায়েক’ অর্থ স্বাদ গ্রহণ করা, চেখে দেখা। মা-বোনেরা তরকারিতে লবণ হয়েছে কি না তরকারির গুরুয়া চেখে দেখলে বুঝতে পারেন। সেই রকম প্রতিটি নফসকে মৃত্যু-ঘটনাটি কেমন উহা চেখে দেখতে হবে। যেহেতু রুহ সৃষ্টির

অন্তর্গত নহে, রুহ সৃষ্টির মধ্যে পড়ে না, সেই হেতু রুহকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ একবারও বলা হয় নি। যেমন ‘কুল্লু রুহিন জায়েকাতুল মাউত’ অর্থাৎ প্রত্যেক রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এই কথাটি কোরান-এ একবারও বলা হয় নি। গায়ের জোরে গুপ্তা হওয়া যায়, কিন্তু গুরু হওয়া যায় না। যারা রুহকেও সৃষ্টির আওতায় এনে ‘নুরানি মাখলুক’ তথা নুরের সৃষ্টি বলতে চায় এবং ব্যাখ্যা করতে চায়, তাদেরকেও বলার কিছু থাকে না। কারণ তকদির তাকে অথবা তাদেরকে এই বিষয়টি বুঝতে দেয় না। আরও লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ্ এক হয়েও ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রুহ শব্দটি কোরান-এ কোথাও বহুবচনে ব্যবহার করা হয় নি। আল্লাহর রুহ কেবলমাত্র ইসা (আ.)-এর মাঝেই ফুৎকার করেন নি, বরং তাহার পুত্রকেও ইসা (আ.) (অনেকে যিশু খ্রিস্টও বলে থাকেন) রুহ ফুৎকার করে দিয়েছেন। কোরান -এ ‘ওয়া আরনাহা’ ॥ ‘এবং তাহার পুত্রকেও’ রুহ ফুৎকার করেছেন বলা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, কোরান মরিয়ম-এর পুত্রকেও সমস্ত আলমের জন্য একটি আয়াত করে রেখেছেন তথা ‘আইয়াতাল্লিল আল আমিন।’ আল্লাহর প্রতিটি আয়াতই একেকটি বিস্ময়, কিন্তু ইসা (আ.) হলেন আল্লাহর একটি বিস্ময়ের বিস্ময় নামক আয়াত। কারণ ইসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেই কথা বলেছিলেন এবং দোলনায় গুয়ে গুয়ে অনেক কথা বলেছেন এরও নিদর্শন আমরা দেখতে পাই এবং আরও অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পাই, যেমন ॥ হজরত ইসা (আ.) জন্মান্নকে চক্কু দান করেছেন, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করেছেন এবং যে বিষয়টি সবচেয়ে বিস্ময়কর : মৃত মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং মাটির তৈরি একটি পাখি, যার মধ্যে নফস নাই তথা জীবনই নাই, সেই পাখিটিকে ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে

গেল এবং ইসা (আ.)-র সাহাবারা কে কী দিয়ে খাদ্য খেয়েছেন সেটাও বলে দিতে পারতেন এবং সাহাবাদের ঘরের ডেতর কী কী আছে তাও পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন। এখন প্রশ্ন হলো, যেখানে হজরত ইসা (আ.)-এর এলম্নে গায়েব জ্ঞানবার পরিষ্কার দলিলটি পেলাম, সেখানে মহানবি এলম্নে গায়েব জ্ঞানতেন না বলাটা যে একটি কুফরি আকিদা, এটা অনেকেই বুঝেও বোঝেন না। যারা বুঝেও বোঝেন না তাদেরকেই বা কী করে দোষারোপ করব? কারণ ইহা তাদের তকদির। মহানবি আবু জাহেলের হাতের মুঠোর পাথরকণাগুলোকে কলোমা পাঠ করালেন, যে পাথরকণার নফস থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে কোরান-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মূল বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহানবি সম্পর্কে যা তা বলাটাকে সমীচীন মনে করি না।

৯২. নিশ্চয়ই (ইন্না) এই যে (হাজিহি) তোমাদের উম্মত (জাতি) (উম্মাতুকুম) উম্মত (জাতি) (উম্মাতাউ) একই (ওয়াহিদাতাউ) এবং (ওয়া) আমি (আনা) তোমাদের রব (রাব্বুকুম) সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো (ফাবুদুন)।

নিশ্চয়ই এই যে তোমাদের উম্মত একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো।

পৃথিবীতে বাস করা মানবজাতি যে আসলে একই জাতি ইহাই কোরান বলেছে। পৃথিবীর সব মানুষ একই জাতির হয়েও এত বিভিন্নতা দেখতে পাই কেন? প্রত্যেক উম্মতের জন্য আল্লাহ অবশ্যই হেদায়েত করার জন্য সেই উম্মতের বিশ্বস্ত ভাষায় নবি-রসূল পাঠিয়েছেন, মানুষকে হেদায়েত করার জন্য। অনেক উম্মতের অনেক রকম ভাষায় নবি-রসূল পাঠানোর দরুন এবং সেই উম্মতের পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই নবি-রসূলেরা হেদায়েত করে গেছেন। হেদায়েত করার প্রশ্নে

প্রতিটি উন্মত্তের নিজস্ব প্রয়োগ-পদ্ধতির বিভিন্নতা থাকাটি একান্ত স্বাভাবিক এবং এই প্রয়োগ-পদ্ধতির বিভিন্নতা নিয়েই যত মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। তাই অন্যত্র কোরান আমাদেরকে এই বলে শিক্ষা দিচ্ছে যে, কোনো নবি-রসুলকে ছোট-বড় করতে যেয়ো না অথবা পার্থক্য করো না। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানের অবস্থানটির দরুন মতপার্থক্য, ভেদাভেদ, ছোটবড় ইত্যাদি করাটি একান্ত স্বাভাবিক। মানুষের নফ্সের সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তান থাকার দরুন অনেক ধরনের কুমন্ত্রণা প্রতিনিয়ত দিয়ে চলছে। এবং শয়তানের এই অনেক রকম কুমন্ত্রণার খপ্পরে পড়ে মানুষ সঠিক পথের পরিচয় জানতে গিয়ে দিশেহারা হতে অনেকটা বাধ্য হয়। কোনটা শয়তানের কথা আর কোনটা শয়তানমুক্ত নফ্সের কথা ইহা ধরাটাও একটি সাম্প্রতিক বিষয়। শয়তান যে প্রতিটি মানুষের ভেতর আপন নফ্সের সঙ্গেই জড়িয়ে থেকে কত রকম বিভ্রান্তি প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে তার হিসাব রাখার প্রশ্নটি তো একদম অবান্তর। কিন্তু কিছুটা বুঝ তখনই আসতে পারে যখন মানুষ এবাদতের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তি হতে আন্তরিক মুক্তি কামনা করে। তাই আল্লাহ বলছেন ‘আম্মারই এবাদত করো’ তথা ‘ফাবুদুন’। যদিও আমরা একই উন্মত্ত হতে এসেছি, কিন্তু এখন আর আমরা একের মধ্যে থাকতে পারছি না, তাই কোরান বলছে যে, প্রত্যেক কওমের মধ্যে নবি-রসুল পাঠিয়ে সেই কওমের ভাষায় সেই কওমের কৃষ্টি-কালচারের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েত করা হয়। পাঠকদের কিছুটা ধারণা দিতে পারি কি না সেই জন্য কোরান-এর সূরা বাকারার ২৮৫ নম্বর আয়াতটি দেখতে বলছি। আবার, সূরা নেসার ১৬৪ নম্বর আয়াতটিও দেখতে পারেন। আবার, সূরা ইউনুস-এর ৪৭ নম্বর আয়াতটিও পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা রাদ-এর ৭ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার,

সূরা ইব্রাহিম-এর ৪ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা নহল-এর ৩৬ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা ফাতির-এর ২৫ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা মোমিন-এর ৭৮ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। অধম লিখকের অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটুকু ধরতে পেরেছি সেটুকুই আপনাদেরকে অকপটে তুলে ধরলাম।

৯৩. এবং (ওয়া) তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল (তাকাত্তাও) তাহাদের কার্যকলাপ (আম্বরাহম) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহম) প্রত্যেকে (কুললুন) আমাদের (আল্লাহ) দিকেই (ইলাইনা) ফিরিয়া আসিবে (রাজিউন)।

এবং তাহাদের কার্যকলাপ (একটি ধর্মের প্রশ্নে) তাহাদের মাঝে (সুসম্পর্কের প্রশ্নে) তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। প্রত্যেকেই আমাদের (আল্লাহ) দিকেই ফিরিয়া আসিবে।

৯৪. সুতরাং যে (ফাম্বাই) আমল (কাজ) করিবে (ইয়াম্মাল) হইতে (মিনাস) সালেহ করে (ন্যায়পরায়নতা, নিরপেক্ষতা) (সালিহাতি) এবং (ওয়া) তিনি (হয়া) মোমিন (মুমিনুন) সুতরাং না (ফালা) ব্যর্থ হইবে (কুফরানা) তাহার চেষ্ঠার জন্য (লিসাইহি) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) নিশ্চয়ই (ইন্না) তাহার জন্য (লাহ) লিখক (কাতিবুন)।

সুতরাং যে আমল করিবে সালেহ হইতে এবং যে মোমিন সুতরাং ব্যর্থ হইবে না তাহার চেষ্ঠার জন্য এবং আমরা (আল্লাহ) নিশ্চয়ই তাহার জন্য লিখক।

৯৫. এবং (ওয়া) হারাম (নিষিদ্ধ) (হারামুন) উপরে (আলা) লোকালয় (জনপদ) (কারইয়াতিন) আমরা (আল্লাহ) যাহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি

(আহলাক্‌নাহা) তাহারা যে (আননাহম্) না (লা) ফিরিয়া আসিতে পারিবে (ইয়ারজিউন)।

এবং (কোনো) লোকালয়ের উপরে হারাম আমরা (আল্লাহ) যাহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি তাহারা যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

৯৬. যে পর্যন্ত না (যতদিন না) (হাত্তা) যখন (ইজ্জা) রেহাই (মুক্তি, পরিব্রাণ, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি) দেওয়া হইবে (ফুতিহাত্) ইয়াজুজ (ইয়াজুজু) এবং (ওয়া) মাজুজকে (মাজুজু) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্) হইতে (মিন্) প্রত্যেক (এক এক করিয়া) (কুল্লি) উচ্চ ভূমি (উচ্চ মাটি, জমি) (হাদাবিন্) ছুটিয়া আসিবে (ইয়ান্সিলুন)।

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ এবং মাজুজকে যখন মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উচ্চভূমি হইতে প্রত্যেকে ছুটিয়া আসিবে।

র অধম লিখক এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে পারলান্ন না। কারণ ইহা আমার জানা নাই। ইয়াজুজ-মাজুজ সম্বন্ধে অনেক তফসিরকারক অনেক রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তাদেরকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু আমি ইহার মেজাজি এবং হাকিকি অর্থটি কী হবে কিছুই বুঝতে পারলান্ন না। অনুমানের গুলমারা বিদ্যা জাহির করে কিছু একটা লিখতে আমার বিবেক প্রচণ্ড রকমের বাধা দেয়, তাই অনুমানের ব্যাখ্যাটিও লিখতে পারলান্ন না।

৯৭. এবং (ওয়া) নিকটবর্তী (আসন্ন, নিকটে আছে এমন, সন্নিহিত, সমীপবর্তী) হইবে (আক্‌তারাবা) ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা) (ওয়াদুল্) সত্য (ঠিক, যথার্থ, নির্ভুল, প্রকৃত) (হাক্কু) সুতরাং যখন (ফাইজা) তখন (হিয়া) বিস্ফোরিত (ভয়াবহ আকার ধারণ) হইবে (শাখিসাতুন) চোখগুলি

(চক্ষুসমূহ) (আবসোয়ার) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি করিয়াছিল (কাফার) আমাদের দুর্ভোগ (দুর্গতি, লাঞ্ছনা, কষ্ট) হায় (ইয়াওয়াইলানা) নিশ্চয়ই (কাদ) আমরা ছিলাম (কুনা) মধ্যে (ফি) গাফলতির (অমনোযোগের, অবহেলার, কুঁড়েমির) (গাফ্লাতিম) হইতে (মিন) এইটা (হাজা) বরং (বাল) আমরা ছিলাম (কুনা) জালিম (সীমালঙ্ঘনকারী) (জালিমিন)।

ল্ট এবং সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হইবে সুতরাং যখন চোখগুলি বিষ্ফারিত হইবে তখন যাহারা কুফরি করিয়াছিল (এবং বলিবে) হায় আমাদের দুর্ভোগ নিশ্চয়ই গাফলতির মধ্যে আমরা ছিলাম এইটা হইতে বরং আমরা ছিলাম জালিম।

র ওয়াদার সত্যটি যখন কাছে আসবে তখন কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে ॥ এই কথাটির দ্বারা মানুষের মৃত্যু-ঘটনা নামক ছোট কেয়ামতটিকেই বোঝানো হয়েছে। মৃত্যু-ঘটনা নামক ছোট কেয়ামতটি যখন উপস্থিত হয়, সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তথা পরিষ্কার বুঝতে পারে। তখন বিপথগামীরা নিজেরাই সব কিছু অকপটে মেনে নেয় এবং মেনে নিতে বাধ্য। তাই বিপথগামীরা বলে ফেলে যে, আমরা অলসতার মধ্যে ডুবেছিলাম এবং আমরা যে জালিম ছিলাম এতে কোনো সন্দেহ নাই।

৯৮. নিশ্চয়ই তোমরা (ইন্বাকুম) এবং (ওয়া) যাহাদের (মা) তোমরা এবাদত করিতে (তাবুদুনা) হইতে (মিন) ছাড়া (দুনি) আল্লাহ (আল্লাহ) ইক্বন (আপ্তন জ্বালাইবার উপকরণ) (হাসাবু) জাহান্নামে (জাহান্নামা) তোমরা (আনতুম) তাহাতে (লাহা) প্রবেশকারী (যে ভিতরে ঢোকে, প্রবেশক) (ওয়ারিদুন)।

নিশ্চয়ই তোমরা এবং যাহাদের হইতে তোমরা এবাদত করিতে আলাহ্ ছাড়া (বিনা, ব্যতীত) তোমরা জাহান্নামের আগুন জ্বলাইবার উপকরণ (হইবে) (এবং) তাহাতে প্রবেশকারী (হইবে)।

র আপন আপন প্রবৃত্তি নামক মূর্তিগুলি যারা প্রতিনিয়ত পূজা করছে তথা এবাদত করছে ॥ সেই মূর্তিগুলি ম্লেজাজিই হোক আর হাকিকিই হোক ॥ তাতে আলাহ্‌র এবাদত হয় না, বরং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করতে হবে।

৯৯. যদি (লাউ) হইত (কানা) এইসব (হাউলাই) ইলাহ (কর্তা, নেতা, অধিকারী, মাবুদ) (আলিহাতাম্) না (মা) তাহাতে প্রবেশ করিত (ওয়ারাদুহা) এবং (ওয়া) প্রত্যেকে (কুললুন) ইহার মধ্যে (ফিহা) স্থায়ী (পাকাপোক্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্থির) হইবে (খালিদুন)।

ল্ট যদি এইসব পূজা করিবার (যোগ্য) হইত (তাহা হইলে) তাহাতে প্রবেশ করিত না এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেকে স্থায়ী হইবে।

১০০. তাহাদের জন্য (লাহম্) ইহার মধ্যে (ফিহা) কানফাটা আর্থনাদ (কাতর বা আকুল চিৎকার) (জাফিরুঁ) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্) ইহার মধ্যে (ফিহা) না (লা) গুনিতে পাইবে (ইয়াস্মাউন্)।

ল্ট তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে (খাকিবে) কানফাটা আর্থনাদ এবং তাহারা ইহার মধ্যে গুনিতে পাইবে না (কিছুই)।

১০১. নিশ্চয়ই (ইন্না) যাহাদের (লাজিনা) প্রথম (পূর্ব) হইতে নির্ধারিত হইয়াছে (সাবাকাত্) তাহাদের জন্য (লাহম্) আমাদের (আলাহ্) হইতে (মিন্‌নাল্) সৌন্দর্য (ভাল, শুভ, মঙ্গলকর, উপযুক্ত) (হস্না) ওইসব লোকে (উলাইকা) তাহা হইতে (আনহা) দূরে রাখা হইবে (মুবআদুনা)।

নিশ্চয়ই আমাদের (আল্লাহ) হইতে সৌন্দর্য প্রথম হইতেই নির্ধারিত হইয়াছে যাহাদের (জন্য) তাহাদের জন্য (এবং) ওইসব লোকে তাহা (জাহান্নাম) হইতে দূরে রাখা হইবে।

প্রথম থেকেই অথবা পূর্বেই নির্ধারিত করা আছে যাদের জন্য সৌন্দর্যের রহমত তাদেরকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জীবনটি কি পূর্বের কর্মফলের জীবন? যদি কর্মফল বলি তা হলে মৃত্যু নামক কেয়ামত ঘটে যাবার পর আবার অন্য দেহ-নামক পোশাক ধারণ করে আসবার কথাটি বুঝতে চাই। কারণ, প্রথম থেকেই যাদের উপর আল্লাহর অশেষ সৌন্দর্যটি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে ॥ কথাটির দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন উহা বুঝতে পারলাম না। কারণ তা হলে বলতে হয় যে আমার জন্মটাই একটা বিরাট আশীর্বাদ নতুবা একটি বিরাট অভিশাপ নতুবা একটি স্থিরকৃত তকদির। ধরে নিলাম এই আয়াতটির অর্থ এ রকমই হবে, তা হলেও আমার বলার কিছুই থাকে না, কারণ আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে রহমত দান করতে পারেন। ভালো কাজই নিয়তের হেরফেরে জাহান্নামে যাবার পথ করে দেয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কাজটি তো ভালোই করেছে। কিন্তু এই ভালো কাজের ভিতর নিশ্চয়ই নিয়তের হেরফের ছিল। আসলে এই আয়াতের অর্থটি কোন দিক দিয়ে কোন পথে নিতে হবে অধম লিখকের তা জানা নাই, তাই এই আয়াতের মর্মার্থটি অধম লিখক উদ্ধার করতে পারলাম না।

১০২. না (লা) তাহারা গুনিতে পাইবে (ইয়াস্মাউন) সামান্যতম শব্দ (হাসিসাহা) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) মধ্যে (ফি) যাহা (মা) চাইবে (আশতাহাত) তাহাদের নফস (আনফুসুহম) স্থায়ী হইবে (খালিদুন)।

ল্ট তাহারা শুনিতে পাইবে না (জাহান্নামের) সামান্যতম শব্দ এবং তাহারা (ইহাৱ) মধ্যে যাহা চাইবে তাহাদের নফস প্রতিষ্ঠিত (স্থায়ী) হইবে।

‘ভোগ’ শব্দটি ব্যাপকরূপে ব্যবহৃত হয়। জাহান্নামেও ভোগ আছে : এই ভোগ শাস্তির ভোগ, নির্যাতনের ভোগ, লাঞ্ছনার ভোগ। রূপক ভাষায় তথা মেজাজিরূপে এই ভোগকে পুঁজ, রক্ত, পচা মাংস ইত্যাদিও বলা হয়। খাদ্যগ্রহণ করাটাকে একটা ভোগ। জান্নাতেরও ভোগ আছে, তবে জান্নাতের ভোগে অনাবিল আনন্দ থাকে। তাই জান্নাতের ভোগটিকে বলা হয় সুখের ভোগ, মুক্তির ভোগ। পরক্ৰমে, জাহান্নামের ভোগটিকে বলা হয় দুঃখের ভোগ। যারা জান্নাতবাসী হবে তাদের জাহান্নামের কোনো শাস্তি নামক ভোগ পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং জাহান্নামের সামান্য শব্দটিও শুনে পাবে না। জান্নাতীদের নফস এর জান্নাতের সুখভোগ পাবার কথাটি এখানে বলা হয়েছে। এবং এই পাওয়াটা অস্থায়ী মোটেই নয়, বরং স্থায়ী। জান্নাতে প্রবেশ করলেও জান্নাতের নফসটি হারিয়ে যায় না, বরং সব রকম কলুষতা হতে মুক্তি লাভ করে। জান্নাতের ভোগে নিজের নফসের সুখভোগটি কোনো বন্ধন নয়, কারণ কলুষিত কামনার স্থান জান্নাতে নাই। সুতরাং এ রকম ভোগটিকে ভোগ না বলে মুক্তি পাবার কথাটি বলা চলে। যেহেতু জান্নাতে দুঃখভোগের প্রশ্ন ওঠে না, সেইহেতু জান্নাতে বাস করা প্রতিটি নফস সর্বপ্রকার কলুষতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। জান্নাতের ভোগটি আসলে কোনো ভোগই নয়। ভোগ শব্দটি এখানে রূপক তথা মেজাজি। রূপক তথা মেজাজি না থাকলে আসল তথা হাকিকির রূপটি ধরতে মানুষের কষ্ট হয়। যেমন, মেজাজি হজ আছে বলেই হাকিকি হজের কথাটি কিছু জ্ঞানী লোক বুঝতে পারে। মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি আপন গুরুকে ভক্তি এবং তোয়াফ করাটাকেই আসল তথা হাকিকি হজ বলে

ঘোষণা করেছেন। তবে ম্যাগলানা জালাল উদ্দিন রুমি রূপক তথা মেজাজি হজটিকেও গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। কারণ সমাজে আম জনতা রূপক তথা মেজাজিটিকেই ধরে রাখে এবং মেজাজিটাকেই একমাত্র সত্য মনে করে। সুতরাং জান্নাত অর্থ হলো আপন নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানকে মুক্ত করে দেওয়া, যাকে অনেক রকম ভাষায় বলা হয় আমিত্ব, অহং, অহংবোধ, খুদি, হাশ্বি, ইগো – ইত্যাদি। আসলে অনেকগুলো শব্দ, মূল বিষয়টি একই। জল, পানি, ওয়াটার, একোয়া, সুই, তান্নি, এবং আব শব্দগুলো ভিন্নভিন্ন, কিন্তু সবই এক পানির প্রতিশব্দ।

১০৩. না (না) তাহাদেরকে ভাবিত (চিন্তিত, উদ্বিগ্ন) করিবে (ইয়াহজুনুহমুল) ভীতি (ভয়, শঙ্কা, দ্রাস) (ফাজাউল) চরম (চূড়ান্ত, কঠিনতম, মৃত্যুকালীন) (আকবারু) এবং (ওয়া) তাহাদেরকে অভ্যর্থনা (সংবর্ধনা, সম্ভাষণ, আপ্যায়ন) করিবে (তাতালাক্কাহম) ফেরেশতারা (মালাইকাতু) এই (হাজা) তোমাদের দিন (ইয়াওমুকুম) যাহারা (আল্লাজি) তোমাদেরকে (কুনতুম) ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) করা হইয়াছিল (তুয়াদুন)।

ল্ট তাহাদেরকে চিন্তিত করিবে না চরম ভীতি এবং তাহাদেরকে ফেরেশতারা অভ্যর্থনা করিবে (এই বলিয়া), এই তোমাদের সেই দিন যাহার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হইয়াছিল।

র এই আয়াতে মৃত্যু-ঘটনাটিকেই চরম ভীতির দিবস বলা হয়েছে। মরে যাবার আগেও মারা যাওয়াটাকে বলা হয়, মৃতু কাবলা আন্তামুত্ তথা ‘মরার আগে মরে যাও।’ মৃত্যু-ঘটনাটি একবারই ঘটে। সুতরাং যারা মারা যাবার আগে মরে যায় তাদের আর মরণভীতি থাকে না। যদিও মরণভীতিটা একটা চরম ভীতি। এই

চরম ভীতিটি ধ্যানসাধনার মাধ্যমে সাধক যখন অতিক্রম করতে পারে, এবং এই অতিক্রমের সময়ে সাধকদের ভয়ভীতি থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু অতিক্রম করামাত্র আর কোনো ভয়ভীতি থাকে না, কারণ এটাকেই বলা হয় মরার আগে মরে যাওয়া। এই মরার আগে মরে যাওয়ার ধ্যানসাধনাটি মোটেও একটা মামুলি বিষয় নয়। কারণ খান্নাসরুপী শয়তানজনিত নফসটি জেহাদের সাধনায় সব সময় মশগুল থাকে এবং এই জেহাদে যারা লিপ্ত থাকে তাদের আর মরণ নাই, কারণ মরণকে জয় করতে পারলে হয় জেহাদ, নতুবা উহা হয় রূপক জেহাদ, মেজাজি জেহাদ এবং লোক দেখানো জেহাদ। কোরান-এর অন্য এক সূরায় আছে যে, এই জেহাদে যারা কামিয়াব হয় তাদের উপর শক্তিশালী রুহ এবং ফেরেশতাদের নাজেল করা হয় তথা পাঠানো হয়। সুতরাং যারা জীবিত থেকেও মরে যাবার ধ্যানসাধনাটিতে কামিয়াব হয়েছে তাদের আর কোনো ভয়ভীতি থাকে না। যদিও মৃত্যু-ঘটনাটিতে একটি চরম ভীতির সন্মুখীন হতে হয়, এই চরম ভীতিটি অতিক্রম করে যেতে পারলেই সাধক দেখতে পায়, তার কাছে অনেক ফেরেশতা পাঠানো হয়ে থাকে এবং সেইসব ফেরেশতারা নানা রকম শুভ সংবাদ জানিয়ে অভ্যর্থনা করে। এই আয়াতে ফেরেশতাদের অভ্যর্থনার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু রুহ পাঠানো তথা নাজেলের কথাটি বলা হয় নি। এই জন্য এই আয়াতটিকে ভবিষ্যৎকালের মধ্যে ফেলা হয়েছে। আসলে বর্তমান কাল বলে কিছুই নাই, একটি মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে বর্তমান কালটি দাঁড়িয়ে অতীত কালের দিকে চলে যায়। সুতরাং ভবিষ্যৎ আর অতীত কালই হলো আসল কাল। বর্তমান কালটি এতই ছোট যে একটি শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে অতীত কালের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। তাই আল্লাহর

মহাপ্রতিশ্রুতির কথাটি এই আয়াতে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও সৌন্দর্যবর্ধন করেছে।

১০৪. সেইদিন (ইয়াওমা) আমরা গুটাইয়া ফেলিব (নাভ্যিস) আকাশকে (সাম্রাআ) যেমন গুটানো (কাতায়িস) দফতর অথবা খাতা (সিজিল্লি) জন্য লিখিত (লিল্কুতুবি) যেমন (কাম্মা) আমরা সৃষ্টি করিয়াছি (বাদানা) প্রথম (আউয়ালা) সৃষ্টি (খাল্কিন) তাহা আমরা পুনরায় সৃষ্টি করিব (নুইদুহ) ওয়াদা (ওয়াদান) আমাদের উপর (আলাইনা) নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না) আমরা হইলাম (কুননা) সম্পাদনকারী (ফাইলিন)।

আকাশকে যেদিন আমরা (আল্লাহ) গুটাইয়া ফেলিব লিখিত দফতর বা খাতা যেমন গুটানো (হয়) যেমন আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি করিয়াছি প্রথম সৃষ্টি তাহা আমরা (আল্লাহ) পুনরায় সৃষ্টি করিব। আমাদের (আল্লাহ) দায়িত্ব (এবং) ওয়াদা আমরা নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ) হইলাম সম্পাদনকারী।

এই আয়াতটিতে যে-আকাশকে কাগজ গুটানোর মতো আল্লাহ গুটিয়ে ফেলবেন সেই আকাশটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভাসমান আকাশ নয়, বরং প্রতিটি নফসের তথা মনের আকাশকে গুটিয়ে ফেলার কথাটি বলা হয়েছে। প্রতিটি মনের আকাশকে গুটিয়ে ফেলার অর্থটি হলো জীবনের সব রকম চাহিদাগুলো মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা তথা ছোট কেয়ামতের দ্বারা গুটিয়ে ফেলা তথা সমাপ্ত করে দেওয়া। সৌরমণ্ডলের জন্ম যদি কমপক্ষে ৥ বিজ্ঞানীদের মতে ৥ সাড়ে তিন হাজার কোটি বছর হয় তা হলে শূন্য আকাশের জন্মটির বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আজও কিছু বলে নি। এই আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর তা হলো, যেমন প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই রকম পুনরায় সৃষ্টি করা। ইহাতে কখনওই ভাসমান

গ্রহ-নক্ষত্রের আকাশটির কথা বলা হয় নি, বরং প্রতিটি মানুষের মনের আকাশের কথা বলা হয়েছে। তাই এই বিষয়টিতে প্রথম সৃষ্টির মতো পুনরায় একই রকম সৃষ্টি করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

১০৫. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাদ) আমরা (আল্লাহ) লিখিয়াছিলাম (কাতাবনা) মধ্যে (ফি) জাবুর (আসমানি গ্রন্থ) (জাবুরি) হইতে (মিন) পরে (বাদি) জিকিরের (জিকরি) যে (আননাল) জমিনের (আরদা) তাহার উত্তরাধিকারী হইবে (ইয়ারিসুহা) আমার বান্দা (ইবাদিয়াস) সালেহিন (সংকর্মশীল) (সালিহন)।

এবং নিশ্চয়ই জবুরের মধ্যে আমরা লিখিয়াছিলাম জিকির হইতে পরে যে-জমিনের উত্তরাধিকারী হইবে (সেই হইবে) আমার (আল্লাহর) সালেহিন (সংকর্মশীল) বান্দা।

এই আয়াতটির ‘আর্দ’ বলতে কি জমিন বোঝানো হলো না দেহ বোঝানো হলো এটা পরিষ্কার হলো না। কারণ সালেহিন তথা আল্লাহর দৃষ্টিতে সংকর্মশীল বান্দা হওয়া মোটেই চারটিখানি কথা নয়। এই জমিনের উত্তরাধিকারী সালেহিনদের দ্বারা যদি এটা পরিচালিত এবং তাদের কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তা হলে মহাকালের একটি কাল এই যুগে ইহার লক্ষণ দেখা তো দূরের কথা, বরং চোর-চোট্টা, ডাকাত, লুচা, বদমাশ, জুয়াড়ি, ডোগী এবং এমন কোনো অসৎ কাজ নেই যাহা করে না, সেইসব জঘন্য মানুষগুলো সালেহিন তথা সংকর্মশীলদের পোশাকের মুখোশে দুনিয়াটাকে দখল করে রেখেছে এবং এরাই সর্ববিষয়ে বর্তমান যুগে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অথচ আল্লাহ আল্লাহর সালেহিন তথা সংকর্মশীল বান্দাদের কর্তৃত্ব দেবার কথাটি ঘোষণা করেছেন। অবশ্যই মহাকালের একটি ঋণকালের মধ্যে

দাঁড়িয়ে এ রকম কথা বলা যায় না। কারণ এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন আল্লাহর জমিন আল্লাহর বান্দা সালেহিনদের তথা সংকর্মশীলদের নেতৃত্বে এবং কর্তৃত্বে পরিচালিত হবেই। কারণ ইহা কোরান-এর ঘোষণা এবং কোরান নিজেই বলছে যে জবুর নামক আসমানি কিতাব যাহা হজরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাজেল করা হয়েছিল, সেখানে সেই একই কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং মহাকালের মাঝে সামান্য একটি ক্ষণকালের উপর দাঁড়িয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মোটেই ঠিক নয়। বরং সেই আকাঙ্ক্ষিত সংকর্মশীলদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব দেখার উদ্দেশ্যে অবশ্যই আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তথা সবর করতে হবে। কারণ আমরা জানি যে, আল্লাহ সবারকারীদের সঙ্গে অবশ্যই আছেন অথবা থাকেন।

১০৬. নিশ্চয়ই (ইন্না) মধ্যে (ফি) ইহার (হাজা) পয়গাম (বাণী) (লাবালাগাল) কওমের জন্য (লিকাউমিন) এবাদতকারী (আবিদিন)।

নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে (আছে) পয়গাম (বাণী) এবাদতকারী কওমের জন্য।

এই বাণীর মধ্যে তথা আসমানি কিতাবগুলির মধ্যে তথা বিশেষ করে কোরানুল করিম-এর মধ্যে এই বাণীটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, এবাদতকারী কওমের জন্য ইহা একটি সাজ্জাতিক ওজনওয়ালা বাণী। এবাদতকারী কওমই এই বাণীর যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারবে একদিন।

১০৭. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা পাঠাইয়াছি আপনাকে (আরসাল্নাকা) একমাত্র (ইল্লা) রহমতরূপে (রাহ্মাতান) সমস্ত আলমের জন্য (লিল্‌আল্‌আমিন)।

এবং না আমরা পাঠাইয়াছি আপনাকে একমাত্র রহমতরূপে সমস্ত আলমের জন্য।

এই আয়াতে মহানবিকে রহমতরূপে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। শুধু একটি আলমের জন্য নয় এবং এমনকি দুটি আলমের জন্যও নয়, বরং আল্লাহর সমস্ত আলমের জন্য মহানবিকে রহমতরূপে পাঠানো হয়েছে। যে কওম বা জাতি মহানবিকে আন্তরিক অনুসরণ করবে সেই কওম তথা সেই জাতি বাহির এবং ভেতর তথা মেক্কাজি এবং হাকিকি উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগণ্য কওম হিসাবে অবশ্যই বিবেচিত হবে। আরেকটি কথা এসে যায় যে, মহানবিকে একটি আলমের অথবা দুইটি আলমের রহমতরূপে আল্লাহ্ চিহ্নিত করেন নি, বরং পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে মহানবি সমস্ত আলমের রহমত – সুতরাং আজ হোক আর কাল হোক, একদিন না একদিন সমগ্র পৃথিবীর কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব সেই কওমের হাতেই আসবে যারা মহানবিকে আন্তরিক অনুসরণ করবে। যে-মহানবিকে আল্লাহ্ এত বড় বিশাল রহমতটি দান করেছেন সেই রহমতপ্রাপ্ত মহানবি কী করে এলমে গায়েব জানেন না বলে অপবাদ দেওয়া হয়? এই রকম আকিদা পোষণ করাটাকে একটি কুফরি আকিদা বলে আমরা মনে করি।

১০৮. বলুন (কুল) প্রকৃতপক্ষে (মূলত, মূলে, আসলে) (ইন্নালা) ওহি করা হইয়াছে (ইউহা) আমার দিকে (ইলাইয়া) যে (আন্নালা) তোমাদের ইলাহ (ইলাহকুম) ইলাহ (ইলাহউ) এক (ওয়াহিদুন) সুতরাং কি (ফাহাল) তোমরা (আনতুম) মুসলমান (আত্মসমর্পনকারী) (মুসলিমুন)।

প্রকৃতপক্ষে (আপনি) বলুন, আমার দিকে ওহি করা হইয়াছে যে, তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ সুতরাং তোমরা কি মুসলামান হইবে না?

এই আয়াতে যারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কেবলমাত্র তাদেরকেই মুসলমান বলা হয়েছে। কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নামধারী

মুসলমানের কথাটি এই আয়াতে বলা হয় নি। আল্লাহর কাছে যারা আনুগত্যের মাথা অবনত করতে পেরেছেন তাদেরকেই এই আয়াতে মুসলমান বলা হয়েছে।

১০৯. সুতরাং যদি (ফাইন) তাহারা মুখ ফিরায় (তাওয়াল্লাউ) সুতরাং বলুন (ফাকুল) তোমাদেরকে সাবধান করিয়া দিয়াছি (আজানতুকুন) উপরে (আলা) সম্মানভাবে (সাওয়াইন) এবং (ওয়া) না (ইন) আমি জানি (আদরি) নিকটে কি (আকারিবুন) বা (অথবা) (আম্ম) দূরে (বাইদুম্ম) যাহা (মা) তোমাদেরকে ওয়াদা করা হইয়াছে (তুয়াদুন)।

সুতরাং যদি তাহারা মুখ ফিরায় সুতরাং বলুন, ‘তোমাদেরকে সাবধান করিয়া দিয়াছি সম্মানভাবে (সকলের) উপরে এবং আমি জানি না নিকটে কি বা দূরে যাহা তোমাদের ওয়াদা করা হইয়াছে।

এই সাবধানবানীটি যাহা মহানবি কর্তৃক দেওয়া হয়েছে উহা সম্মানভাবে সকলের উপর দেওয়া হয়েছে। তোমাদের নিকটে এবং দূরে কী আছে উহা মহানবি জানেন না বলাতে ওহাবিরা মহানবি যে এলম্মে গায়েব জানতেন না সেই দলিলটি দাঁড় করিয়ে দেয়। ইহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। ইহার দ্বারা সার্বিক সিদ্ধান্তটি টানা যায় না।

১১০. নিশ্চয়ই তিনি (ইন্নাহ) জানেন (ইয়ালান্নু) প্রকাশিত হয় (জাহরা) হইতে (মিন) কথা (কাউলি) এবং (ওয়া) তিনি জানেন (ইয়ালান্নু) যাহা (মা) তোমরা গোপন করো (তাকতুমুন)।

‘নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) জানেন (যাহা) প্রকাশিত হয় কথা হইতে এবং জানেন যাহা তোমরা গোপন করো।

১১১. এবং (ওয়া) না (ইন) আমি জানি (আদরি) সেইটা হয়তো (লাআল্লাহ) ফিংনা (পরীক্ষা) (ফিত্নাতুল) তোমাদের জন্য (লাকুম) এবং (ওয়া) জীবনকে উপভোগের (মাতাউন) দিকে (ইলা) কিছুকাল (হিন)।

‘এবং আমি জানি না সেইটা হয়তো ফিংনা (পরীক্ষা) তোমাদের জন্য এবং কিছুকাল জীবনকে উপভোগের পর্যন্ত।’

১১২. বলিলেন (কাল), ‘হে আমার রব (রাব্বি), তুমি মীমাংসা (ফয়সালা, নিশ্চিতি, রায়) করিয়া দাও (আহকুম) হকের সহিত (ন্যায্যের সহিত) (বিল্হাক্কি) এবং (ওয়া) আমাদের রব (রাব্বানা) রহমান (রাহমানু) সহায়স্থল (মুস্তাআনু) উপরে (আলা) যাহা (মা) তোমরা বলিতেছ (তাসিফুন)।

বলুন, ‘হে আমার রব, হকের সহিত ফয়সালা করিয়া দাও এবং আমাদের রব রহমান, সহায়স্থল, তোমরা বলিতেছ যাহার উপায়।’

সূরা : হজ্জ
মাদানি র আয়াত : ৭৮, রুকু : ১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর নামের সহিত (বিসমিল্লাহে) যিনি একমাত্র দাতা (আর রাহমান) একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)।

১. হে (ইয়াআইউহান) মানুষেরা (লোকেরা) (নাসু) ভয় করো (তাকু) তোমাদের রবকে (রাব্বাকুম) নিশ্চয়ই (ইন্না) অতিশয় কম্পন (প্রকম্পন) (জাল্জালাতাস্) মৃত্যু নামক ঘটনার কেয়ামতটি (সাত্মাতি) জিনিস (শাইউন্) ভয়ঙ্কর (ভীতিজনক, ভীষণ) (আজিম)।

হে মানুষেরা, তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয়ই সাত্মাতের প্রকম্পন ভয়ঙ্কর জিনিস।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর সেটা হলো, আল্লাহ এই আয়াতে কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার না করে ‘সাত্মাতি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে আল্লাহ সকল মানুষকে এই ‘সাত্মাত’-এর বিষয়ে ভীতিজনক জিনিসটি জানিয়ে দিচ্ছেন এই বলে যে, তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যু-ঘটনা নামক কেয়ামত তথা ‘সাত্মাত’-এর মুখোমুখি হবেই।

২. যেদিন (ইয়াওম্মা) তাহা তোমরা দেখিবে (তারাপ্তনাতা) ভুলিয়া যাইবে (বিস্মৃত হইবে) (তাজ্জালু) প্রত্যেক (এক এক করিয়া সমুদয়) (কুল্লু) যে দুধ দেয় (স্তন্যদাত্রী) (মুরদিয়াতিন) তাহা হইতে যাহাকে (আম্মা) সে দুধ পান করাইয়াছে (আরদাআত) এবং (ওয়া) গর্ভপাত করিবে (তাদাউ) প্রত্যেক (কুল্লু) করিবে (জাতি) গর্ভবতী (হাম্মলিন) তাহার গর্ভে থাকা বস্তুকে (হাম্মলাহা) এবং (ওয়া) দেখিবে (তারান) মানুষদেরকে (নাসা) নেশাগ্রস্ত (মাতাল সদৃশ) (সুকারা) এবং (ওয়া) না (মা) তাহারা (হম্ম) মাতাল (বিসুকারা) কিছু (ওয়ালাকিন্না) আজাব (শাস্তি) (আজাবা) আল্লাহর (আল্লাহি) কঠিন (ভয়ঙ্কর, ভীষণ) (শাদিদ্)।

যেদিন তোমরা তাহা দেখিবে (সেই দিন) প্রত্যেকে ভুলিয়া যাইবে স্তন্যদানকারী তাহা হইলে (যাহাকে) সে দুধপান করাইয়াছে এবং গর্ভপাত করিবে প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভের বস্তুকে এবং মানুষদেরকে দেখিবে মাতালের মতো এবং তাহারা (যদিও) মাতাল নহে কিছু আল্লাহর আজাব (বড়ই) কঠিন।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে ‘সাত্মাত’ শব্দটি, যার দ্বারা মৃত্যু-ঘটনার কেয়ামতটির কথা বোঝানো হয়েছে। ‘সাত্মাত’ শব্দটির দ্বারা কখনওই আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য ধ্বংস করে ফেলার কথাটি বোঝায় না, বরং মৃত্যুপথযাত্রী যখন মৃত্যুবরণায় বিদায় নেবে-নেবে অবস্থায় থাকে তখন একটি মানুষের অবস্থানের যে কতদূর পরিবর্তন হয় তারই দৃশ্যটি এখানে সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুবরণার অনেক ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তোমরা প্রত্যেকেই এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখবে তথা মৃত্যু নামক ঘটনার ‘সাত্মাত’-টি তথা কেয়ামতটির মুখোমুখি হতেই হবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে অনেকেই বড় কেয়ামতের ঘটনাটি বর্ণনা করেন, কিন্তু ইহা মনের অজান্তে একটি ভুল। সবাইকে

এই কেয়ামতের কঠিন আজ্ঞাবের দৃশ্যটি দেখতে হবে বলার মাঝে সবাইকে একসঙ্গে মেজাজি কবর হতে উঠে দেখার কথাটি বলা হয়েছে। তা হলে পাঁচ হাজার বছর আগে যে মারা গেছে সে কি ওই মেজাজি কবরের গম্বির মাঝেই অবস্থান করবে এবং যে বড় কেয়ামতের ঘটনাটি ঘটান আধাঘণ্টা আগে মারা গেছে ॥ উভয়েই কি একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে? যদি পাঁচ হাজার বছর আগে মৃত এবং কেয়ামতের আধাঘণ্টা আগের মৃত ॥ উভয়কেই একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে হয় ॥ তা হলে ইহা কেমন শোনায়? পাঁচ হাজার বছর আগে মৃত মানুষটি যদি আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করেই বসে যে, ‘আমি পাঁচ হাজার বছর কবরে শুয়ে রইলাম আর ওই ব্যক্তিটি কেয়ামতের মাত্র আধাঘণ্টা আগে মারা যাবার পর উঠে দাঁড়িয়েছে ॥ তা হলে এতদিন আমি কেন কবরে শুয়ে রইলাম আর ওই লোকটি মৃত্যুর গোসল দেবার আগেই উঠে দাঁড়ালো?’ তা হলে কেউ যদি এ রকম প্রশ্ন অধম লিখককে করেই বসে তো অধম লিখকের এ রকম প্রশ্নের উত্তরটি জানা নাই। কিন্তু এই আয়াতটিতে যে মৃত্যু-নামক ঘটনার কেয়ামতটির বর্ণনা করা হয়েছে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। এরপরেও যদি কেহ সন্দেহ পোষণ করে তো অধম লিখকের বলার কিছুই রইল না। আরেকটি প্রশ্ন হয়তো আসতে পারে যে, একটি নফসের দেহ-ধারণ কি করতেই হবে? দেহ-ধারণটি কি একেকটি নফসের একেক রকম পরিচয় বহন করে? কাপড়ের পোশাকটি যেমন দেহের পোশাক, সে রকম নফস তথা জীবাত্মার পোশাকটি হলো দেহ। কাপড়ের পোশাকটি যেমন দেহ-পোশাক সেই রকম নফস তথা জীবাত্মার পোশাক বলতে কি এই দেহকেই বোঝানো হয়েছে? জীবাত্মার সঙ্গে দেহটিকে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে যে অনেকটা দুধের ভেতর লুকিয়ে থাকা

মাখনের মতো। দুধবিহনে যেমন মাখন আশা করা যায় না তেমনি দেহবিহনে জীবাত্মাটি কি অবস্থান করতে পারে? যদি পারে বলা হয় তা

হলে সেই পারাটাই একটি অদৃশ্যমান জগতের লীলাখেলা। অনেক রকম প্রশ্ন হতে পারে আবার অনেক রকম উত্তরও হতে পারে, কিন্তু আসল বিষয়টি বোঝাতে চাইলে অনেক কিছুই ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যেতে হয়। সত্যের কোনো পোশাক থাকে না। সত্য একদম উলঙ্গ। সত্যের গায়ে যে পোশাকগুলো লাগানো হয় সেই পোশাকগুলোর নাম হলো মেজাজি, রূপক, মেটাফোরিকাল ॥ ইত্যাদি। আমাদের আসল উদ্দেশ্যটি হলো উলঙ্গ সত্যটি খুঁজে বাহির করা। যদি দেহ নামক পোশাকের দ্বারাই নফস তথা জীবাত্মার পরিচয়টি চেনা যায়, ধরা যায় তা হলে পুনর্জন্মবাদটিকে কেমন করে অস্বীকার করি? জ্ঞানীদেরকে নিরপেক্ষ হয়ে তকদির নামক ধর্মীয় সাইনবোর্ডটি ফেলে এই বিষয়টিকে নিয়ে গবেষণা করতে অনুরোধ করছি। যদিও অনুরোধ করাটাও একটি তকদির এবং অনুরোধটি রক্ষা করা এবং গবেষণা করাটাও একটি তকদির। এই তকদির নামক জগদ্বল পাথর হতে আমরা কেউ একচুলও এদিক-সেদিক যেতে পারব না। অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই কোরান-হাদিস নিয়ে গবেষণার পর গবেষণা করে চলছি। কিন্তু আজ যদি আমি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করতাম এবং নিজেকে ধর্ম-বিষয়ের গবেষণায় ডুবিয়ে রাখতাম তাহলে বেদ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর উপর গবেষণায় ডুবে থাকতাম। তা হলে মুসলমানের ঘরে যে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেই জন্মগ্রহণ করাটা কি একটা জগদ্বল পাথরের মতো অনড় তকদির নাকি অফুরন্ত রহমত, নাকি ভয়ঙ্কর একটি অভিশাপ? তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে জন্মটাই একজনের আজন্ম তকদির অথবা আশীর্বাদ নতুবা

অভিশাপ। তা হলে তো চরম সত্যে অন্যধর্মের অনুসারীদেরকে যা-তা মন্তব্য করাটা অশোভনীয় বলেই মনে করি। কারণ আমি যদি গালি দেই তো অন্যধর্মের গবেষকও গালি আবিষ্কার করে ফেলবে। তখন সমাজ জীবনে একটি সাধারণ শাস্তি আর বজায় থাকবে না, বরং মারমার, কাটকাট, হিয়াইয়া ইত্যাদি আশ্ফালনের সঙ্গে জঙ্গি মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

৩. এবং (ওয়া) হইতে (মিন) মানুষদের (লোকদের) (নাসি) যে (মান) তর্ক (বিতর্ক, বাদানুবাদ, সংশয়, অনুমান) করে (ইউজাদিলু) মধ্যে (ফি) আল্লাহর (আল্লাহি) না জানিয়া (বিগাইরি) কোনো এলেক (জ্ঞান) (ইল্মিউ) এবং (ওয়া) অনুসরণ করে (ইয়াত্‌তাবিউ) প্রত্যেক (কুল্লা) শয়তানকে (শাইতোনাম্ম) গর্বিত (উদ্ধত, অবিনীত, ধ্বংস, স্পর্ধিত, দুর্দান্ত, গোয়ার) (মারিদ)।

এবং মানুষদের (মধ্য) হইতে যে তর্ক করে আল্লাহর (সহক্কে) মধ্যে কোনো জ্ঞান না জানিয়া এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক গর্বিত শয়তানকে।

এই আয়াতটি ছোট মনে হলেও ইহার গভীরতা খুবই ব্যাপক। অনেক মানুষই আছে যাদের আল্লাহ সহক্কে খুব একটা ভালো ধারণা নাই, অথচ না জেনে না শুনে এবং নিছক জ্ঞানের অভাবে তর্কবিতর্কের ঝড় তুলে দেয়। আল্লাহ বিষয়টি এতই ব্যাপক যে কয়েকটি কথার বাক্য গঠন করে বোঝানো মোটেই সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটিভাবে একটি ধারণা দেওয়া যায়। কোরান বলছে, যেকোনো তাকাও না কেন, আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না, অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ হতে নির্গত হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির রূপ ধারণ করে যাহা অবিরাম নির্গত হয়ে চলছে উহা আল্লাহর সীফাত তথা গুণাবলি, কিছু জ্ঞাত নয়। জ্ঞাত এবং সীফাতের অখণ্ডতার নামই হলো আল্লাহ। তবে সীফাত তথা গুণাবলিকে

আল্লাহ না বলে আল্লাহর সিকাত বলতে হবে। কারণ আল্লাহর অসংখ্য সিকাতগুলো জাত আল্লাহ হতে আগমন করেছে। আল্লাহ জাতরূপে মাত্র তিনটি স্থানে অবস্থান করেন : একটি সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের শেষ যেখানে সেই লা-মোকামে এবং অপর দুইটি স্থান হলো, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি জীবের সঙ্গে আল্লাহ জাতরূপে অবস্থান করেন ॥ সেই জীব দুটোর নাম হলো একটি জিন ও অপরটি ইনসান তথা মানুষ। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ মানুষের সঙ্গে বা সাথে আল্লাহ ‘আমরা’-রূপটি ধারণ করে জীবন-রণের তথা শাহারগের নিকটেই অবস্থান করেন (নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন্ হাবলিল্ ওয়ারিদ তথা ‘আমরা (আল্লাহ) তোমাদের জীবন-রণের নিকটেই আছি’)। যিনি বা যারা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বিরাট ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছার রহমতে যাঁর নফসের মধ্যে আল্লাহর উদ্ভাসিত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে, কেবলমাত্র তিনি বা তাঁরা আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী ॥ অন্যথায় ‘বিগাইরি ইলিম’ তথা আল্লাহ বিষয়টি পুথির বিদ্যা দিয়ে জানাটা মোটেই সম্ভবপর নয়। পুথির বিদ্যার বড় বড় সার্টিফিকেট অর্জন করা যায়, কিন্তু আল্লাহ সন্থকে গুঢ় রহস্যের জ্ঞানটি অর্জন করা যায় না। আল্লাহর গুঢ় রহস্যময় জ্ঞানটি যাদের জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তারা মাত্র একটি বছর ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদাটি নির্জনে একাকী বিরাট ধৈর্যধারণ করে অর্জন করার চেষ্টা করলে আল্লাহর রহমতে কিছু না কিছু বুঝতে পারবেই। এই বোঝাতেও আল্লাহ-বিষয়ে তর্ক করা মোটেই ঠিক নয়। কমপক্ষে ১০/১২ বছর মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি যাঁরা করতে পেরেছেন, তাঁরাই আল্লাহ সন্থকে কিছু বলার অধিকার রাখেন বলে মনে করি। কিন্তু এই রকম সাধকেরা আল্লাহ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যায় না। সোজা কথায় পুথির বিদ্যা

দিয়ে ইহা মোটেই সম্ভবপর নয়, বরং হেরাণ্ডহার মতো নির্জন স্থানে একাকী মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে কিছুটা হলেও বোঝা যায়। বাহ্যিক জগতের দৃশ্যাবলি এবং আত্মিক জগতের রহস্যময় দৃশ্যাবলি মোটেই এক বিষয় নয়। আত্মিক জগতের রহস্যাবলির সামান্য কিছু প্রত্যেকেই জানতে পারবে তবে একটি বিষয়ের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়, সেই বিষয়টি হলো একটি ঘটনা। সেই ঘটনাটির নাম হলো মৃত্যু-ঘটনা। মৃত্যু মোটেই ধ্বংস নয়, বরং পরিবর্তন। তাই যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় বিরাট ধৈর্যধারণ করে উঠে-পড়ে লেগে আছে তারাই মৃত্যু-নামক ঘটনার আগেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে জানার আগ্রহ যাদের আছে তাদেরকে সেই সাধকদের অনুসরণ ব্যতীত জানা সম্ভবপর নয়। (মৃত্যু কাবলা আনতা মৃত) তথা মরার আগে মরে যাও।

শয়তান-বিষয়টিরও একটা মোটামুটি ধারণা না থাকলে বিভ্রান্তির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়তে হয়। প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে, শয়তান কোথায় কোথায় অবস্থান করে এবং অবস্থান করার অনুমতি আল্লাহ কর্তৃক পেয়েছে। শয়তান আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি স্থানে অবস্থান করার অনুমতি পেয়েছে তথা থাকতে পারবে। এই দুইটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত শয়তানের পক্ষে এক পা-ও বাড়াবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। কেবলমাত্র এই দুইটি স্থানই শয়তানের যত আকাম-কুকামের নির্দিষ্ট স্থান। সেই দুইটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম হলো : জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর বিহনে শয়তানকে থাকার আর কোনো অনুমতি দেওয়া হয় নি। বড়ই দুঃখ করে বলতে হয় যে, শয়তানের এই দুইটি স্থানে অবস্থান করা ছাড়া আর যে কোথাও থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নি সেটাও বড় বড় ইসলাম-গবেষকদের অনেকেই জানেন না। সুতরাং বিভ্রান্তির খিচুড়ি ছাড়া

এদের কাছে আর কীইবা আশা করা যায়? অথচ এই শ্রদ্ধেয় গবেষকদের কাছে আল্লাহর বিষয়টি এবং শয়তানের বিষয়টি জানতে চাইলে একটি মুচকি হাসি দিয়ে সব কিছু জানার ভান করে মানুষগুলোকে দিশেহারা করে তোলে। একটি মানুষের অন্তর ছাড়া শরীরের আর কোনো অঙ্গে শয়তানকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নি। তাই বলা হয়ে থাকে, একটি মানুষের হাত-পা-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সবই মুসলমান, কেবলমাত্র অন্তরটি ছাড়া। শয়তানের যত প্রকার আকাম-কুকামের কারখানাটি হলো একমাত্র অন্তরটি। এই শয়তানটিকে কেমন করে তাড়িয়ে দিতে হবে, কেমন করে এই শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে হবে ॥ ইত্যাদি বহু উপদেশের মাঝে মাত্র একটি কথাই হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় গ্রহণ করা। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে উদ্ধৃত অহংকারী শয়তানটিকে অনুসরণ না করতে। অনেক গবেষক শয়তানের অনুবাদ করতে গিয়ে সমগ্র জিনজাতিকেই টেনে এনে মনের অজান্তে অপমান করে ছাড়ে। ইহা মোটেও ঠিক নয়। কারণ মানুষের মাঝে যেমন ভালোমন্দ আছে, তেমনি জিনজাতির মাঝেও ভালোমন্দের অবস্থানটি আমরা জানতে পারি। নিঃসন্দেহে শয়তানের আগমন জিনজাতি হতে, কিন্তু তাই বলে পাইকারিভাবে সমগ্র জিনজাতিকে গালি দেওয়া মোটেও ঠিক নয়। অন্তরের মাঝে শয়তানটিকে রেখেই যখন মানুষ মুক্তচিন্তার নাম ধারণ করে স্বাধীনতাটি ভোগ করতে চায় তখনই মনের অজান্তে শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায়। অথচ মানুষ বুঝতেই পারে না যে সে শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেছে। তাই বলা হয়ে থাকে, মানুষের ভেতর একটি গোপন গোশ্বতের টুকরা আছে, সেই গোশ্বতের টুকরাটির নাম হলো অন্তর। সেই অন্তরটি যখন কলুষিত হয়ে যায় তখন সমস্ত মনপ্রাণই কলুষিত হয়ে পড়ে, আবার পরক্ষণে সেই অন্তরটি যখন পবিত্র হয়ে যায় তখন সমস্ত

দেহমনটি পবিত্র হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষ একেকটি নফস তথা ‘আম্মি’ এই ‘আম্মি’-টি পবিত্র, কিন্তু এই ‘আম্মি’-র সঙ্গে তথা এই নফসের সঙ্গে যখন শয়তানটি অবস্থান করে তখনই নফসটি কলুষিত হয়ে পড়ে। এই কলুষিত নফসের অভ্যন্তরেই শয়তান উদ্ধত অহংকারীর অদৃশ্য রূপটি ধারণ করে। তাই এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, উদ্ধত অহংকারী শয়তানের অনুসরণ করছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শয়তান মোটেও বাহিরে থাকে না, বরং প্রতিটি নফসের তথা প্রতিটি মানুষের অন্তরেই অবস্থান করে। নফস যোগ শয়তান সমান সমান ‘আম্মিত্ব’, নফস বিয়োগ শয়তান সমান সমান ‘আম্মি’। সুতরাং নফসটি তথা ‘আম্মি’-টি মোটেও অপবিত্র নয়, কলুষিত নয় এবং এই নফসই যখন মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে ‘এতমেনান’ অর্জন করে ‘মোৎমায়েল্লা’ হয়ে যায় তখনই জালালের সুসংবাদটি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়।

৪. লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে (নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বিধান, নির্দেশ, প্রথা) (কুতিবা) তাহার সম্পর্কে (সংযোগ, সংস্ক, সংস্রব) (আলাইহি) যে তাহা (আননাহ) যে কেউ (মান) তাহাকে বন্ধু (মিত্র, স্বজন, সখা, সুহৃদ, প্রিয়জন) বানাইবে (তাওয়াল্লাহ) সুতরাং সে নিশ্চয়ই (ফাআননাহ) তাহাকে বিদ্রান্ত (সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত, সঠিক পথ হইতে ভুল পথে নেওয়া) করিবে (ইউদিল্লুহ) এবং (ওয়া) তাহাকে পরিচালিত করিবে (ইয়াহদিহি) দিকে (ইলা) আজাব (শাস্তি) (আজাবিস) জ্বলন্ত আগুন (প্রজ্বলিত অগ্নি) (সাইর)।

তাহার (শয়তান) সম্পর্কে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহাকে বন্ধু বানাইবে সে তখন নিশ্চয়ই তাহাকে বিদ্রান্ত করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে আজাবের দিকে (সেই আজাবটি) জ্বলন্ত আগুন।

এখানে শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে অথবা নিয়ন্ত্রণ করে দেওয়া হয়েছে – বলার অর্থটি হলো, শয়তানের আজন্ম তকদিরটি হলো মানুষকে সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া। এক কথায় সব বিষয়ের খারাপ দিকটির দিকে মানুষকে ধাবিত করা। মন্দ বিষয়ের প্রতিমূর্তিই হলো শয়তান, ইহাই শয়তানের তকদির। অবশ্য শয়তানের ইহা আজন্ম তকদির না বলে অর্জিত তকদির বললেই ভালো মানায় এবং কোরান-সম্মত হয়। কারণ শয়তান আগে হজরত আজাজিল আলাইহেস সালাতু সালাম নামটি ধারণ করে ফেরেশতাদের ইমাম ছিলেন। কিন্তু আদমকে সেজদার বিষয়টি অমান্য করার দরুনই আজাজিল ইবলিসে পরিণত হয়। সুতরাং আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে বলেই ইহা শয়তানের অর্জিত তকদির। সুতরাং মানুষকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করার অর্জিত তকদিরটি নিয়ে অবস্থান করছে শয়তান। তাই এই আয়াতে মানুষদেরকে আল্লাহ সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে যে, খবরদার, শয়তানকে কখনওই বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিয়ো না। কারণ শয়তান বাহিরে থাকে না, বরং আপন নফসের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে খান্নাসরূপে অবস্থান করে। তাই আপন কলুষিত প্রবৃত্তিই হলো শয়তানের কারখানা। শয়তান মানুষকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। এখানে জ্বলন্ত আগুন বলতে মানুষের অন্তর জ্বলতে থাকে। অনেক সময় মানুষ এই শাস্তি, জ্বলন্ত আগুনের দাহটি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে ফেলে। এই আজাবের আগুন বাহ্যিক চোখে যদিও দেখা যায় না, কিন্তু যে বা যারা এই আগুনে জ্বলতে থাকে তারা বুঝতে পারে এর দহন কতটুকু ভয়ংকর। এই আজাবের আগুন ঘরবাড়ি জ্বালায় না, কাপড়-চোপড় জ্বালায় না এবং কোনো কিছুই জ্বালায় না, কেবলমাত্র মানুষের অন্তরটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। কী প্রচণ্ড, কী ভয়ংকর

এই জ্বলন্ত আগ্নেয় শাস্তিটি! চোখে দেখা যায় না, অথচ জ্বলতে হচ্ছে। ইহা কি সত্যি একটি ভয়ংকর বিষয় নয়? তাই কোরানুল করিম এই জ্বলন্ত আগ্নেয় শাস্তি হতে মুক্ত থাকার জন্য বার বার মানুষকে শয়তান সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছে। আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তোয়ানুর রাজিম তথা ‘পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই’ কথাটি হাজারবার পড়লেও শয়তান ছেড়ে দেয় না। তা হলে এই শয়তান হতে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থাপত্রটি আল্লাহর ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি কেমন করে করতে হবে সেই ফর্মুলাটির মাধ্যমে দিয়ে গেছেন। যারা আল্লাহর ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফদেরকে অমান্য করে আপন কলুষিত প্রবৃত্তির দ্বারা বানানো পথে চলে এবং চলার ব্যবস্থাপত্রটি দিয়ে যায় নিঃসন্দেহে এদেরকেই ওহাবি বলা হয়। এবং এই ওহাবিদের বইপত্র দিয়ে বাজার ছেয়ে গেছে।

৫. হে (ইয়া আইউহান) মানুষেরা (নাসু) যদি (ইন) তোমরা হও (কুনতুম) মধ্যে (ফি) সন্দেহের (সংশয়ের) (রাইবিম) হইতে (মিনাল) পুনরায় উত্থান (পুনরুত্থান, পুনরায় জাগরণ) (বাসি) সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই (ফাইন্না) তোমাদেরকে আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি করিয়াছি (খালাক্নাকুম) হইতে (মিন) মাটি (তুরাবিন) ইহার পর (সুম্মা) হইতে (মিন) বীর্ষ (শুক্র, রোতঃ, ধাতু) (নুৎফাতিন) ইহার পর (সুম্মা) হইতে (মিন) সংযুক্ত (ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড, এমন কিছু যা লাগিয়া থাকে) (আলাকাতিন) ইহার পর (সুম্মা) হইতে (মিন) মাংসপিণ্ড (মুদ্গাতিম) পরিপূর্ণ আকৃতির (পূর্ণাকৃতির) (মুখাল্লাকাতিউ) এবং (ওয়া) নহে (নয়) (গাইরি) পরিপূর্ণ আকৃতি (মুখাল্লাকাতিল) আমরা আসল সত্য স্পষ্ট করি (লিনুবাইয়িনা) তোমাদের জন্য (লাকুম) এবং (ওয়া) আমরা স্থায়ী করি (নুকিররু)

মধ্যে (ফি) জরায়ুগুলিতে (আরহামি) যেমন (মা) আমরা চাই (নাশাউ) দিকে (ইলা) সময় (আজালিম) নির্দিষ্ট (বিশেষভাবে প্রদর্শিত, নির্ণীত, স্থিরীকৃত) (মোসামমান) ইহার পর (সুম্মা) আমরা তোমাদেরকে বাহির করি (নুখরিজুকুম) শিশুরূপে (বাচ্চারূপে) (তিফলান) ইহার পর (সুম্মা) যেন তোমরা পৌঁছাইতে পার (লিতাবলুগ) যৌবনে (আশুদদা) তোমরা (কুম) এবং (ওয়া) তোমাদের মধ্য হইতে (মিনকুম) কাহাকেও (মান) মৃত্যু দেওয়া হয় (ইউতাওয়াফফা) এবং (ওয়া) তোমাদের মধ্য হইতে (মিনকুম) কাহাকেও (মাই) ফেরত (প্রত্যর্পণ) দেওয়া হয় (ইউরাদদু) দিকে (ইলা) দুর্দশাগ্রস্ত (আরজালি) বয়সে (উম্মরি) যেন না (লিকাইলা) সজ্ঞান থাকে (ইয়ালামা) পরেও (মিম্বাদি) সব কিছু জানিয়া লওয়া (ইলমিন) কিছুমাত্র (শাইয়ান) এবং (ওয়া) তুমি দেখিয়াছ (তারাল) জমিনকে (আরদা) শুকনা (হামিদাতান) সুতরাং যখন (ফাইজা) আমরা বর্ষণ করি (আনজালনা) উহার উপরে (আলাইহা) পানি (মাতাহ) তাহা সতেজ হয় (তাজ্জাত) এবং (ওয়া) ফুলিয়া উঠে (স্ফীত হয়) (রাবাত) এবং (ওয়া) উদ্গত (উখিত, বহির্গত) (আম্বাতাত) সর্বপ্রকার (সকল প্রকার) (মিনকুললি) উদ্ভিদ (তৃণলতা, যাহা মাটি ভেদ করিয়া উঠে) (জাওজিম) সুদৃশ্য (দেখিতে সুন্দর, শোভাময়, সুদর্শন) (বাহিজি)।

হে মানুষেরা, পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে (পতিত হও) সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ) মাটি হইতে আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি ইহার পর গুরু হইতে ইহার পর রক্তপিণ্ড হইতে, ইহার পর মাংসপিণ্ড হইতে পরিপূর্ণ আকৃতি (দিয়া) এবং পূর্ণ আকার নহে, আমরা (আল্লাহ) সত্য স্পষ্ট করি তোমাদের জন্য এবং জরায়ুগুলির মধ্যে আমরা (আল্লাহ) স্থায়ী

করি যেমন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা (আল্লাহ) চাই, ইহার পর আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে বাহির করি শিশু (রূপে) ইহার পর তোমরা যেন যৌবনে পৌছাইয়া যাও এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও আগেই মৃত্যু দেওয়া হয় এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও দুর্দশাগ্রস্ত বয়সের দিকে (লইয়া যাওয়া হয়) যেন সব কিছু জানিয়া লইবার পরেও কিছুমাত্র (আগের মতো) জ্ঞান থাকে না এবং তুমি দেখিতেছ শুষ্ক জমিনের উপর যখন আমরা পানি বর্ষণ করি (তখন) তাহা সতেজ হয় এবং (উহা) ফুলিয়া উঠে এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্গত করে (এবং) সুদৃশ্য (রচনা করে)।

এই আয়াতে আল্লাহ কোনো বিশেষ শ্রেণীকে বলছেন না, বরং সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে উপদেশের ভাষায় আল্লাহ বলছেন যে মারা যাবার পর আবার তোমাদেরকে ওঠানো হবে। এই ওঠানোটি বলতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? একইরূপে ওঠানো হবে, নাকি অন্যরূপে ওঠানো হবে? মানুষ কি কখনও একইরূপ সব সময় ধারণ করতে পারে, না পারে না? কারণ শিশুটি যখন বড় হয় তখন আর সেই বড় হবার মধ্যে শিশুরূপটি থাকে না তথা হারিয়ে যায়। প্রশ্ন আসে, ইহা কি মানবদেহের পরিবর্তন নাকি জীবাত্মার পরিবর্তন? অবশ্য দেহের বিভিন্ন অবস্থায় একটি মানুষ বিভিন্ন রকম পরিচয় বহন করে। কারণ দেহটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে থমকে যায় না। শিশু দেহটি বালকরূপ ধারণ করে। বালকরূপটি পূর্ণবয়স্ক যুবকের রূপ ধারণ করে। তারপর প্রৌঢ়, তারপর বৃদ্ধ, তারপর অনেক বৃদ্ধ এবং তারপরেও যদি বেঁচে থাকে তা হলে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। একটি দেহ প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে সে রকম কি জীবাত্মাটিরও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে না? মানবদেহটি কি একটি

জীবাত্মার পরিচয় বহন করার একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য, নাকি অবস্থান থেকে অবস্থানে এর পরিবর্তন? দেহের একেক রকম অবস্থানে জীবাত্মাটি কি একেক রকম বাস্তব অভিনয় করে চলছে? হিন্দুধর্মের অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশগুলি অর্জুনকে দিয়েছেন তার মধ্যে একটা উপদেশ হলো, ‘হে অর্জুন, মানুষ যেমন পুরনো পোশাক ফেলে দিয়ে নতুন পোশাক ধারণ করে সেই রকম আত্মাও পুরনো দেহ ফেলে দিয়ে নতুন দেহ ধারণ করে।’ তা হলে আমরা অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এই কথাটুকু জানতে পারলাম যে, দেহ পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করার একটি পোশাকমাত্র। দেহকে একটি নিছক পোশাকমাত্র বলে অর্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেই পোশাকটিকে আত্মার অংশ বলা হয় নি, বরং মানুষ যে রকম জীর্ণ পোশাক ফেলে দিয়ে নতুন পোশাক পরিধান করে সে রকম আত্মাও বার বার দেহ নামক পোশাকটি ব্যবহার করে। এখন প্রশ্ন হলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি অর্জুনকে বিরাট ভুল শিক্ষা দিয়ে গেলেন, নাকি কোরান-এর জীবন-মৃত্যুর রহস্যটির কথাই বলে গেলেন? কোরান-হাদিসের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের জ্ঞানটি কি ইসলাম ধর্মের গবেষকেরা সঠিকভাবে তুলতে পেরেছেন, নাকি পারেন নাই? কারণ এই জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নে ইসলাম-গবেষকদের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের বিপরীত ভাবধারাটি ফুটে ওঠে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দুরকম সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ফলটি কি আমরা আশা করতে পারি? কারণ আজ যদি আমি (অধম লিখক) হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করতাম এবং বেদ-গীতা-র গবেষণা চালিয়ে যেতাম তা হলে আমার অবস্থানটি কোথায় থাকত? তা হলে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে হিন্দুধর্মের উপর গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম উহা কি আমার জন্মের আগেই তকদির দিয়ে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে?

যেখানে একবারই জন্মগ্রহণ করতে হবে সেখানে আমার এই অবস্থানটির জন্য আমি কাকে দায়ী করব? এখানে অনুমানের গুলমারা বিদ্যা দিয়ে যেন তেন ব্যাখ্যা দিয়ে একটা কিছু বলা যেতে পারে, কিছু যেখানে একবারই আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং তাও হিন্দুর ঘরে, তা হলে পুনর্জন্মবাদটিকে মেনে নিলে এই কথা কি বলা যায় না যে জন্মই আমার আজন্ম মহাপাপ? এই আয়াতে কেবলমাত্র মুসলমানকে বলা হচ্ছে না, বরং সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করে উপদেশটি দেওয়া হয়েছে এবং প্রথমেই বলা হয়েছে যে পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? এই পুনরুত্থান বলতে কি সেই কবে-কখন-কতদিন আমাদেরকে কবরে অবস্থান করতে হবে? ইস্রাফিল নামক ফেরেশতার শিঙায় ফুৎকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব উঠে দাঁড়াব, নাকি মৃত্যু-ঘটনা-নামক ‘সাত্বাত’-নামক কেয়ামতটির কথা এখানে বলা হয়েছে? এ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে তৈরি করা হয়েছে প্রথমে মাটি হতে, তারপর বীর্ষ হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর মাংসপিণ্ড হতে এবং তারপর পরিপূর্ণ মানবাকৃতির শিশুরূপে, তারপর বয়সের হেরফেরে মৃত্যু-ঘটনার কথাটি, তারপর শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টিবর্ষণ করে সেই ভূমিকে সতেজ করা হয় এবং নানা প্রকার উদ্ভিদের আগমন ঘটে এবং পরে পরিপূর্ণ একটি সুদৃশ্য দৃশ্যের রচনা করে। এতগুলো কথার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে কী বোঝাতে চেয়েছেন? দুনিয়ার জীবনটা কি নিছক একটা মায়া, নাকি একটা ভীতি, নাকি একটি মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় মশগুল থেকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা? আমার মতো অতি ক্ষুদ্র ইসলাম-গবেষক বড় বড় ইসলাম-গবেষকদেরকে মাত্র একটি প্রশ্নই করতে চাই আর সেই প্রশ্নটি হলো: আজ যদি আপনারা হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করতেন এবং ধর্ম-গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন তা হলে

আপনাদের ধর্ম-গবেষণার অবস্থানটি কোথায় থাকত? বুকে হাত রেখে একদম নিরপেক্ষ হয়ে অধম লিখকের এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরটি দেবেন কি?

৬. ওইটা (জালিকা) এই জন্য যে (বিয়ান্না) আল্লাহ (আল্লাহ) তিনিই (হয়াল) সত্য (হাক্কু) এবং (ওয়া) এই জন্য যে তিনি (আন্নাহ) জীবিত করেন (ইউইয়িল) মৃতকে (মত্তা) এবং (ওয়া) তিনি (আন্নাহ) উপর (আলা) সব (সমস্ত) (কুল্লি) কিছু (শাইয়িন) ক্ষমতাবান (কাদির)।

ওইটা এই জন্য যে, আল্লাহ (হইলেন) তিনিই একমাত্র সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

এই আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গেলে আল্লাহর অনেক গোপন কথা যে লুকিয়ে আছে এই আয়াতের মধ্যে তা তুলে ধরা যায়। প্রথমেই ‘জালিকা’ তথা ‘ওইটা’ দিয়ে আয়াতটি শুরু করা হয়েছে। এখানে ‘এইটা’ তথা ‘হাজাল’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। বাক্যটির প্রথমেই ‘এইটা’ না বলে ‘ওইটা’ বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ‘তিনিই একমাত্র সত্য।’ এখানে ‘একমাত্র সত্য’ বলতে কী বোঝায়? আর কোনো সামান্য সত্য অথবা অতিক্রুদ্ধ সত্য সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও অবস্থান করে না এবং অবস্থান করার প্রশ্নই আসে না। কারণ তিনিই একমাত্র সত্য তথা সৃষ্টিজগতে যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে উহাই আল্লাহর সঙ্গে সিনাক্তরূপে তথা গুণাবলি এবং বহু গুণাবলিরূপে অবস্থান করছে। সুতরাং আর কোনো সামান্য সত্য থাকলে তো কিছু বলা যেত। এই আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানাহ-কে ‘আল্ হাক্ক’ তথা একমাত্র সত্য বলা হয়েছে তথা আর কোনো সত্যের অস্তিত্ব নাই। যদি সত্যের অস্তিত্ব সামান্য হলেও থাকত তা হলে তো সেই সত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যেত। আসলে কোনো সত্যই নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, সুতরাং অন্য কোনো সত্য আছে

বলে ধারণা করাটাও মনের ভুল এবং বিরাট আত্মবিরোধী কথা এ জন্যই যে, তিনি মৃতকে জীবন দান করেন। অন্য কেহ অথবা কোনো আল্লাহ হতে আলাদা বিচ্ছিন্ন শক্তি যদি থাকত তা হলে ‘তিনিই মৃতকে জীবিত করেন’ কথাটিতে বিস্ময় প্রকাশ করা হতো। এই জন্যই এই বিষয়টিতে বিস্ময় প্রকাশের কোনো অবকাশ থাকে না, যেহেতু আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্য তথা আর কোনো সামান্য সত্যও আল্লাহ হতে আলাদা হয়ে অবস্থান করে না। সুতরাং অন্য কোনো শক্তির অবস্থান করার ধারণাটি একটি বিরাট মিথ্যা ধারণা। অনেকটা দড়িকে সাপ মনে করার মতো একটি বিভ্রম। তাই আয়াতের শেষে আল্লাহ অতি সহজ ভাষায় বলে দিচ্ছেন এই বলে যে, সৃষ্টিজগতে যাহা কিছু অবস্থান করছে উহা আল্লাহর সিফাতরূপে তথা গুণাবলিরূপে বিরাজ করছে। তাই তিনি সর্ববিষয়ের উপর এবং সর্বস্থানের উপর তথা গুণাবলির উপর একমাত্র ক্ষমতাবান। তাই তিনি এবং তাঁর রূপটি হলো সর্বশক্তিমান তথা সর্ববিষয়ের উপর সর্বাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাবান তথা একমাত্র সর্বশক্তিমান।

৭. এবং (ওয়া) মুহূর্তটি (আননা) সাতাত (সাতাতা) নিশ্চয়ই ঘটবে (অবশ্যজ্ঞাবী, না ঘটয়া পারে না এমন) (আতিয়াতুল) নাই (লা) কোনো সন্দেহ (রাইবা) ইহার মধ্যে (ফিহা) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই আল্লাহ (আননাল্লাহা) উঠাইবেন (ইয়াব্বাসু) যাহারা (মান) মধ্যে (ফিল) কবরগুলিতে (কুবুরি)।

এবং সাতাতের মুহূর্তটি নিশ্চয়ই ঘটবে ইহার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ উঠাইবেন যাহারা কবরগুলিতে আছেন।

মৃত্যু নামক ঘটনার ‘সাতাত’-টিকেও ছোট কেয়ামত বলা হয় এবং এই ‘সাতাত’ নামক ছোট কেয়ামতটির মুখোমুখি সবাইকে একদিন না একদিন হতে

হয়। এখানে আল্লাহ কেয়ামত শব্দটি না বলে ‘সাত্বাত’ শব্দটি বলেছেন। যেহেতু এখানে জীবন-মৃত্যুর বিষয়টি বলা হয়েছে সেই হেতু কবর হতে ওঠাবার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে ধ্বংস করার কেয়ামতটির কথা যদি এখানে বলা হতো তা হলে কবর হতে ওঠাবার কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন না। এই ‘সাত্বাত’-এর বিষয়টিতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই ‘ইহার মধ্যে’ তথা ‘ফিহা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, যারা কবরগুলির মধ্যে আছেন বা থাকবেন বা ছিলেন তাদেরকে কবরসমূহ হতে ওঠানো হবে। এখানে কবর শব্দটির কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি। কবর দুই প্রকার : একটি মেজাজি কবর, অপরটি হাকিকি কবর। প্রতিটি মানুষের প্রতিটি জীবন্ত দেহটিকে একেকটি কবর বলা হয়। তাই বলা হয়েছে, ‘কবরের মধ্যে যারা আছেন’, তথা ‘ফিল্ কুবুরি।’ প্রতিটি জীবন্ত মানবদেহ একেকটি জীবাত্মার কবর। এই জীবাত্মার জীবন্ত কবরটিতে প্রতিনিয়ত অনেক রকম আজাবের শাস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে এইসব জীবন্ত কবর হতে মানুষদেরকে ওঠানো হবে।

৮. এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনান) মানুষদের (নাসি) কেহ কেহ (মান) যুক্তি দেখায় (তর্ক করে, ঝগড়া করে) (ইউজাদিলু) মধ্যে (ফিল) আল্লাহর (লাহি) ছাড়াই (বিগাইরি) জ্ঞান (ইলমিউ) এবং (ওয়া) না (লা) সঠিক পথ দেখানো (হদাউ) এবং (ওয়া) না (লা) কিতাব (কিতাবিম) নুরময় (উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, দ্যুতিময়, প্রভাময়) (মুনিরি)।

এবং মানুষদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আল্লাহর মধ্যে যুক্তি দেখায় জ্ঞান ছাড়াই এবং সঠিক পথের নির্দেশনা নাই এবং না (আছে) নুরময় কিতাব।

যদিও এই সূরার এই আয়াতটি আকারে ছোট, কিন্তু এর অর্থ বড়ই কঠিন এবং বড়ই সাম্প্রতিক ‘যাহা সাধারণের’ পক্ষে তো বোঝার কথা বাদই দিলাম, বরং বড় বড় ইসলাম-গবেষকেরাও হিমসিম খেয়ে যাবে। তাই অধিকাংশ গবেষকেরা অনুমানে ঢিল ছুঁড়ে সব কিছুর সমাধান টেনে বসেন এবং ইহা একান্ত স্বাভাবিক, তাই দোষারোপ করছি না। প্রথমেই বলা হয়েছে, মানুষদের মধ্য হতে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর বিষয়ে তথা আল্লাহ বলতে কী বোঝায় না জেনেই তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলে রাশিরাশি সংশয় আর দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়। এই জন্য ‘ইলাল্লাহি’ না বলে তথা আল্লাহ বিষয়ে না বলে ‘ফিল্লাহি’ তথা আল্লাহর মধ্যে বলা হয়েছে। আল্লাহর মধ্যে ডুব দিতে না পারলে তথা ফানা হতে না পারলে আল্লাহ সন্থকে যা কিছু বলবে উহা হবে এলেন-বহির্ভূত কথা তথা জ্ঞান নেই অথচ জ্ঞানীদের মতো চং করে কথা বলা। তাই বলা হয়েছে, ‘বিগাইরি ইলামিউ’ অর্থাৎ আল্লাহ বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নাই অথচ জ্ঞানীর ভান করে এটাসেটা বলে।

এই জ্ঞানটি তথা এই এলেনটি কি বাহ্যিক এলেন তথা জ্ঞান, নাকি রহস্যপূর্ণ জ্ঞান? আমরা বুখারি শরিফ-এর ৯৫ নম্বর হাদিসে জলিল কদরের সাহাবা হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে জানতে পারি যে, জ্ঞান দুই প্রকার : একটি জাহেরি এলেন, অপরটি বাতেনি এলেন। এই বাতেনি এলেন যিনি বা যারা অর্জন করতে পেরেছেন তারাই আল্লাহর বিষয়ে কিছু বলা, কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার উপযুক্ত। তাই অন্যত্র হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীরা বাহ্যিক জ্ঞানের অধিকারী এবং এরা ভেড়ার পালের মতো গুঁতাগুঁতি করে। এদের থেকে সাবধান থাকার উপদেশটি হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) দিয়ে গেছেন। এই ভিতরের এলেনটি তথা জ্ঞানটি বড় কষ্ট করে, বড় সাধনা করে জেনে নিতে হয়।

কারণ এই জ্ঞান গোপনীয়। তাই হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এই কথাটিও বলেছেন যে, এই জ্ঞানের কথাটি প্রকাশ করামাত্র আমাকে তোমরা যা-তা অপমান করতেও কসুর করবে না ॥ যেটাকে আরবি ভাষার বাগধারায় বলা হয় : কাটা যাইবে আমার এই গলা। সুতরাং এই রহস্যময় এলেক্স তথা জ্ঞান যার জ্ঞানা নাই তিনি কেমন করে সঠিক পথের নির্দেশনা দেবেন অথবা পাবেন? এলেক্স তথা জ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ‘হৃদাট’ তথা সঠিক পথটি জেনে নেওয়া। যদি সঠিক পথ এবং এলেক্স তথা জ্ঞানটি না থাকে তা হলে কিতাব বললে কাগজের উপর কতগুলো কালির অঙ্কর দিয়ে সাজানো লেখাগুলোকেই কিতাব মনে করবে। কাগজ-কালিতে ছাপানো অঙ্করগুলো নুরানি কিতাবের ছায়ামাত্র, কিন্তু নুরানি কিতাব নয়। বাঘ-সিংহের চার রঙে ছাপানো ছবি দুটো দেখলে মনে হবে হবহ বাঘ আর সিংহ, কিন্তু আসলেই কি কাগজে ছাপানো বাঘ আর সিংহ দুটি আসল সিংহ-বাঘ? আসল বাঘ আর সিংহ যদি কেউ স্বচক্ষে দেখতে চান তাহলে নির্দিষ্ট একটি স্থানে গিয়ে আপনাকে দেখে আসতে হবে। সেই নির্দিষ্ট স্থানের নামকে বলা হয় চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানা ছাড়া যে রকম জীবন্ত বাঘ ও সিংহ দেখা যায় না, সেই রকম আল্লাহর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার পর এই নুরানি কিতাবের পরিচয় মেলে। যারা নুরানি কিতাবের পরিচয় পেয়েছেন তাঁরাই আল্লাহর আবদাল, বেলায়েতপ্রাপ্ত ওলি এবং আল্লাহর নির্বাচিত নবি এবং রসূল। ঐরা কাগজে ছাপানো কিতাব পড়িয়ে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেন না, বরং বাস্তব শিক্ষার মাধ্যমে, তথা মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করার পরই সঠিক পথের পরিচয় এবং নুরানি কিতাবের পরিচয়টি পাওয়া যায়। অন্যথায় কতগুলো কথা শেখা ছাড়া এবং তর্ক-বিতর্কের ঝুঁতাঁতিতে

জড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এখানে আর একটু লক্ষ্য করে দেখুন, বলা হয়েছে ‘কিতাবিম্ব মুনিরি’ তথা নুরানি কিতাব, কিছু বলা হয় নি নুরানি কোরান। নুরানি কোরান এবং নুরানি কিতাবের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য রয়ে গেছে এবং কোরান ও কিতাব-এর মাঝে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়ে গেছেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী তাঁর রচিত কোরান-এর তফসিরটিতে, যা তিনি কোরান দর্শন নাম দিয়ে তিন খণ্ডে রচনা করে গেছেন।

৯. বাঁকা করে (সানিয়া) তাহার গর্দান (ঘাড়) (ইত্‌ফিহি) বিদ্রান্ত করিবার জন্য (লিউদিল্লা) হইতে (আন) পথ (রাস্তা) (সাবিলি) আল্লাহর (লিল্লাহি) তাহার জন্য (লাহ) মধ্যে (ফি) দুনিয়ার (দুনইয়া) অপমান (লাজনা, ভৎসনা, নিন্দা, উৎপীড়ন) (খিজ্‌ইট্ট) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে স্বাদগ্রহণ করাইব (নুজিকুহ) দিনে (ইয়াওমাল) কেয়ামতে (কিয়ামতি) আজাব (শাস্তি, যন্ত্রণা) (আজাবাল) আগুনে পোড়ানোর (দহনের) (হারিকি)।

আল্লাহর পথ হইতে বিদ্রান্ত করিবার জন্য তাহার গর্দান বাঁকা করে তাহার জন্য দুনিয়ার মধ্যে (আছে) অপমান এবং তাহাকে আমরা (আল্লাহ) স্বাদ গ্রহণ করাইব কেয়ামতের দিনে আগুনে পোড়ানোর শাস্তির)।

যদিও ইহা একটি ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা নামক কেয়ামত যাকে ‘সাত্মাত’ বলা হয়, কিছু এখানে ‘সাত্মাত’ শব্দটি ব্যবহার না করে কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও ইহা একটি মৃত্যু-ঘটনা নামক শাস্তি এবং সেই শাস্তিটি হবে আগুনে পোড়ানো। এই আগুন অধিকাংশ সময়ে অদৃশ্যমান তথা চোখে দেখা যায় না, কারণ এই দহনের জ্বালা-যন্ত্রণা, এই দহনের আগুনে পোড়ানো সম্পূর্ণরূপে

ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কখনও কখনও সমাজবদ্ধ মানুষগুলোর উপরও এই দহনের শাস্তিটি দেখা যায়। জাহান্নামের আগুন বাড়িঘর জ্বালায় না, কাপড়চোপড় জ্বালায় না, কেবলমাত্র একটি জিনিসই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় ॥ আর সেটা হলো অস্ত্র। জাহান্নামের আগুন কেবলমাত্র মানুষের অস্ত্রটিকে জ্বালায় এবং অন্য কোনো কিছু জ্বালায় না। এই একই রকম কথাটি জিনজাতির উপরও সমভাবে প্রযোজ্য, যদিও জিনজাতির কথাটি উল্লেখ করা হলো না।

১০. ওইটা (জালিকা) এই কারণে যাহা (বিম্বা) আগে (পূর্বে) পাঠাইয়াছে (কাদ্দামাত্) তোমার হাতে (ইয়াদাকা) এবং (ওয়া) আল্লাহ যে (আন্বাল্লাহা) নহেন (লাইসা) জুলুমকারী (বিজাল্লামিল) বান্ধাদের উপর (লিল্আবিদ)।

ওইটা এই কারণে যাহা তোমার হাতে আগে পাঠাইয়াছে এবং আল্লাহ যে বান্ধাদের জুলুমকারী নহেন।

১১. এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনান্) মানুষদের (নাসি) যে অথবা কেউ (মান্) এবাদত করে (ইয়াবুদু) আল্লাহর (আল্লাহ) উপর (আলা) এক কিনারায় (একপ্রান্তে, একধারে) (হারফিন্) সুতরাং যদি (ফাইন্) পৌঁছায় তাহার (আসাবাহ্) কোনো কল্যাণ (হিত, মঙ্গল, কুশল, সুখসমৃদ্ধি) (খাইরু) সে নিশ্চিত থাকে (নিত্মাআন্বা) ইহার মধ্যে (বিহি) এবং (ওয়া) যদি (ইন্) তাহার (উপরে) পৌঁছায় (আসাবাত্হ) কোনো ফিৎনা (বিপর্যয়) (ফিত্নাতু) ফিরিয়া যায় (নিংকালাবা) উপর (আলা) তাহার চেহারা (ওয়াজ্হিহি) সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (খাসিরা) দুনিয়াতে (দুন্ইয়া) এবং (ওয়া) আখেরাতে (আখিরাতা) ওইটা

(জালিকা) সেইটা (হয়াল) ক্রটি (খুসরানু) সুস্পষ্ট (কিছু গোপন নাই এমন, প্রকাশিত, খোলাখুলি) (মুবিন)।

এবং মানুষদের মধ্য হইতে কেহ আল্লাহর এবাদত করে একপ্রান্তের উপর সুতরাং যদি তাঁহার (নিকট) পৌঁছায় কোনো কল্যাণ (তখন) ইহার সহিত সে নিশ্চিত থাকে এবং যদি তাহার (নিকট) পৌঁছায় কোনো ফিৎনা তাহার চেহারার উপর ফিরিয়া যায়, দুনিয়াতে এবং আখেরাতে সে ক্রতিগ্নস্ত হয় ওইটা সুস্পষ্ট সেই ক্রতি।

এই আয়াতটিতে একটি সার্বজনীন লাভ এবং ক্রতির স্পষ্ট চেহারাটি তুলে ধরা হয়েছে। একমাত্র মোমিন ছাড়া (অনেকেই ভুলবশত ‘প্রকৃত মোমিন’ লেখেন, আসলে মোমিনই হলেন প্রকৃত, সুতরাং প্রকৃত শব্দটি অতিরিক্ত) আসলে মোমিন ছাড়া মানবজাতির সবারই উপর এই লাভ-ক্রতির খুশি এবং বেজার হবার দৃশ্যটি আমাদের জীবনপথে চলতে গিয়ে অহরহ দেখতে পাই। এই লাভ এবং ক্রতির অস্থিরতাটি যারা ডিঙিয়ে গেছেন তাঁরাই মোমিন এবং একমাত্র মোমিন ছাড়া সবাই কমবেশি ক্রতিগ্নস্ত অবস্থায় অবস্থান করছে। হয়তো এই প্রিয় সত্যকথাটি কেউ মানবে, আবার কেউ মানবেও না। পাইলে খুশি আর না পাইলে বেজার ॥ ইহা তো একটি অতি প্রচলিত সত্যের প্রতিচ্ছবি। এই দুর্বলতায় একমাত্র মোমিন ছাড়া সবাই কমবেশি ভোগে। সুতরাং মানবচরিত্রের দুর্বলতম স্থানটির একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে। তাই কোরান-এর সূরা আনফাল-এর ১৯ নম্বর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ মোমিনদের সাথেই আছেন বা থাকেন (ওয়া আন্বাল্লাহা মাআল মোমেনিনা তথা এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমিনদের সাথেই আছেন)।

১২. তাহারা ডাকে (ইয়াদউ) হইতে (মিন) পরিবর্তে (দুনি) আল্লাহর (আল্লাহি) যাহা (মা) না (লা) তাহাকে ক্রতি করিতে পারে (ইয়াদুররুহ) এবং (ওয়া) যাহা (মা) না (লা) তাহার উপকার করিতে পারে (ইয়ান্ফাউহ) ওইটা (জালিকা) সেই (হয়া) সঠিক পথ ছাড়িয়া বিপথে চলা (পথদ্রষ্টতা) (দালালুল) চরম (কঠিনতম অবস্থা, চূড়ান্ত) (বাইদ)।

আল্লাহর পরিবর্তে তাহারা ডাকে (মূর্তিগুলিকে) যাহা তাহাদের ক্রতি করিতে পারে না এবং তাহাদের উপকারও করিতে পারে না ওইটা সেই চরম সঠিক পথদ্রষ্টতা।

মূর্তিগুলি, যাহা মাটি-পাথর-ইট-বালু-সুরকি ইত্যাদি পদার্থ দিয়া বানানো হয়, উহাতে না আছে নফস তথা প্রাণ, আর রুহ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, তাই প্রাণহীনকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অধিকারীরা কী করে উপাসনা করবে? এই উপাসনা যে চরম সঠিক পথদ্রষ্টতা ইহা বুঝেও বুঝতে পারে না। কারণ এই প্রাণহীন মূর্তিগুলো না পারে তাদের উপকার করতে আর না পারে কোনো অপকার করতে। মানুষের মনের যে কত বিচিত্র চাওয়া-পাওয়া থাকে এবং এই চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নে আল্লাহকে ছেড়ে প্রাণহীন মূর্তিগুলোকে কেন্নন করে যে তারা তাদের মাবুদ বলে মেনে নেয় ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ বাস্তবে এই রকম প্রার্থনার অনুষ্ঠানগুলো আমরা দেখতে পাই। ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা এই মূর্তিগুলোর সঙ্গে আল্লাহর ওলি-আল্লাহদেরকে যোগ করে মানুষদেরকে আরেক নতুন ফেৎনার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। যেখানে নবি সোলায়মানের ক্রমতায় রহমতের বাতাস কোথায় প্রবাহিত করা হবে তার নিয়ন্ত্রণভারটি ছিল নবি সোলায়মানের হাতেই, এতবড় একটি জুলন্ত সত্য যাহা সোলায়মান নবির কাছে পাই সেখানে ওহাবিরা কেন্নন করে মূর্তিগুলোর সঙ্গে আল্লাহর ওলিদের জড়িয়ে এক করে ফেলে জনসাধারণকে

সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত করে! আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতার প্রশ্নে আবদিয়াতের প্রতিচ্ছবি হলেন খিজির আবদুহ। এই খিজির আবদুহ কেমন করে মুসা নবির মতো জাঁদরেল নবিকে আগেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না বলে তিনবার তিনটি গায়েবি দৃশ্যের অবতারণা করে মুসা নবিকে বিদায় করে দিলেন! অথচ মুসা নবির নামটি কোরান-এ সবচেয়ে বেশিবার বলা হয়েছে। সম্ভবত একশত পঁয়ত্রিশবার। তাই আমরা দেখতে পাই, ওহাবি ফেরকার অনুসারী গবেষকেরা সূরা কাহাফকে ভীষণ ভয় পায় এবং যত গাঁজাখুরি কথার গল্পো দিয়ে এইটা-সেইটা বলে থাকে। ওহাবিরা তো খিজিরকে একদম সহ্য করতে পারে না। তাই মাওলা আলির একটি মহামূল্যবান উপদেশ মনে রাখার মতো। তিনি খারেজিদের সঙ্গে নাহওয়ানের যুদ্ধটি হবার আগে যুদ্ধ না করার একটি চুক্তি করার জন্য কিছু সাহাবাকে পাঠাবার সময় এই উপদেশটি দিয়েছিলেন যে, খবরদার, কোরান-এর আয়াত সামনে রেখে চুক্তি করতে গেলেই খারেজিরা কোরান-এর আয়াতের অন্যরকম অর্থ করবে। আজ ওহাবিরা কোরান-এর সুন্দর সুন্দর বিকৃত অর্থ দিয়ে মানুষের দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে আসল বিষয়টিকে ঢেকে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৩. সে ডাকে (ইয়াদ্‌উ) এমন কিছুকে (লামান) যাহার ক্বতি (দারুহ) নিকটতর (আক্‌রাবু) হইতে (মিন) তাহার উপকারিতা (নাফ্‌ইহি) কত নিকৃষ্ট (জঘন্য, নীচ) (লাবিসাল) মাওলা (মাওলা) এবং (ওয়া) কত নিকৃষ্ট (লাবিসাল) সাথী (সঙ্গী, সহচর) (আশির)।

সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্বতি উপকারিতা হইতে অধিকতর কত নিকৃষ্ট অভিভাবক বা মাওলা এবং কত নিকৃষ্ট সহচর।

১৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নালাহা) দাখিল করিবেন (ইউদখিলুল) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আম্মানু) এবং (ওয়া) কাজ করিয়াছে (আম্মেলুস) সালিহাত (সালিহাতি) জ্ঞান্নাতে (জান্নাতিন্) প্রবাহিত হয় (তাজ্জরি) হইতে (মিন) নিম্নদেশ (পাদদেশ, মূলদেশ, নীচ) (তাহতিহাল) ঝরনা (প্রস্রবন, ফোয়ারা, নির্ঝর, প্রবাহ)-গুলি (আনহারু) নিশ্চয়ই (ইন্নাহ) আল্লাহ (ল্লাহা) করেন (ইয়াফআলু) যাহা (মা) চাহেন (এরাদা করেন) (ইউরিদ)।

যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং আম্মলে সালেহা করিয়াছে (তাহাদেরকে) নিশ্চয়ই আল্লাহ দাখিল করিবেন জ্ঞান্নাতে যাহার পাদদেশ হইতে প্রবাহিত হয় ঝরনাগুলি নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যাহা চাহেন।

১৫. যে কেহ (ম্নাকানা) মনে করে (ধারণা করে) (ইয়াজুনু) যে কখনও না (আল্লাই) তাহাকে সাহায্য করিবেন (ইয়ানসুরাহল) আল্লাহ (লাহ) মধ্যে (ফি) দুনিয়া (দুনইয়া) এবং (ওয়াল) আখেরাতে (আখিরাতি) সুতরাং সে টানিয়া লম্বা করুক (ফালইয়ামদুদ) একটি রশি (দঁড়ি, রজ্জু)-কে (বিসাবাবিন) দিকে (ইলাস) আকাশ (সাম্মায়ি) ইহার পর (সুম্মাল) কাটিয়া দেউক (ইয়াক্তাও) সুতরাং দেখুক (ফালইয়ানজুর) কী (হাল) দূর করিতে পারিবে (ইউজ্জিবান্না) তাহার কৌশল (প্রচেষ্টা) (কাইদুহ) যাহা (মা) রাগান্বিত (ফুদ্ধ, ক্রোধযুক্ত) করে (ইয়াগিজু)।

যে মনে করে যে আল্লাহ কখনও তাহাকে সাহায্য করিবেন না দুনিয়ার মধ্যে এবং আখেরাতে সুতরাং সে টানিয়া লম্বা করুক একটি দড়িকে আকাশের দিকে ইহার পর কাটিয়া দিক সুতরাং দেখুক তাহার কৌশল দূর করিতে পারিবে কি যাহা রাগান্বিত করে?

১৬. এবং (ওয়া) এইরূপেই (কাজালিকা) তাহা আমরা নাজিল করিয়াছি (আনজালনাহ) আয়াত (আয়াতিম) খোলাখুলি (সুস্পষ্ট, প্রকাশিত, কিছু গোপন নাই এমন) (বাইনাতিউ) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (আননাল) আল্লাহ (লাহা) হেদায়েত দান করেন (ইয়াহদি) যাহাকে (মাই) চাহেন (ইউরিদ)।

এবং এইরূপেই আমরা তাহা নাজিল করিয়াছি খোলাখুলি আয়াত এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদায়েত দান করেন যাহাকে চান।

১৭. নিশ্চয়ই (ইন্নালা) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আম্মানু) এবং (ওয়াল) যাহারা (লাজিনা) ইহদি (হাদু) এবং (ওয়া) সাবেয়ি (সাবিয়িনা) এবং (ওয়া) খ্রিস্টান (নাসারা) এবং (ওয়া) অগ্নিপূজারক (মাজুসা) এবং (ওয়া) যাহারা (লাজিনা) শেরেক করিয়াছে (আশ্রাকু) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নালাহা) ফয়সালা করিয়া দিবেন (ইয়াফসিলু) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহম) দিনে (ইয়াওম্মা) কেয়ামতের (কিয়ামতি) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নালাহা) উপরে (আলা) সমস্ত (কুললি) কিছু (শাইয়িন) প্রত্যক্ষকারী (শাহিদ)।

নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহদি এবং সাবেয়ি এবং খ্রিস্টান এবং অগ্নিপূজারক এবং যাহারা শেরেক করিয়াছে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফয়সালা করিয়া দিবেন তাহাদের মাঝে কেয়ামতের দিনে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপরে প্রত্যক্ষকারী।

এই আয়াতটির সামান্য কিছু ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে যদি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা আমাকে এ রকম প্রশ্ন করে বসেন যে, যদি ইহদি ধর্মের অনুসারীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করাতেই ইহদি হয়েছি তা হলে কি বলতে পারি না যে, ইহাই আমার জন্মের আগে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া তকদির? অথবা আশীর্বাদ? অথবা অভিশাপ?

এই প্রশ্নটির উত্তর অধম লিখকের জানা নাই। যদি বলেই ফেলেন যে প্রতিটি শিশু মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে তাদের ধর্মে নিয়ে আসেন ॥ এই কথাটি এই বিষয়ে মোটেই ধোপে ঢেকে না এবং ঢেকার প্রশ্নই ওঠে না, তবে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারবেন। যারা সাবেরি ধর্মের অনুসারীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তারাও কি ওই একই রকম প্রশ্ন তুলতে পারে না? এবং যারা খ্রিস্টানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তারাও কি ওই একই কথা বলতে পারে না? এবং যারা আগুনের পূজা করে তারাও কি একই প্রশ্ন তুলতে পারে না? এবং যারা মুশরিকদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও কি একই রকম প্রশ্ন তুলতে পারে না? এই প্রশ্নটির সঠিক জবাব অধম লিখকের জানা নাই।

১৮. আপনি কি দেখেন নাই (আলামতারা) যে আল্লাহ (আন্বাল্লাহা) সেজদা করে (ইয়াসজুদু) তাহাকে (আল্লাহকে) (লাহ) যাহা কিছু (মান) মধ্যে (ফি) আকাশগুলিতে (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়া) যাহা কিছু (মান) মধ্যে (ফি) জমিনে (দেহতে, পৃথিবীতে) (আরদি) এবং (ওয়া) সূর্য (শামসু) এবং (ওয়া) চন্দ্র (কামারু) এবং (ওয়া) তারকাগুলি (নুজুমু) এবং (ওয়া) পর্বতগুলি (জিবালু) এবং (ওয়া) বৃক্ষলতা (শাজারু) এবং (ওয়া) জীবজন্তু (দাওয়াবু) এবং (ওয়া) অনেকে (কাসিরুন) হইতে (মিন) মানুষদের (নাসি) এবং (ওয়া) অনেকে (কাসিরুন) সত্য (হাক্কা) যাহার উপর (আলাইহিন) শাস্তি (আজাবু) এবং (ওয়া) যাহাকে (মাই) হেয় করেন (ইউহিনি) আল্লাহ (-ল্লাহ) সুতরাং নাই (ফাম্মা) তাহার জন্য (লাহ) কোনো (মিন) ইচ্ছতদাতা (সম্মানদাতা) (মুকরিমিন) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্বাল্লাহা) করেন (ইয়াফ্‌আলু) যাহা (ম্মা) তিনি চান (ইয়াশাআ)।

আপনি কি দেখেন নাই যে আল্লাহ সেজদা করে তাকে যাহা কিছু আকাশগুলির মধ্যে এবং যাহা কিছু জমিনের মধ্যে (আছে) এবং সূর্য এবং চন্দ্র এবং তারকাগুলি এবং পর্বতসমূহ এবং বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্য হইতে অনেকে, আবার অনেকের (প্রতি) অবধারিত হইয়াছে যাহার উপর শাস্তি এবং আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন সুতরাং নাই তাহার জন্য কোনো সম্মানদাতা। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যাহা তিনি চাহেন।

এখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে সেজদা দুই প্রকার : একটি মেরাজি সেজদা ॥ যাহা সবাই দেখতে পায় এবং অপরটি হাকিকি সেজদা ॥ যাহা চোখে ধরা পড়ে না এবং যেই সেজদা চোখে ধরা পড়ে না উহাই আসল সেজদা। মেরাজি তথা রূপক সেজদা দিবে কেমন করে আসল সেজদায় তথা যে সেজদা চোখে দেখা যায় না সেই সেজদায় আসা যায়? আসল সেজদায় না আসা পর্যন্ত মেরাজি সেজদাটি একটি বাহনমাত্র এবং এর বেশি কিছু নয়। মেরাজি সেজদাটি তথা যে সেজদাটি চোখে দেখা যায় উহা যে-কোনো সময় যে-কোনো পরিস্থিতিতে তুলে নেওয়া যায়, কিন্তু যে সেজদাটি হাকিকি তথা চোখে দেখা যায় না উহা কখনওই তুলে নেওয়া যায় না এবং তুলে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। যে সেজদাটি করাও যায় আবার উঠিয়েও নেওয়া যায় উহা কোনো সেজদাই নহে, বরং উহা হাকিকি সেজদার মধ্যে পৌছাবার একটি বাহনমাত্র। বাহন নামক মেরাজি সেজদাটিকে যে কেহ যে কোনো মুহূর্তে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু যেই মাত্র হাকিকি সেজদার মধ্যে ভুবে যায়, উহা হতে মুখ ফেরাবার আর প্রশ্নই ওঠে না। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-বৃক্ষ-লতা-পাহাড়-পর্বতগুলো কোরান -এ বর্ণিত সেজদায় রত আছে এবং এই রত থাকা সেজদাটি আমরা চোখে দেখতে পাই না এবং চোখে দেখার প্রশ্নই ওঠে না,

কারণ ইহাই হলো হাকিকি সেজদা তথা আসল সেজদা। এই আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, মানবজাতির একটি অতি ক্ষুদ্র অংশও সেজদায় আছেন এবং মানবজাতির এই ক্ষুদ্র অংশটিকেই বলা হয় মোমিন-ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফ ইত্যাদি। হাকিকি সেজদাটি বাদে যারা মেরাজি সেজদা করে তারা সেই মেরাজি সেজদাটিকে যে কোনো সময় তুলে নিতে পারে তথা অস্বীকার করে ফেলতে পারে। আবার পরক্ৰমে আরেকটি সেজদা আছে যাকে সেজদা না বলাই ভালো কারণ উহা দেখতে অনেকটা মেরাজি সেজদার মতো, কিন্তু হাকিকতে উহা কোনো সেজদাই নয়, কারণ এই রকম চোখে-দেখা সেজদাটির না আছে কোনো মেরাজি রূপ আর না আছে কোনো হাকিকি রূপ। কারণ আপন পীর ও মুর্শিদকে মুরিদানের যে সেজদাটি করতে দেখি এবং করি উহা কোনো সেজদার আওতাতেই আসে না। সুতরাং দেখতে অনেকটা মেরাজি সেজদার মতো, কিন্তু আসলে উহা কোনো সেজদাই নয়। মেরাজি সেজদারও একটি সুনির্দিষ্ট আইন আছে, যেমন পাক-সাক, ওজু-গোসল, পশ্চিম দিকে দাঁড়ানো এবং নামাজের নিয়ত বাঁধা তারপর সূরা ফাতেহা পড়া তারপর কোরান-এর সামান্য কিছু অংশ মনে মনে অথবা জোরে পাঠ করা তারপর রুকুতে যাওয়া তারপর সেজদায় গিয়ে সোবহানু রাব্বুল আলা উল আজিম তিনবার পাঠ করার পর যে সেজদাটি দেওয়া হয় উহাকেই বলে মেরাজি সেজদা। কিন্তু আপন পীর ও মুর্শিদকে যে সেজদাটি দেওয়া হয় উহা দেখতে সেজদার মতো কিন্তু আসলে ইহা কোনো সেজদাই নয়, কারণ এই রকম সেজদার মধ্যে না আছে পাক-পবিত্রতা, ওজু-গোসলের বালাই, না আছে পশ্চিম দিকে দাঁড়ানোর শর্ত আর না আছে সূরা ফাতেহা ও কোরান-এর একটি অংশ পাঠ করা। সুতরাং আপন পীর ও মুর্শিদকে যে সেজদাটি করা হয় উহা মোটেই মেরাজি

সেজদা নয়, বরং সন্মানের সেজদা তথা সেজদায়ে তাজিমি। আপন পীর ও মুর্শিদকে যারা এই জাতীয় সেজদাটি করেন তাদের বিরুদ্ধেও যা-তা মন্তব্য অনেকেই করে থাকে, কারণ তারা সেজদার চংটি দেখতে পায়। তারা বুঝতে চায় না যে ইহা একটি নিছক সন্মানজনক সেজদা এবং এই সন্মানজনক সেজদার মধ্যে মেজাজি সেজদার শর্তগুলো নাই। সূরা ইউসুফের ১০০ নম্বর আয়াতটিতে আমরা দেখতে পাই যে পুত্র ইউসুফ নবি (আ.)-কে পিতা ইয়াকুব নবি (আ.) এবং ইউসুফ নবির মাতা এবং ইউসুফ নবির বড় এগার ভাই সেজদা করছেন। অধম লিখকের মনে হয়, ইহা একটি নিছক তাজিমি সেজদা। এই রকম সেজদাটিকেও নাসেক-মনসুখের আওতায় আনা হয় নাই। মোল্লা জিউন এবং মাওলানা জালালউদ্দিন সম্মুতির মতো জাঁদরেল আলেমও নাসেক-মনসুখের প্রশ্নে এই জাতীয় সেজদার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। একটিমাত্র হাদিসে দেখতে পাই যে, যদি সেজদা করার হুকুমটি দেওয়া হতো তা হলে স্বামীকে সেজদা করার জন্য স্বীকে বলা হতো। এখানে ‘যদি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ কোনো কিছু সোজাসুজি বলা হয় নাই। তা ছাড়া আমাদেরকে ভালো করে জেনে নিতে হবে যে হীরা দিয়ে কাচ কাটা যায়, কিন্তু কাচ দিয়ে হীরা কাটা যায় না। কোরান দিয়ে হাদিস কাটা যায়, কিন্তু হাদিস দিয়ে কোরান-এর দলিল কাটা যায় না।

১৯. এই দুই (হাজানি) বিবদমান পক্ষ (খাস্মানিখ) তর্ক করিতেছে (তাসাম্মু) মধ্যে (ফি) তাহাদের রব (রাব্বিহিম) সুতরাং যাহারা (ফাল্লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে (কুত্তিয়াত) তাহাদের জন্য (লাহম) পোশাক (সিয়াবুম) হইতে (মিন) আগুন (নারিন) ঢালিয়া দেওয়া হইবে

(ইউসাবু) হইতে (মিন) উপর (ফাউকি) তাহাদের মাথায় (রুউসিহিমুল) ফুটন্ত পানি (হামিম)।

এই দুই বিবদমান পক্ষ তর্ক করিতেছে তাহাদের রবের মধ্যে তাই যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদের জন্য কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে আগুন হইতে পোশাক। ফুটন্ত পানি তাহাদের মাথার উপর হইতে ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

২০. গলাইয়া ফেলা হইবে (ইউসহারু) তাহা দিয়া (বিহি) যাহা কিছু আছে (মা) মধ্যে (ফি) তাহাদের পেটগুলির (বুতুনিহিম) এবং (ওয়া) চামড়াগুলির (জুলুদ)।

গলাইয়া ফেলা হইবে তাহা দিয়া যাহা কিছু আছে তাহাদের পেটগুলির মধ্যে এবং চামড়াগুলির (মধ্যে)।

২১. এবং (ওয়া) তাহাদের জন্য (লাহম) মুণ্ডরগুলি (মাকামিউ) হইতে (মিন) লোহা (হাদিদ)।

এবং তাহাদের জন্য (রহিয়াছে) মুণ্ডরগুলি লোহা হইতে (তৈরি)।

এই আয়াতটিতে লোহার তৈরি মুণ্ডর বলার কারণ হলো, সেই যুগে কোনো আধুনিক – যাহা এই যুগে চালু ॥ অস্ত্র ছিল না বললেই চলে। তাই লোহার তৈরি মুণ্ডরের কথা বলা হয়েছে বিষয়টিকে সহজ-সরলভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

২২. যখনই (কুল্লামা) চাইবে (আরাদু) যে (আন) তাহারা বাহির হইবে (ইয়াখরুজু) তাহা হইতে কারণে (মিনহামিন) ভয়ে (গাম্মিন) তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে (উইদু) তাহার মধ্যে (ফিহা) এবং (ওয়া) তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো (জুকু) শাস্তি (আজাবা) জ্বলন্ত আগুনের দহন (হারিক)।

যখনই তাহারা বাহির হইতে চাইবে যে ভয়ের কারণে তাহা হইতে তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তাহার মধ্যে এবং জ্বলন্ত আগুনে দহনের শাস্তি র স্বাদ গ্রহণ করো।

২৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নালাহা) দাখিল (প্রবেশ) করাইবেন (ইউদখিলুল) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আমানু) এবং (ওয়া) কাজ করিয়াছে (আম্মেনুস) ভালো (নেকি, উত্তম, শুভ, হিতকর) (সালিহাতি) জ্ঞানাতগুলিতে (জ্ঞানাতিন) প্রবাহিত (তাজরি) হইতে (মিন) পাদদেশ (মূলদেশ, নিম্নদেশ) (তাহতিহাল) ঝরনাগুলি (আনহারু) তাহাদেরকে সাজানো হইবে (তাহাদেরকে অলঙ্কৃত করা হইবে) (ইউহাল্লাওনা) ইহার মধ্যে (ফিহা) হইতে (মিন) ককন (আসাইরা) হইতে (মিন) স্বর্ণের (জাহাবিউ) এবং (ওয়া) মুক্তার (লুলুয়ান) এবং (ওয়া) তাহাদের পোশাক (লিবাসুহম) ইহার মধ্যে (ফিহা) রেশমের (হারিরু)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবেশ করাইবেন জ্ঞানাতগুলিতে যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং ভালো কাজ করিয়াছে, ঝরনাগুলি প্রবাহিত হয় (তাহার) পাদদেশ হইতে ইহার মধ্যে তাহাদেরকে অলঙ্কৃত করা হইবে স্বর্ণ হইতে ককন হইতে এবং মুক্তার এবং ইহার মধ্যে রেশমের পোশাক তাহাদের (হইবে)।

যারা ইমানদার এবং আমলে সালেহা করেছে তাদেরকে জ্ঞানাতগুলিতে আল্লাহ নিশ্চয়ই দাখিল করবেন। এখানে আল্লাহ জ্ঞানাতে প্রবেশ করার শর্ত হিসাবে দুইটি শর্ত দিয়েছেন : একটি ইমান, অপরটি আমলে সালেহা। কেবলমাত্র ইমানদার কথাটি না বলে সঙ্গে আমলে সালেহার কথাটি যুক্ত করে দিয়েছেন। ইমানদার না হয়েও আমলে সালেহা তথা ভালো কাজ করলেই জ্ঞানাতে যাবার কথাটি বলা হয় নি, বরং ইমানদার হতে হবে। আবার ইমানদারের সঙ্গে আমলে সালেহা তথা

ভালো কাজটি করার শর্তটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একদিকে যেমন ইমানদার হতে হবে আবার সেই সঙ্গে আমলে সালেহা তথা ভালো কাজ করার কথাটি বলা হয়েছে। জান্নাতিদের জান্নাতের পাদদেশ দিয়ে অনেক রকম বরনা প্রবাহিত হবে এবং স্বর্গের তৈরি ককন এবং মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো থাকবে এবং জান্নাতিদের পোশাক হবে রেশমের।

এখানে একটু নিরপেক্ষ মনে চিন্তা করলেই একটি প্রশ্ন উদ্ভূত হয় যে স্বর্গ, মণিমুক্তা এবং রেশমের পোশাক দুনিয়ার জিন্দেগিতে শরিয়তের মানদণ্ডে না পরাই ভালো বলা হয়েছে। অথচ জান্নাতে প্রবেশ করার পর এই সমস্ত জিনিসগুলোর বিষয়ে বারণটি নাই। কারণ দুনিয়ার কলুষিত আন্নিত্বটি, যাহা আমার মধ্যেই বসবাস করে, তথা যে শয়তানটি খান্নাস-রূপে আমার সঙ্গেই অবস্থান করছে উহা হতে মুক্ত হতে পারলেই জান্নাতে অবস্থান করা যায় সুতরাং আমার ‘আন্নি’-র সঙ্গে যে-খান্নাসরূপী শয়তানটি আছে উহাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পারলে স্বর্গ, মণিমুক্তা এবং রেশমের পোশাক সবই তখন শোভনীয় বলে বিবেচিত হয়।

২৪. এবং (ওয়া) হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে (হদু) দিকে (ইলা) পবিত্র (বিগুদু, পুত) (তাইয়্যিবি) হইতে (মিনাল) বাণী (কথা, উক্তি) (কাউলি) এবং (ওয়া) হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে (হদু) দিকে (ইলা) পথের (রাস্তা, সড়ক) (সিরাতিল) প্রশংসিত (প্রশংসা করা হইয়াছে এমন, প্রশংসাপ্রাপ্ত) (হাম্বিদ)।

এবং পবিত্রের দিকে (তাহাদেরকে) হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে বাণী হইতে এবং হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে প্রশংসিতের পথের দিকে।

২৫. নিশ্চয়ই যাহারা (ইন্নালাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) এবং (ওয়া) বাধা দেয় (ইয়াসুদুনা) হইতে (আন) পথ (রাস্তা, সড়ক) (সাবিলি) আল্লাহর (ল্লাহি) এবং (ওয়া) মসজিদ (মাসজিদিল) হারাম (হারামি) যাহা (আল্লাজি) আমরা করিয়াছি তাহা (জাআল্লাহ) মানুষদের জন্য (লিন্নাসি) সম্মান (সাওয়াআনিল) স্থানীয় বাসিন্দা (আকিফু) ইহার মধ্যে (ফিহি) এবং (ওয়া) বহিরাগত (বাদি) এবং (ওয়া) যে (মান) ইচ্ছা করে (ইউরিদ) ইহার মধ্যে (ফিহি) পাপ কাজের (বিইল্হাদিম) জুলুমের সহিত (বিজুলমিন) আমরা (আল্লাহ) তাকে আশ্বাদন করাইব (নুজিক্হ) হইতে (মিন) শাস্তি (আজাবিন) যন্ত্রণাদায়ক (আলিম)।

নিশ্চয়ই যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং আল্লাহর রাস্তা হইতে বাধা দিয়াছে এবং মসজিদুল হারাম (হইতে) যাহা আমরা (আল্লাহ) মানুষদের জন্য করিয়াছি তাহা সম্মান। ইহার মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা এবং বহিরাগত এবং যে ইচ্ছা করে ইহার মধ্যে পাপকাজের জুলুম আমরা (আল্লাহ) তাকে আশ্বাদন করাইব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে।

যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথ হতে বাধা প্রদান করে এবং যে মসজিদুল হারাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষদের জন্য সম্মানভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে ॥ হোক সে কাছের অথবা দূরের ॥ তার পথে বাধা দেয় এবং যে ইচ্ছা করে পাপ কাজ ও জুলুম করে ॥ তাদেরকে আল্লাহ ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশ্বাদন করাবেন। এই আয়াতে যে মসজিদুল হারামের কথা বলা হয়েছে সেই মসজিদুল হারামের মেজাজি রূপটি তথা জাহেরি রূপটি হলো মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘরটি। কিন্তু আসল মসজিদুল হারাম তথা হাকিকি মসজিদুল হারামটি দুনিয়ার সব রকম

মানুষের জন্য খুলে রাখা হয়েছে। এই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার আশ্বানটি সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন, এ জন্য ‘জাআল্‌নাহ লিন্‌নাসি’ তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য এই হাকিকি মসজিদুল হারাম। এই আসল মসজিদুল হারামটি ইট-বালু-সিমেন্ট দিয়ে বানানো হয় না এবং বানিয়ে ফেলার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই মসজিদুল হারামটি হলো একেকটি মানুষের সুরতে আল্লাহর ঘর। এই মসজিদুল হারাম জীবন্ত। এই মসজিদুল হারামের দরজা সবার জন্য খোলা। কিন্তু মেজাজি মসজিদুল হারামটি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য। যদি ইহা জাহেরি মসজিদুল হারাম হতো তা হলে ‘লিন্‌নাসি’ তথা ‘মানুষদের জন্য’ আশ্বানটি থাকতো না। ইহা আল্লাহর একটি সার্বজনীন আশ্বান। তা ছাড়া এমন কোনো জাতি এবং এমন কোনো কণ্ঠ দুনিয়াতে নাই যাদেরকে হেদায়েত করার জন্য সেই জাতি এবং সেই কণ্ঠের একান্ত নিজস্ব ভাষায় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার জন্য নবি-রসূল পাঠানো হয় নি। তা হলে সেই সব কণ্ঠ এবং সেই সব জাতির মসজিদুল হারামটি কোথায় অবস্থান করে? হয়তো সেই সব জাতির, সেই সব কণ্ঠের নিজস্ব ভাষায় মসজিদুল হারামের মতো জাহেরি কিছু একটা থাকবারই কথা এবং এই রকম থাকবার কথাটি সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে মেনে নেওয়াটা বড়ই কষ্টকর। প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক কণ্ঠের অনুসারী মানুষেরাই কমবেশি মনে করতে চায় যে, আল্লাহ শুধু তাদেরই জন্য। এবং এই রকম চিন্তাধারা হতেই যুগে যুগে, কালে কালে আমরা মানুষ হত্যার বীভৎস দৃশ্যটি ধর্মের নামে দেখে আসছি। অথচ এরা কেউ সার্বজনীন ধর্মটি হয়তো বুঝতে পারে নি বা হয়তো ইচ্ছা করেই মেনে নেয় নি এবং আজও এই একবিংশ শতাব্দীতে কে কতটুকু মেনে চলছে তা আমরা জানি না। জননীর গর্ভ

হতে বাহির হয়ে আসার পরই পিতামাতা তাদের ধর্মের সাইনবোর্ডটি কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অধম লিখকের পিতা হেলালউদ্দিন এবং মাতা সেতারা বেগম ॥ ইকবাল আহমদ এবং ডাকনাম জাহাঙ্গীরটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। পিতামাতা শিশু জাহাঙ্গীরের কাঁধে প্রথমেই ধর্মের সাইনবোর্ডটি ঝুলিয়ে দিয়েছে। তা হলে কি এই কথাটি পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া যায় না যে আমার জন্মের আগেই আমার তকদিরটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে? জন্মের আগেই যদি আমার তকদিরটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তা হলে হিন্দুর ঘরে, বৌদ্ধের ঘরে, পার্শীর ঘরে, জৈনের ঘরে, কনফুসিয়াসের ঘরে, তাওয়ের ঘরে, সাবাইয়ার ঘরে, সেক্টুর ঘরে, ইহুদির ঘরে, খ্রিস্টানের ঘরে এবং মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণ করাটাই একেকটি মানুষের একেকটি তকদির। এই তকদিরের জগদ্বল পাথরটি সরানো মোটেই সম্ভবপর হয় না। তবে মাঝে-সাজে লব্ধ মানুষের মধ্যে দু'একটি এদিক-সেদিক হওয়াটাকে কোনো ঘটনা বলা যায় না। আল্লাহ তো আদিল তথা সূক্ষ্ম বিচারক। সুতরাং যে কোনো ধর্মে জন্মগ্রহণ করা মানুষটি যদি আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করে যে, আমার জন্মটাই কি একটি আজন্ম মহাপাপ, নাকি একটি মহাতকদির? তা হলে দুনিয়াতে ধর্মে ধর্মে যে মারামারি, কাটাকাটি হয়েছে ইহা তো নিছক প্রতিটি ধর্মের হাতে-গোনা কিছু জ্ঞানপাপীর হীন স্বার্থ উদ্ধারের একটি নিকৃষ্টতম জঘন্য প্রচেষ্টাই ছিল। সুতরাং সুফিবাদই একমাত্র মহাসার্বজনীন বিষয়, যেখানে কোনো ধর্মের কোনো সাইনবোর্ডের স্থানই নাই। যারা সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে সুফিবাদের কথা বলে বেড়ায়, তারা সামনে খাসির মাথা রেখে ডেড়ার মাংস বিক্রি করে।

২৬. এবং (ওয়া) যখন (ইজ্জ) আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম (বাওয়ানা) ইব্রাহিমের জন্য (লিইব্রাহিমা) স্থান (মাকানা) ঘরের (বাইতি) যে (আন) না (লা) শেরেক করা (তুশরিক) আমার সাথে (বি) কোনো কিছু (শাইয়াঐ) এবং (ওয়া) পবিত্র রাখো (তাহহির) আমার ঘরকে (বাইতিইয়া) তোয়াফকারীদের জন্য (লিত্তাইফিনা) এবং (ওয়া) কায়েমকারীদের (কাযিমিনা) এবং (ওয়া) রুকুকারীদের (রুক্কাই) সেজদাকারীদের (সুজুদ)

এবং যখন ইব্রাহিমের জন্য আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম ঘরের স্থান যে শেরেক করিও না আমার সাথে কোনো কিছু, আমার ঘরকে তোয়াফকারীদের জন্য পবিত্র রাখো এবং কায়েমীদের জন্য এবং রুকুকারীদের (এবং) সেজদাকারীদের (জন্য)।

২৭. এবং (ওয়া) ঘোষণা দাও (আজ্জিন) মধ্যে (ফি) মানুষদের (নাসি) হজের (বিল হাজ্জি) তোমার নিকট আসিবে (ইয়াতুকা) পায়ে হাঁটিয়া (রিজালাও) এবং (ওয়া) উপর (আলা) সর্ব (কুল্লি) শীর্ণকায় উটের (দামিরি) তাহারা আসিবে (ইয়াতিনা) হইতে (মিন) সমস্ত (কুল্লি) রাস্তা (ফাজ্জিন) দূরবর্তী (আম্বিকিন)।

এবং ঘোষণা দাও মানুষদের মধ্যে হজের তোমার নিকট আসিবে পায়ে হাঁটিয়া এবং শীর্ণকায় সর্ব (প্রকার) উটের উপর তাহারা আসিবে সব (রকম) দূরবর্তী পথ হইতে।

২৮. তাহারা প্রত্যেক (ইন্দিয়গোচর, ইন্দিয় দ্বারা উপলব্ধি, দর্শন) করে (লিইয়াশ্হাদু) সুফল (ফায়দা, লাভ)-গুলিকে (মানাফিয়া) তাহাদের জন্য (লাহম) এবং (ওয়া) উচ্চারণ (মুখদ্বারা শব্দকরণ, কথন, বাচনভঙ্গী) করে (ইয়াজ্জুরুস) নাম (মা) আল্লাহর (আল্লাহি) মধ্যে (ফি) দিনগুলির (আইয়ামিম) নির্দিষ্ট

(স্থিরীকৃত, নির্ধিত, বিশেষভাবে প্রদর্শিত) (মালুম্মাতিন্) উপর (আলা) যাহা (মা) তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছেন (রাজাকাহম্) হইতে (মিন্) চারিচরণ বিশিষ্ট (চতুর্দ) জহু (বাহিম্মাতিন্) গৃহপালিত (আনআমি) সুতরাং তোমরা খাও (ফাকুলু) ইহা হইতে (মিন্‌হা) এবং (ওয়া) খাওয়াও (আত্‌ইমুল্) দূরবস্থাপনদের (দুঃস্থ, গরিব, দুঃখপীড়িত-দের) (বাইসাল্) ফকিরদের (চরম দরিদ্রদের, চরমদুর্দশাগ্রস্তদের, অভাবগ্রস্তদের) (ফাকির)।

তাহাদের জন্য ফায়দাগুলিকে তাহারা প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নির্দিষ্ট দিনগুলির মধ্যে যাহা (তাহাদের) উপর তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছেন গৃহপালিত চতুর্দ জহু হইতে। সুতরাং তোমরা খাও ইহা হইতে এবং খাওয়াও দুঃস্থদেরকে এবং ফকিরদেরকে।

২৯. ইহার পর (সুম্মাল্) তাহারা দূর করে (ইয়াকদু) তাহাদের ময়লা (অপরিচ্ছন্নতা) (তাফাসাহম্) এবং (ওয়া) তাহারা পূর্ণ করে (ইউফু) তাহাদের মানতগুলিকে (নুজুরাহম্) এবং (ওয়া) তাহারা তোয়াফ করে (ইয়াত্‌তাওয়াফু) ঘরের সহিত (বিল্বাইতি) প্রাচীন (পুরাতন) (আতিক)।

ইহার পর তাহাদের ময়লা তাহারা (যেন) দূর করে এবং তাহাদের মানতগুলিকে তাহারা (যেন) পূর্ণ করে এবং তাহারা (যেন) তোয়াফ করে প্রাচীন ঘরের সহিত।

৩০. ওইটাই (জালিকা) এবং (ওয়া) যে (মান্) সম্মান করে (ইউআজ্জিম্) পবিত্র অনুষ্ঠানগুলি (মর্যাদাসমূহ) (হরুম্মাতি) আল্লাহর (আল্লাহি) সুতরাং উহা (ফাহয়া) উত্তম (ভালো) (খায়রুন্) তাহার জন্য (লাহ্) নিকট (ইন্দা) তাহার রবের (রাব্বিহি) এবং (ওয়া) হালাল করা হইয়াছে (উহিল্লাত) তোমাদের জন্য

(লাকুম) ঘরে পালন করা জানোয়ার (গৃহপালিত জন্তু) (আনআম্মু) একমাত্র (ইল্লা) যাহা (ম্মা) শোনানো হইয়াছে (ইউত্লাম্মা) তোমাদের উপর (আলাইকুম্ম) সুতরাং তোমরা দূরে থাকো (ফাজ্জতানিবুর) অপবিত্রতা (রিজ্জাসা) হইতে (মিন্) মূর্তিগুলির (আওসানি) এবং (ওয়া) তোমরা দূরে থাকো (ওয়াজ্জতানিবু) কথা (কাওলা) মিথ্যা (জুর)।

ওইটাই এবং যে আল্লাহর মর্যাদাগুলির সম্মান করে সুতরাং উহাই উত্তম তাহার জন্য তাহার রবের নিকট এবং হালাল করা হইয়াছে তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু একমাত্র যাহা তোমাদেরকে শোনানো হইয়াছে সুতরাং তোমরা দূরে থাকো মূর্তিগুলির অপবিত্রতা হইতে এবং তোমরা দূরে থাকো মিথ্যা কথা (হইতে)।

৩১. পরিপুঙ্ক (বিশেষভাবে পরিষ্কৃত, শোধিত বা পবিত্রীকৃত, একনিষ্ঠ) (হনাফাআ) আল্লাহর জন্য (লিল্লাহ) ব্যতীত (ভিন্ন, বাদে, বিনা, ছাড়া) (গাইরা) যাহারা শরিক করে (মুশরিকিনা) ইহার মধ্যে (বিহি) এবং (ওয়া) যে (ম্মান) শরিক করে (ইউশরিক) আল্লাহর সহিত (বিল্লাহি) সুতরাং যেন (ফাকাআননাম্মা) পড়িয়া গেল (খাররা) হইতে (মিন্) আকাশ (সাম্মায়ি) সুতরাং তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবে (ফাতাখতাফুহ) পাখি (তাইকু) অথবা (আও) উড়াইয়া লইয়া যাইবে (তাহবি) ইহার মধ্যে (বিহি) বাতাস (রিহ) মধ্যে (ফি) স্থানে (ম্মাকানিন্) দূরবর্তী (সাহিকি)।

পরিপুঙ্ক হইয়া আল্লাহর জন্য তাহার সহিত যাহারা শরিক করে (তাহারা) ব্যতীত এবং যে শরিক করে আল্লাহর সহিত সুতরাং যেন সে আকাশ হইতে পড়িয়া গেল সুতরাং তাহাকে পাখি ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবে অথবা তাহাকে বাতাস উড়াইয়া লইয়া যাইবে দূরবর্তী স্থানের মধ্যে।

৩২. ওইটাই (জালিকা) এবং (ওয়া) যে (মান) সন্মান করে (ইউআজিম) বিধানসমূহ (শাহাইরা) আল্লাহর (লিল্লাহি) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাইননাহা) হইতে (মিন) তাকওয়া (তাকওয়াল) কলবগুলির (অন্তরসমূহের) (কুলুব)।

ওইটাই এবং যে আল্লাহর বিধানগুলিকে ইজ্জত করে সুতরাং তাহা অন্তরগুলির তাকওয়া হইতে (আসে)।

৩৩. তোমাদের জন্য (লাকুম) ইহার মধ্যে (ফিহা) ফায়দা (সুফল, লাভ) (মানাফিউ) দিকে (ইলা) সময় (আজালিম) নির্দিষ্ট (মুসাম্মান) ইহার পর (সুম্মা) তাহার জায়গা (মাহিল্লুহা) দিকে (ইলাল) ঘর (বাইতি) প্রাচীন (আতিক)।

ল্ট তোমাদের জন্য ইহার মধ্যে ফায়দা নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ইহার পর তাহার জায়গা প্রাচীন ঘরের দিকে।

৩৪. এবং (ওয়া) প্রত্যেকের জন্য (লিকুল্লি) জাতির (উম্মাতিন) আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি (জাআলনা) কুরবানির নিয়ম (মানসাকা) তাহারা উচ্চারণ করে সহিত (লিইয়াজ্জুরুস) নাম (মা) আল্লাহর (আল্লাহি) উপর (আলা) যাহা (মা) তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছেন (রাজাকাহম) মধ্য হইতে (মিন) চতুর্দ জব্বুর (বাহিমাতিল) গৃহপালিত (আনআম) সুতরাং তোমাদের ইলাহ (ফাইলাহকুম) ইলাহ (ইলাহ) এক (ওয়াহিদুন) সুতরাং তাহার জন্য (ফালাহ) আত্মসমর্পণ করো (আস্লিমু) এবং (ওয়া) সুসংবাদ দাও (বাশ্শিরিল) বিনীতগণকে (মুখবিতিনা)।

এবং প্রত্যেক জাতির জন্য আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি কুরবানির নিয়ম তাহারা আল্লাহর নামের সহিত উচ্চারণ করে যাহা তাহাদেরকে রেজেক

দিয়াছেন (উহার) উপর গৃহপালিত চতুর্দ জন্তুর মধ্য হইতে, সুতরাং তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ সুতরাং তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করো এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।

৩৫. যাহারা (আল্লাজিনা) যখন (ইজা) আল্লাহর জিকির করা হয় (জুকিরাল্লাহ) কাঁপিয়া উঠে (ওয়াজিলাত) তাহাদের কলবগুলি (কুলুবুহম) এবং (ওয়া) ধৈর্যধারণকারী (সাবেরিনা) উপর (আলা) যাহা (মা) তাহাদের উপর পতিত হয় (আসাবাহম) এবং (ওয়া) কায়েমকারী (মুকিম্বি) সালাত (সালাতি) এবং (ওয়া) যাহা হইতে (মিম্মা) আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছি (রাজাক্নাহম) তাহারা খরচ করে (ইউন্ফিকুন)।

যাহারা আল্লাহর যখন জিকির করা হয় তাহাদের অন্তরগুলি কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাদের উপর যাহা পতিত হয় (উহার) উপর ধৈর্যধারণকারী এবং সালাত কায়েমকারী এবং যাহা হইতে তাহাদের আমরা (আল্লাহ) রেজেক দিয়াছি তাহারা খরচ করে।

৩৬. এবং (ওয়া) উটগুলি (বুদনা) সেইগুলিকে আমরা (আল্লাহ) করিয়াছি (জাআল্নাহা) তোমাদের জন্য (লাকুম) হইতে (মিন) আল্লাহর দৃষ্টান্তগুলির (নিদর্শনাবলির) (শাআইরিব্লাহি) তোমাদের জন্য (লাকুম) উহার মধ্যে (ফিহা) মঙ্গল (কল্যাণ) (খাইরুন) সুতরাং উচ্চারণ করো (ফাজ্কুরুস) আল্লাহর নাম (মাল্লাহি) তাহাদের উপর (আলাইহা) শ্রেণীবদ্ধভাবে (সারিবদ্ধভাবে) (সাওয়াফ) সুতরাং যখন (ফাইজা) হেলিয়া পড়ে (চলিয়া পড়ে) (ওয়াজাবাত) তাহাদের পিঠগুলি (জুনুহা) সুতরাং তোমরা খাও (ফাকুলু) উহা হইতে (মিন্হা) এবং (ওয়া) তোমরা খাওয়াও (আত্ইমুলু) অভাবীদেরকে (কানিয়া) এবং (ওয়া)

যাহারা চায় সেই অভাবীদেরকে (মুতাররা) ওইভাবে (কাজালিকা) সেইগুলিকে আমরা (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি (সাখখারনাহা) তোমাদের জন্য (লাকুম) তোমরা যাহাতে (লাআল্লাকুম) শুকুর করো (তাশকুরুন)।

এবং উটগুলি তোমাদের জন্য আমরা (আল্লাহ) সেইগুলিকে করিয়াছি আল্লাহর দৃষ্টান্তবলির মধ্যে উহার মধ্যে তোমাদের জন্য মঙ্গল (রহিয়াছে) সুতরাং উচ্চারণ করো শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাদের উপর আল্লাহর নাম সুতরাং যখন হেলিয়া পড়ে ইহাদের পিঠগুলি সুতরাং তোমরা খাও উহা হইতে এবং অভাবীদেরকে এবং যাহারা চায় সেই অভাবীদেরকে তোমরা খাওয়াও তোমাদের জন্য ওইভাবে আমরা (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি সেইগুলিকে যাহাতে তোমরা শুকুর করো।

৩৭. কখনওই না (লাই) পৌঁছায় (ইয়ানালা) আল্লাহর (আল্লাহা) উহাদের গোশতগুলি (লুহমুহা) এবং (ওয়া) না (লা) উহাদের রক্ত (দিমাউহা) এবং কিছু (ওয়ালাকিন) তাহার (কাছে) পৌঁছায় (ইয়ানালুহ) তাকওয়া (তাকওয়া) তোমাদের হইতে (মিনকুম) ওইভাবে (কাজালিকা) সেইগুলিকে তিনি (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন (সাখখারনাহা) তোমাদের জন্য (লাকুম) তোমরা কবির (শ্রেষ্ঠত্ব) ঘোষণা করো (লিতুকাববিরু) আল্লাহর (আল্লাহা) উপরে (আলা) যাহা (মা) তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন (হাদাকুম) এবং (ওয়া) সুসংবাদ দাও (বাশশিরিল) সংকর্ষপরায়ণ লোকদেরকে (মুহসিনি)।

উহাদের গোশতগুলি এবং উহাদের রক্ত আল্লাহর (কাছে) কখনওই না পৌঁছায় না এবং কিছু তাহার (কাছে) পৌঁছায় তাকওয়া ওইভাবে তোমাদের হইতে সেইগুলিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন তোমাদের জন্য তোমরা কবির (শ্রেষ্ঠত্ব)

ঘোষণা করো আল্লাহর, তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন যাহা উপরে এবং সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে।

যে কোনো হালাল পশুর রক্ত এবং গোশত আল্লাহর নিকট কখনওই পৌঁছায় না ॥ এই কথাটি আল্লাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন। বরং আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিলেন যে তোমাদের মনের খাস নিয়তটি তথা তাকওয়াটি আল্লাহর নিকট পৌঁছায়। পবিত্র নিয়তটিও যে তাকওয়ার একটি বড় অংশ অথবা পুরোটাই ॥ সেই কথাটি এই আয়াতের নিরিখে বলা চলে। পবিত্র নিয়ত নামক তাকওয়ার উপরেই ধর্মভীরুতার পরিচয়টি ফুটে ওঠে। এখানে আম্মিত্তের কোরবানিটিকেই তথা যে খান্নাসরূপী শয়তানটি জীবাত্মার সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেওয়া অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। এই আম্মিত্তের কোরবানির জন্য যারা ধ্যানসাধনার তাকওয়ায় ডুবে আছে তাদেরকে সঠিক পথটুকু অবশ্যই দেখানো হয়। পশু কোরবানিটি হলো ম্লেজাজি কোরবানি এবং আম্মিত্তের কোরবানিটিই হলো হাকিকি কোরবানি। আমার সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে উহাকে ‘তু’ বলা হয়। সুতরাং আম্মি যোগ ‘তু’ সম্মান সম্মান আম্মিত্ত। আম্মি যোগ খান্নাসরূপী শয়তান সম্মান সম্মান ‘উদ্‌উনা’। আমার ভেতরে পরীক্ষা করার জন্য যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পারলেই ‘আম্মি’ কেবলই একা থাকি। এই খান্নাসম্মুক্ত আম্মিটিকেই বলা হয় ‘উদ্‌উনি’। এই ‘উদ্‌উনি’ হতে পারলেই আল্লাহর রহস্যলোকের দরজাগুলো নিজের ভেতরে খুলতে থাকে এবং নিজের ভেতরেই আল্লাহর ডাকসমূহ শুনতে পায়। এখানে ম্লেজাজি কোরবানিটি চালু না রাখা হলে হাকিকি কোরবানিটির রহস্য ধরাটা বড়ই কষ্টকর হতো। সেই জন্যই

বিমূর্ত (যাহা দেখা যায় না) কোরবানিটি বুঝবার জন্যে মূর্ত কোরবানি পণ্ড কোরবানির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কেউ বুঝতে পারে, আবার কেউ মোটেও বুঝতে পারে না। অবশ্য বোঝাটাও তকদির এবং না বোঝাটাও তকদির। এই তকদিরের বন্ধনটিকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

৩৮. নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) বাধাদান (নিবারণ, অবরোধ, প্রতিরোধ) করেন (ইউদাফিউ) হইতে (আন) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আম্মানু) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) না (লা) ভালোবাসেন (ইউহিব্বু) প্রত্যেক (কুল্লা) বিশ্বাসঘাতক (খাওয়ানিন) যে উপকার স্বীকার করে না (অকৃতজ্ঞ) (কাফুর)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ বাধাদান করেন যারা ইমান আনিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন না প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে।

প্রথমেই বলতে চাই যে ‘আন’ তথা হইতে শব্দটি এই বাক্যে ব্যবহার করতে পারলাম না। সুতরাং শব্দটি শব্দের জায়গাতেই রয়ে গেল। তারপর একটি মারাত্মক কথা হলো, এখানে এই আয়াতে ‘আম্মানু’ তথা ইমানদার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ অনেক অনুবাদকারী ‘আম্মানু’ শব্দটিকে অনুবাদ করতে গিয়ে ‘মোমিন’ লিখে ফেলেছেন। অবশ্য ইহা দোষের বিষয় হলেও জ্ঞানের স্বল্পতায় অথবা কথার মারপ্যাচ খাটিয়ে ‘আম্মানু’-কে তথা ইমানদারকে ‘মোমিন’ লিখে ফেলেছেন। আল্লাহ যেখানে ‘আম্মানু’ তথা ইমানদার শব্দটি এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন সেখানে হবহ না রেখে ইমানদারকে মোমিন বানিয়ে ফেলেছেন। অথচ ‘আম্মানু’ এবং ‘মোমিন’-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকুও যারা করতে পারেন না তাদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কী? বাইবেল-এর হবহ অনুবাদটি না

থাকার দরুন বাইবেল-এর জগাখিচুড়ি অবস্থাটি আমরা দেখতে পাই এবং বাইবেল পড়লেই আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের কিছু কথা ঢুকে পড়েছে। মূল কোরান-টি আছে বলেই অনুবাদকদের অবস্থানগুলো পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়।

৩৯. আদেশ দেওয়া হইল (অনুমতি দেওয়া হইল) (উজিনা) তাহাদের জন্য (লিল্লাজিনা) যুদ্ধ করা হইতেছে (ইউকাতালুনা) কারণ তাহাদের প্রতি (বিআন্নাহম) জুলুম করা হইয়াছে (জুলিমু) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) উপরে (আলা) সাহায্যের (নাসরি) তাহাদের (হিম) অবশ্যই ক্রমতাবান (লাকাদির)।

তাহাদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হইল কারণ তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইয়াছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের সাহায্যের উপরে, অবশ্যই ক্রমতাবান।

এই যুদ্ধের আদেশটি তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে যারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত হবার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই যুদ্ধটি আদ্যোপান্ত একটি প্রতিরোধের যুদ্ধ। নিছক প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধটির আদেশ দেওয়া তথা অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিরোধের যুদ্ধে যারা এগিয়ে যায় আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম এবং অবশ্যই ক্রমতাবান। এই রকম প্রতিরোধের যুদ্ধগুলোতে আমরা দেখতে পাই প্রায় ক্রেই বিজয়ী হয়েছে, পরাজিত হবার তুলনায়। কারণ আল্লাহ কখনওই জালিমদের সঙ্গে অবস্থান করেন না, বরং যারা জালিমদের দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত তাদের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

৪০. যাহারা (আল্লাজিনা) বহিস্কৃত হইয়াছে (যাহাদের বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে) (উখরিজু) হইতে (মিন) তাহাদের ঘরবাড়িগুলি (দিআরিহিম)

অন্যায়ভাবে (বিগাইরিহাক্কিন) একমাত্র (ইল্লা) যে (আই) তাহারা বলে (ইয়াকুলু) আমাদের রব (রাব্বানা) আল্লাহই (লাহ) এবং (ওয়া) যদি (লাও) না (লা) প্রতিহত করিতেন (দাফ্ট) আল্লাহ (আল্লাহিন) মানুষদের (নাসা) তাহাদের কিছু অংশকে (বাদাহম) কিছু অংশের দ্বারা (বিবাদিল্লা) অবশ্যই ধ্বংস করা হইত (হুদ্দিমাত) সংসারবিরাগীদের আশ্রমগুলি (সাওয়ামিউ) এবং (ওয়া) গির্জা (বিইয়াউ) এবং (ওয়া) ইহুদিদের উপাসনালয়গুলি (সালাওয়াতুউ) এবং (ওয়া) মসজিদগুলি (মাসাজিদু) জিকির করা হয় (ইউজ্জাকু) উহার মধ্যে (ফিহাস) আল্লাহর নাম (মুল্লাহি) অনেক (কাসিরান) এবং (ওয়া) অবশ্যই সাহায্য করিবেন (লাইয়ানসুরা) আল্লাহ (আল্লাহ) যে (মান) তাঁহাকে (আল্লাহকে) সাহায্য করে (ইয়ানসুরুহ) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নালাহা) অবশ্যই ক্রমতাবান (লাকাইয়ুন) মহিমাবিত ক্রমতাবান (আজিজ)?

যাহাদেরকে তাহাদের ঘরবাড়িগুলি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে অন্যায়ভাবে একমাত্র (কারণটি হইল) যে তাহারা বলে, ‘আল্লাহই আমাদের রব।’ এবং আল্লাহ যদি না প্রতিহত করিতেন মানুষদেরকে তাহাদের কিছু অংশকে (অন্য) কিছু অংশের দ্বারা (তাহা হইলে) অবশ্যই ধ্বংস করা হইত সংসারবিরাগীদের আশ্রম এবং গির্জা এবং ইহুদিদের উপাসনালয়গুলি এবং মসজিদগুলি, উহার মধ্যে জিকির করা হয় বেশি বেশি আল্লাহর নাম এবং আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রমতাবান, মহিমাবিত ক্রমতাবান।

এই আয়াতে একটিমাত্র অপরাধের জন্য অন্যায়ভাবে যাদেরকে ঘরবাড়িগুলো হতে বাহির করে দেওয়া হয়েছে সেই অন্যায়টি হলো যে, তারা বলতো, ‘আল্লাহই আমাদের রব তথা প্রতিপালক।’ আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করার

ঘোষণাটির মধ্যেও সে যুগে যে কী ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হতো এমনকি নিজেদের বসতভিটা হতেও উচ্ছেদ করে দেওয়া হতো তারই নজির, তারই দৃষ্টান্ত এই আয়াতে ফুটে উঠেছে। তাই আল্লাহ পাক আরও বলছেন যে মানুষদের মাঝেই একটি দলকে অপর দল দিয়ে প্রতিহত করানো হয়। যদি এ রকম ব্যবস্থাপত্রটি আল্লাহ না করে দিতেন তা হলে অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হতো সংসারবিরাগীদের আশ্রম এবং খ্রিস্টানদের গির্জা এবং ইহুদিদের কালিসা এবং মুসলমানদের মসজিদগুলো। কারণ উহাদের মধ্যেই জিকির করা হয় আল্লাহর নাম বেশি বেশি। আল্লাহ যে কারও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাটিকে গর্হিত অপরাধ মনে করেন তারই জ্বলন্ত দলিল হলো এই আয়াতটি। সংসারবিরাগীদের আশ্রমে বেশি বেশি জিকির করা হয় আল্লাহর নাম। এই সংসারবিরাগীদের আশ্রমটিকেও আল্লাহ জিকির করার একটি উত্তম স্থান বলে ঘোষণা করলেন এবং সংসারবিরাগীরাও যে আশ্রমে থেকে আল্লাহর নামে অধিক জিকির করেন তার স্বীকৃতিটিও এই আয়াতে দেওয়া হলো এবং ওই একইভাবে খ্রিস্টানদের গির্জা, ইহুদিদের কালিসা এবং মুসলমানদের মসজিদগুলোর কথাও বলা হলো। তারপর সর্বশেষে আল্লাহ চমকিত এবং আশাবিত্ত করলেন এই বলে যে, যে আল্লাহকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এই কথাটি যে কেউ মেনে নেবে, কিছু মানুষ কেমন করে আল্লাহকে সাহায্য করে সেটাই তো বিস্ময়কর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তা হলে কি আল্লাহ জাল্লা শানাহর প্রশংসায় জিকির-ফিকিরে মশগুল হয়ে ধ্যানসাধনা করাটাকেই আল্লাহকে সাহায্য করা বলা হয়েছে? মানুষ যাতে জিকির-ফিকিরে, ধ্যানসাধনায় মশগুল হয়ে আল্লাহর নৈকট্যলাভের প্রসঙ্গে নিরাশায় না ডোবে তারই জন্য আল্লাহ নিজেকে ‘কাইয়ুন’ তথা অবশ্যই ক্ষমতাবান এবং আজিজ তথা

মহিমাবিত্ত ক্রমতাবান বলে ঘোষণা করেছেন। তার মানে, হে মানুষ, তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আছো উহাতে নিরাশ হবার কিছু নাই, কারণ সর্বময় ক্রমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানাহ।

৪১. যাহারা (আল্লাজিনা) যদি (আন) তাহাদেরকে ক্রমতা দেই আমরা (আল্লাহ) (মাক্কান্নাহম) মধ্যে (ফি) জমিনে (পৃথিবীতে, দেহে) (আরদি) তাহারা কায়েম করে (আকামুস) সালাত (সালাতা) এবং (ওয়া) তাহারা দেয় (আতুজ্) জাকাত (জাকাতা) এবং (ওয়া) নির্দেশ দেয় (আম্মারু) মহৎ কাজের সহিত (বিল্মারুফি) এবং (ওয়া) মানা করে (নাহাও) হইতে (আনিল্) অন্যায় কাজ (মুনকারি) এবং (ওয়া) আল্লাহরই জন্য (লিল্লাহি) পরিণতি (আকিবাতুল্) সব বিষয়ের (উম্মুর)।

এই জমিনের মধ্যে আমরা (আল্লাহ) যদি তাহাদেরকে ক্রমতা দেই (তাহা হইলে) তাহারা কায়েম করে সালাত এবং তাহারা জাকাত দেয় এবং নির্দেশ দেয় মহৎ কাজের এবং অসৎ কাজ হইতে মানা করে এবং আল্লাহরই জন্য সব বিষয়ের পরিণতি।

এই আয়াতে বিশেষ একটি শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন যে, যদি এই বিশেষ শ্রেণীকে ক্রমতা দেওয়া হতো তাহলে চারটি বিষয় হতে কখনওই বিচ্যুত হতো না। সেই চারটি বিষয়ের প্রথমটি হলো সালাত কায়েম করা। এই সালাত কি সত্যিই ওয়াক্ফিয়া সালাত নাকি দায়েমি সালাত? প্রশ্ন এ জন্যই করলাম যে দায়েমি সালাতের কথাটি সূরা মারেকের ২৩ নম্বর আয়াতে একদম খোলাসা করে বলে দেওয়া হয়েছে এবং হাদিসেও বলে দেওয়া হয়েছে যে ওয়াক্ফিয়া সালাত হতে দায়েমি সালাতের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে (সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম্ মিনাল সালাতিল্

ওয়াজি)। সবাইকে বলছি না, বরং বেশ কিছু ওয়াজিয়া সালাত পালনকারীদেরকে দেখতে পাই সুদ খেতে, এতিমের হক মেরে দিতে, জাল দলিল করে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে, খাদ্যে ডেজাল মেলাতে, বিদেশে পাঠাবার নামে গরিবের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করতে – ইত্যাদি অপকর্মগুলো করতে। বুকে হাত রেখে বলুন তো, এই রকম ওয়াজিয়া নামাজীদের চলনবলন দেখে মানুষ কী করে আস্থা স্থাপন করবে? তা হলে কি আল্লাহর বর্ণিত সালাতটির মর্যাদা দায়েমি সালাতের দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে? অভিজ্ঞতার শর্তে কী সিদ্ধান্ত নেব ভেবে পাই না। তারপরে আসে জাকাতের কথা। এই জাকাত কি মালের জাকাত, নাকি আমিত্বের কোরবানি দেবার জাকাত? অর্থের জাকাতের প্রশ্নেই আসা যাক। শতভাগের আড়াইভাগ যদি অর্থের জাকাতটি হয়ে থাকে তা হলে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের দেশগুলোতে সরকার আয়ের উপর অনেক অনেক বেশি কর ধার্য করে রেখেছে। হাতের আঙুল যেমন আয়না দিয়ে দেখতে হয় না, ঠিক তেমনি এদের করের কথাটিও না বললেও চলে। তা হলে এই জাকাতের আসল বিষয়টি কী হতে পারে? ইহার গবেষণা করাটি প্রয়োজন বোধ করি। অবশ্য সংকীর্ণতার এবং গোড়ামির কুপমণ্ডুকতার সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে গবেষণা করতে গেলেই গবেষণার ফলটি যে বিরাট একটি অশুভিষ প্রসব করিবে ইহাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ আছে কি? তৌহিদের শিক্ষাটি হলো, নিজে আগে পালন করে অপরকে শিক্ষা দেওয়া। মহং কাজের উপদেশ কারা দেবে? অসং লোকের মুখে মহং কাজের আদেশ উপদেশটি কি মানায়? প্রথমে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সং হতে হবে। তারপর মহং কাজের উপদেশটি মানাবে। ওই একই কারণে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার আদেশ-উপদেশটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও কথাগুলো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই

বলা হয়েছে, কিন্তু সমাজ-জীবনের করুণ অবস্থা দেখে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটি আপনিই এসে যায়।

৪২. এবং (ওয়া) যদি (ইন) আপনার উপর মিথ্যারোপ করে (ইউকাজ্জিবুকা) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাকাদ) মিথ্যারোপ করিয়াছিল (কাজ্জাবাত) তাহাদের আগেও (কাব্লাহম) কওম (জাতি) (কাওমু) নুহের (নুহিউ) এবং (ওয়া) আদ (আদুন) এবং (ওয়া) সামুদ (সামুদ)।

এবং যদি আপনার উপর মিথ্যারোপ করে নিশ্চয়ই মিথ্যারোপ করিয়াছিল তাহাদের আগেও নুহের কওম এবং আদ এবং সামুদ।

৪৩. এবং (ওয়া) কাওম (কাওমু) ইব্রাহিমের (ইব্রাহিমা) এবং (ওয়া) কওম (কাওমু) লুতের (লুতি)।

এবং ইব্রাহিমের কওম এবং লুতের কওম।

৪৪. এবং (ওয়া) অধিবাসীরা (আস্হাবু) মাদাইয়ানের (মাদইয়ানা) এবং (ওয়া) মিথ্যারোপ করিয়াছিল (কুজ্জিবা) মুসাকেও (মুসা) সুতরাং আমি (আল্লাহ) সুযোগ (অবকাশ) দিয়াছিলাম (ফাআম্লাইতু) কাফেরদের জন্য (লিল্কাফিরিনা) ইহার পর (সুম্মা) আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার (পাকড়াও) করিয়াছিলাম (আখাজ্জুহম) সুতরাং কেমন (ফাকাইফা) ছিল (কানা) আমার সাজা (শাস্তি, দণ্ড, নিগ্রহ) (নাকিরি)।

এবং মাদাইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যারোপ করা হইয়াছিল মুসাকেও সুতরাং আমি সুযোগ দিয়াছিলাম কাফেরদের জন্য ইহার পর আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়াছিলাম সুতরাং কেমন ছিল আমার সাজা।

উপরের এই তিনটি আয়াতে আমরা দেখতে পাই, সেই প্রাচীন যুগেও ঘোর বস্তুর পূজারিরা নবি-রসুলদের উপর জঘন্য মিথ্যারোপ করার দরুন কী রকম ভয়ংকর শাস্তি পেতে হয়েছিল তারই কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হজরত নুহ (আ.)-এর আমলে এবং আদ ও সামুদ জাতিও নবিদেরকে অস্বীকার করেছিল তথা অধ্যাত্মবাদকে অস্বীকার করেছিল – এমনকি ইব্রাহিম (আ.) এবং লুত (আ.)-এর কণ্ঠ এবং মাদাইয়ানের অধিবাসীরা এবং হজরত মুসা নবি (আ.)-র মতো জাঁদরেল নবিকেও যুগে যুগে এই ঘোর বস্তুর-পূজারিরা অস্বীকার করে এসেছিল এবং নানা রকম মিথ্যারোপ করতেও এইসব কাফেরদের অন্তরাত্মা এতটুকুও কঁপে ওঠে নি। আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করে এইসব কাফেরদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানো তো দূরে থাক, বরং আরও ভয়ংকর, আরও রুদ্ধমূর্তি ধারণ করে নবি-রসুলদের অপমানের পর অপমান করে গেছে। কিন্তু সুযোগেরও তো একটা সীমা আছে। যখন সীমার বাঁধ ভেঙে গেছে তখনই আল্লাহ এইসব কাফেরদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আসলেই যুগে যুগে এবং এই সর্বাধুনিক যুগেও ঘোর বস্তুর-পূজারিরা নবি-রসুলদের অধ্যাত্মবাদের মোড়ানো বস্তুবাদকে কখনওই গ্রহণ করে নিতে পারে নি এবং এখনও পারে না। এই সর্বাধুনিক যুগে পরিবেশ-দূষণের যে ভয়ংকর রূপটি আস্তে আস্তে ভয়ংকরতম রূপটি ধারণ করতে যাচ্ছে তাতে পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্যটি নষ্ট হয়ে গেলে কী যে ভয়ংকর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা কিছুটা সবাই বুঝতে পারে। সুনামির মতো ভয়ংকর সমুদ্রকম্পন, বড় বড় ভূমিকম্প, ঝড়, টর্নেডোগুলো যে কী রুদ্ধমূর্তিতে ছোবল মেরে যাচ্ছে তা আমরা সবাই কমবেশি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যদি আধুনিক যুগের কিছু লোক মনে করে থাকে যে আগের যুগের শাস্তির মতো

শাস্তির নমুনাটি তো এখনও দেখতে পাচ্ছি না ॥ যেদিন আল্লাহর এই ভয়ংকর শাস্তিটি পতিত হতে থাকবে তখনই বিশ্বয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে। কারণ ঘোর বস্তুর-পূজারিরা কখনওই আত্মার অবস্থানটিকে কোনোদিন কোনোকালেও স্বীকার করে নেয় নি এবং এখনও অনেকেই স্বীকার করে না। আবার এমন কিছু লোক আছে যারা মুখে স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে স্বীকার করে না। তাদের সংখ্যাও সব যুগেই কম ছিলো না। ঘোর বস্তুর-পূজারিদেরকে কোনোকালেই হেদায়েত করা যায় নি এবং এখনও যায় না। কারণ এরা ঘোর কাফের। হেদায়েতের বাণী এদের অন্তরকে আঘাত করা তো দূরের কথা, বরং নানা রকম টিটকারি করে গিয়েছে এবং এখনও করে। এই রকম কাফেরেরা সর্বযুগেই কলুষিত বস্তুর-পূজারি। এরা নবি-রসূল, ওলি-আবদাল এবং এমনকি স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা শানাহকেও অস্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং আল্লাহর শাস্তি আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর ভয়ংকর বোবা শাস্তিটি সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতিকে রীতিমতো ঘাবড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই আল্লাহর বোবা শাস্তিটির নাম সবারই কমবেশি জানা আছে। তবু খোলাসা করে বলে দিচ্ছি – আল্লাহর সেই বোবা মহাশাস্তিটির নাম হলো একোয়ার্ড ইম্মিউন ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম, সংক্ষেপে এইডস নামক ভয়াবহ রোগ।

৪৫. সুতরাং কতই না (ফাকাআইইম্) হইতে (মিন) জনপদ (কারইয়াতিন্) আমরা (আল্লাহ) তাহা ধ্বংস করিয়াছি (আহলাক্নাহা) এবং (ওয়া) তাহা (হিয়া) জালিম (জালিমাতুন) সুতরাং তাহা (ফাহিয়া) যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল (খাইইয়াতুন) উপর (আলা) ইহার ছাদগুলির (উরুশিহা) এবং (ওয়া) কূপ (কুয়া) (বিরিম্) বর্জিত (পরিত্যক্ত) (মোয়াত্‌তালাতিউ) এবং (ওয়া) অট্টালিকা (প্রাসাদ) (কাসরিম্) সুদৃঢ় (মাশিদিন্)।

সুতরাং কতই না জনপদ হইতে তাহা আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস করিয়াছি এবং তাহা (ছিল) জালিম সুতরাং তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল ইহার ছাদগুলির উপর এবং পরিত্যক্ত কূপ এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা (ধ্বংস করা হইয়াছিল)।

এই আয়াতে জালিমদের জনপদ ধ্বংস করার আরও নমুনা তুলে ধরেছেন আল্লাহ। বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলোতে বাস-করা জালিমদেরকে অট্টালিকার ছাদসহ ডেঙে পড়ে চাপা-দেওয়া মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করানো হয়েছে। সেই যুগে কত পানির কূপগুলোকে পানি পান করার যোগ্যতা হারিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে জালিমদেরকে শাস্তি দেবার কঠোরতার কথাটি আল্লাহ ঘোষণা করছেন।

৪৬. তবে কি (আফালাম) তাহারা ভ্রমণ করে নাই (ইয়াসিরু) মধ্যে (ফি) জমিনে (দেহে, মাটিতে, পৃথিবীতে) (আরদি) সুতরাং হইত (ফাতাকুনা) তাহাদের জন্য (লাহম) কলবগুলি (কুলুবুই) বুঝিত (ইয়াকিলুনা) উহার দ্বারা (বিহা) অথবা (আও) কানগুলি (আজানুই) শুনিত (ইয়াস্মাউনা) উহার দ্বারা (বিহা) সুতরাং উহা (ফাইন্নাহা) না (লা) অন্ধ হয় (তাম্মাল) চোখগুলি (আবসারু) এবং (ওয়া) কিছু (লাকিন) অন্ধ হয় (তাম্মাল) কলবগুলি (কুলুবু) যাহা (লাতি) মধ্যে (ফি) বুকগুলিতে (বক্সমুহে) (সুদুর)।

তবে কি তাহারা বেড়ায় (ভ্রমণ, পর্যটন, ঘূর্ণন করে) নাই জমিনের মধ্যে অথবা আপন দেহের মধ্যে সুতরাং তাহাদের জন্য অন্তরগুলি বুঝিতে পারিত উহার দ্বারা অথবা উহার দ্বারা কানগুলি শুনিত পারিত সুতরাং উহার দ্বারা চোখগুলি অন্ধ হয় না এবং অন্ধ হয় কিছু কলবগুলি যাহা বুকগুলির মধ্যে (আছে)।

এই আয়াতে ভ্রমণ করার কথাটি মুখ্য বলে মনে হয়। জমিনের উপর ভ্রমণ তথা দেশভ্রমণ করলেই যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে তা শতভাগ মেনে নেওয়া যায় না। ঘোর

নাশ্টিক প্রাক্তন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই সমগ্র পৃথিবী তিন যুগ ভ্রমণ করলেও যদি কেউ এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করত তা হলে উনি সোজা বলে দিতেন যে, ‘স্রষ্টাই তো নাই।’ সুতরাং এই ভ্রমণটিতে আপন দেহের ভিতরে ভ্রমণ করার কথাটি বোঝানো হয়েছে বলে মনে করতে চাই। জমিনের উপর তো বহু মানুষই অহরহ ভ্রমণ করছে, কিন্তু চোখ অন্ধ না হলেও বুকের অভ্যন্তরে কলবগুলো অন্ধ থাকে বলেই এসব কথার রহস্য বুঝে উঠতে পারে না। এদের চোখ মোটেও অন্ধ নয়, কানগুলোও বধির নয়, কিন্তু দেহের মধ্যে অবস্থিত কলবগুলো অন্ধ থাকার দরুনই চোখ এবং কানগুলো অন্ধ থাকার ভূমিকাটি পালন করে। এরা কানে শুনতে পায় বটে, কিন্তু রহস্যময় বিষয়গুলোর রহস্যের কথাগুলো শুনতে পায় না এবং চোখে পরিষ্কার দেখতে পেলেও কলবগুলির অন্ধত্বের দরুন রহস্যের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারে না।

৪৭. এবং (ওয়া) আপনাকে তাড়াতাড়ি (শীঘ্র) করিতে বলে (ইয়াস্তাজিলুনাকা) আজাবের সহিত (বিলআজাবি) এবং (ওয়া) কখনওই না (লান) ভঙ্গ করেন (ইউখলিফা) আল্লাহ (আল্লাহ) তাঁহার ওয়াদা (ওয়াদাহ) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) সেই দিন (ইয়াওমান) কাছে (ইন্দা) তোমার রবের (রাব্বিকা) এক হাজার (কাআলফি) বছর (সানাতিম) তাহা হইতে যাহা (মিম্মা) তোমরা গণনা করো (তাউদদুন)।

এবং আজাবের জন্য আপনাকে তাড়াহুড়া করিতে বলে এবং আল্লাহ তাঁহার ওয়াদা কখনওই ভঙ্গ করেন না এবং নিশ্চয়ই সেই দিনটি তোমার রবের নিকট যাহা তোমরা গণনা করো এক হাজার বছর।

এই আয়াতে আমাদেরকে তথা পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে এই বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, যে-আজাবের কথাটি তাড়াতাড়ি হচ্ছে না কেন বলে প্রশ্ন করাতে উত্তরটি সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : হে বিশ্বের মানবজাতি, তোমাদের গণনার এক হাজার বছর আল্লাহর গণনায় মাত্র একদিন। সুতরাং এই আজাবটি যে আস্তে আস্তে তোমাদেরকে আর্ফেপ্তে বেঁধে ফেলছে তারই নমুনা কি তোমরা দেখতে পাও না? পরিবেশ দূষণের উগ্রতাটি কি ধীরে ধীরে টের পাওয়া যাচ্ছে না? অবধারিত মৃত্যু নামক এইডস রোগটি কি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে না এবং ধীরে ধীরে অনেক লোককে গ্রাস করছে না? সুতরাং মানুষের গণনার হিসাবটি আর আল্লাহর গণনার হিসাবটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্যটি দেখতে পাই।

৪৮. এবং (ওয়া) কত (কাআইইম) হইতে (মিন) জনবসতি (কারইয়াতিন) আমি সুযোগ দিয়াছি (আমলাইতু) তাহাদেরকে (লাহা) এবং (ওয়া) তাহা (হিয়া) জালিম (জোয়ালিমাতুন) ইহার পর (সুম্মা) আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়াছি (আখাজ্জুহা) এবং (ওয়া) আমারই নিকট (ইলাইয়াল) ফিরিয়া আসিবে (প্রত্যাবর্তন করিবে) (মাসির)।

এবং আমি কত জনবসতি হইতে সুযোগ দিয়াছি তাহাদেরকে এবং তাহা জালিম (ছিল) ইহার পর আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়াছি এবং আমারই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে (প্রত্যাবর্তন)।

৪৯. বলিয়া দিন (কুল) হে (ইয়া আইউহান) মানুষেরা (নাসু) প্রকৃতপক্ষে (মূলতঃ) (ইন্নামা) আমি (আনা) তোমাদের জন্য (লাকুম) সাবধানকারী (সতর্ককারী) (নাজিরুম) অত্যন্ত স্পষ্ট (সুস্পষ্ট, স্পষ্ট) (মুবিন)।

বলিয়া দিন, হে মানুষেরা, প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট সাবধানকারী।

যেহেতু এই আয়াতটি সমস্ত মানবজাতিকে কেন্দ্র করে বলা হচ্ছে সেইহেতু সমগ্র মানবজাতির জন্য মহানবির অন্যান্য গুণগুলো না বলে কেবলমাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট সাবধানকারী বলা হয়েছে। এই আয়াতটি আমানু, মুসলমান, আলবাব, আফসার এবং মোমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয় নি, তাই কেবলমাত্র সুস্পষ্ট সাবধানকারী বলা হয়েছে। কারণ সমগ্র মানবজাতি মহানবির আসল রহস্যটা বুঝতে পারবে না এবং পারার কথা নয়। আমি জনতাকে যখন কিছু লক্ষ্য করে বলা হয় তখন সবচেয়ে সহজ-সরল বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তাই মহানবিকে এই আয়াতে কেবলমাত্র সুস্পষ্ট সাবধানকারী বলা হয়েছে। আমি জনতার পক্ষে গভীর রহস্যপূর্ণ মহানবির দর্শনগুলো বুঝবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ গরুর নাকে সুগন্ধীয় ফুল ধরলে জিভ বের করে খেয়ে ফেলবে, কারণ গরু সুগন্ধীর প্রশ্নে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

৫০. সুতরাং যাহারা (ফাল্লাজিনা) ইমান আনে (আমানু) এবং (ওয়া) কাজ করে (আমিলুস) ন্যায়পরায়ণতা (ন্যায় ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, পক্ষপাতহীনতা, নেকিগুলি, নিরপেক্ষতা, সংকল্প) (সালিহাতি) তাহাদের জন্য (লাহম) রুমা (মাগফিরাতু) এবং (ওয়া) রেজেক (জীবিকা) (রিজকুন) সম্মানজনক (কারিম)।

সুতরাং যাহারা ইমান আনে এবং আমলে সালেহা করে তাহাদের জন্য রুমা এবং সম্মানজনক রেজেক।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে যারা ইমান আনে এবং এই ইমান আনাটির বিষয়ে কতটুকু ব্যাপকতা আছে তাহা ধর্তব্য হবে কি না বুঝতে পারলাম না। এখানে গবেষকদের মাঝে বিস্তর মতভেদ আছে। বিশেষ করে ইমান আনার প্রশ্নে।

তারপর আরেকটি কথা আরও ব্যাপক, বিস্তৃত এবং অত্যন্ত গভীর আর সেই কথাটি হলো ‘আম্লেলুস সালিহাত’। এই ‘আম্লেলুস সালিহাত’ কথাটির ব্যাপকতা এতই বেশি এবং প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হিম্মসিম্ম খেতে হয়। যদি আম্লে সালেহা কথাটি দিয়ে সংকর্ম অথবা মহৎ কর্মকেই বোঝানো হয়ে থাকে তা হলে এখানেও একটি বিরাট প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। কারণ পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা ধর্মের প্রশ্নে উদাসীন অথবা সন্ধেহবাদী অথবা নাস্তিক অথবা ঘোর নাস্তিক ॥ তাদেরও তো অনেক সংকর্ম এবং মহৎকর্ম করার দৃষ্টান্তগুলো চোখের সামনে দেখতে পাই। তা হলে এই সংকর্ম এবং মহৎকর্মগুলিকে কেমন করে ‘আম্লে সালেহা’-র সত্যিকার অনুবাদ করা যায়? সুতরাং সব কিছু চিন্তা করে অবশেষে ‘আম্লে সালেহা’-র ইংরেজি এবং বাংলা অনুবাদটি করেও, সঠিক অনুবাদ হলো না বলে ‘আম্লে সালেহা’-কে অনুবাদেও ‘আম্লে সালেহা’-ই রাখতে বাধ্য হলাম। তারপরেও যদি কেহ পঁচাত্তর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে চায় তা হলে অধম লিখক ইহার অর্থটি জানি না বলে ঘোষণা করতে চাই। এরপর আসে সম্মানজনক ‘রেজেক’। ‘রেজেক’-এর অর্থ যদি জীবিকা অনুবাদ করি এবং ‘কারিম’-কে সম্মানজনক অনুবাদ করি তাতেও আমার কাছে মনে হয় অনুবাদটি সঠিক হলো না। অনেক সময় কোনো উপায় না দেখে এবং আরবি লোগাতসমূহ ও অনেক আরবি ডিকশনারি খুলেও মনঃপূত এবং নিরপেক্ষ না হলে অনুবাদেও ‘রেজেক’-এর অর্থ জীবিকা না লিখে ‘রেজেক’-ই লিখে ফেলি। এবং এই বিষয়েও যদি কেহ পঁচাত্তর প্রশ্ন তুলে ধরেন তা হলে ‘আমি জানি না’ উত্তরটি ভালো মনে করি। কারণ বাজারে প্রচলিত অনুবাদগুলো হতে আলাদা হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন

নিষে লিখে চলছি। সুতরাং পাঠকের কাছে একটু ব্যতিক্রম এবং খাপছাড়া বলে মনে হলে খুব বেশি একটা অবাক হবো না।

৫১. এবং (ওয়া) যাহারা (লাজিনা) চেষ্টা করে (সাআও) মধ্যে (ফি) আমাদের (আল্লাহ) আয়াতগুলির (আয়াতিনা) হয় (হীন, নীচ) করিয়া দেখিতে (মোয়াজ্জিনা) ওই সকল (উলাইকা) অধিবাসী (সঙ্গী) হইবে (আস্হাবু) দোজখের (জাহিম)।

এবং যাহারা চেষ্টা করে আমাদের আয়াতগুলির মধ্যে হয় করিয়া দেখাইতে ওই সকল (লোক) অধিবাসী হইবে দোজখের।

এই আয়াতটির অর্থটি মনে হবে খুবই সহজ, আসলে তা মোটেই নয়। কারণ কালি-কাগজের উপর কোরান-এর বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয় এবং ইহা অবশ্যই আয়াত। হাকিকি কোরান যেমন নূর, তেমনি তার আয়াতগুলিও অখণ্ড নূরেরই অংশ। সুতরাং এই অখণ্ড নূরী কোরান-এর যে কোনো নূরী অংশটি তথা হাকিকি আয়াতটিকে যারা অবহেলা করে, যারা হীন প্রতিপন্ন করতে চায়, শ্বেষ দিয়ে হয় প্রতিপন্ন করে – তাদের স্থান তো নিচেই থাকার কথা। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ওইসব লোকেরা দোজখের অধিবাসী হবে।

৫২. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) পাঠাইয়াছি (আরসালনা) হইতে (মিন) আপনার আগে (কাবলিকা) হইতে (মিন) রসুলকে (রাসুলিউ) এবং (ওয়া) না (লা) নবিকে (নাবিয়ান) একমাত্র (ইল্লা) যখন (ইজা) আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে (তামান্না) নিক্ষেপ করিয়াছে (ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, ঢালিয়া দিয়াছে, সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে) (আল্কা) শয়তান (শাইতানু) মধ্যে (ফি) তাহার আকাঙ্ক্ষার (উম্মনিইয়াতিহি) সুতরাং বিদূরীত (দূর) করিয়াছেন (ফাইয়ান্সাখু) আল্লাহ

(আল্লাহ) যাহা (মা) নিক্ষেপ করে (উল্কি) শয়তান (শাইতানু) ইহার পর (সুম্মা) অত্যন্ত দৃঢ় করেন (ইউহকিমু) আল্লাহ (আল্লাহ) তাঁহার আয়াতকে (আয়াতিহি) এবং (ওয়া) আল্লাহ (আল্লাহ) সব কিছু জানেন (আলিমুন) বিজ্ঞানময় (হাকিমুন)।

এবং আপনার পূর্ব হইতে কোনো রসূল হইতে এবং না কোনো নবিকে আমরা (আল্লাহ) পাঠাই নাই একমাত্র যখন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে সুতরাং আল্লাহ দূর করিয়াছেন যাহা শয়তান নিক্ষেপ করিয়াছিল ইহার পর আল্লাহ তাঁহার আয়াতকে অত্যন্ত দৃঢ় করেন এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন, বিজ্ঞানময়।

এই আয়াতে শয়তান যে নবি-রসূলদের আকাঙ্ক্ষার উপরেও কখনও কখনও শয়তানের রঙ-রূপ নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাহা দূর করে দিচ্ছেন ॥ যদিও নবি-রসূলদের যে কোনো আকাঙ্ক্ষাই মহাপবিত্র এবং শয়তান কোনো কিছুই নিক্ষেপ করতে পারে না ॥ সেই কথাটি আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। কারণ নবি-রসূলেরা শয়তানকে প্রথমেই মুসলমান বানিয়ে ফেলেছেন এবং এই মুসলমান বানিয়ে ফেলাটাকেই অন্য ভাষায় বলা হয় শয়তানকে দূর করে দেওয়া। সুতরাং শয়তান নবি-রসূলদের চাওয়া-পাওয়ার উপর কোনো প্রকার সামান্যতম ছলনাও নিক্ষেপ করতে পারে না। ইহাই আল্লাহ প্রকাশ্যে এই আয়াতে ঘোষণা করেছেন এবং সর্বশেষে এই কথাটিও বলেছেন যে আল্লাহ জ্ঞানময় তথা সব কিছু জানেন এবং বিজ্ঞানময় তথা হেকমতওয়ালা।

৫৩. এই জন্য তিনি বানাইয়া দেন (লিইয়াজ্জালা) যাহা (মা) নিক্ষেপ করে (ইউল্কি) শয়তান (শাইতানু) ফিৎনা (ফিত্নাতান) যাহাদের জন্য (লিল্লাজিনা) মধ্যে (ফি) যাহাদের কলবগুলিতে (কুলুবিহিম) রোগ (মারাজুন) এবং (ওয়া) পাথর

(পাষাণ, প্রস্তর) (কাসিয়াতি) তাহাদের কলবগুলি (কুলুবুহম) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইননা) জ্বালেমেরা (জোয়ালিমিনা) অবশ্যই ক্বেরে (লাফি) বিরোধিতার (শিকাতিম) বহুদূরে (বাইদ্দিন)।

এই জন্য তিনি বানাইয়া দেন শয়তান যাহা নিক্ষেপ করে (উহা) ফিৎনা তাহাদের জন্য যাহাদের কলবগুলির মধ্যে রোগ (আছে) এবং তাহাদের কলবগুলি পাথর এবং নিশ্চয়ই জ্বালেমেরা বিরোধিতার ক্বেরে অবশ্যই বহুদূরে।

এই আয়াতে শয়তান যে ফিৎনা নিক্ষেপ করে সেই ফিৎনা তাদেরই জন্য যাদের কলবগুলিতে রোগ আছে এবং যাদের কলবগুলি পাষাণ-পাথরের মতো শক্ত এবং যারা জালিম তারা এই সত্য উপলক্ষের প্রশ্নে বহু দূরে অবস্থান করে, কারণ শয়তান তার অনেক রকম ফিৎনার মোহ দেখিয়ে জালিমদেরকে বিভ্রান্ত হতে বিভ্রান্তির অতলে তলিয়ে দেয় এবং সত্য হতে বহুদূরে তখন অবস্থান করে এবং সত্যের বিরোধিতা করাটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় স্বাভাবিক – কারণ সত্যের ছিটাকোঁটাও এই জালিমদের নাগালে আর অবস্থান করে না। এই আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো, শয়তানের ফিৎনাগুলো অন্তরের মধ্যেই উদ্ভিত হবার কথাটি বলা হয়েছে। কারণ শয়তান অন্তরের বাহিরে অবস্থান করে না এবং অন্তরের বাহিরে অবস্থান করার বিধানটি আল্লাহ-কর্তৃক দেওয়া হয় নি। শয়তান এবং তার ফিৎনাগুলি একমাত্র দুইটি স্থানেই অবস্থান করে : একটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর বিহনে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে শয়তানের অবস্থান করার আর কোনো জায়গা নাই।

৫৪. এবং (ওয়া) জানিবার জন্য (লিআলামা) যাহারা (আল্লাজিনা) আতা করিয়াছে (দেওয়া হইয়াছে) (উতুল) জ্ঞান (ইল্মা) যেন তাহা (আন্নাহ) সত্য

(হাক্কু) হইতে (মিন) তোমার রবের (রাব্বিকা) সুতরাং তাহারা ইমান আনে (ফাইউমিনু) তাহার উপর (বিহি) সুতরাং অবনত করানো হইয়াছে এমন (ফাতুখ্বিতা) তাহার জন্য (লাহ) তাহাদের কলবগুলি (কুলুবুহম) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) পথ দেখায় (লাহাদি) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আমানু) দিকে (ইলা) পথের (সিরাতিম) সঠিক (মুস্তাকিম)।

এবং যাহাদেরকে জ্ঞানদান করা হইয়াছে (তাহারা) যেন জানে যে তাহা সত্য তোমার রবের নিকট হইতে সুতরাং তাহারা ইমান আনে তাঁহার উপর। সুতরাং নত করা হয় তাহার জন্য তাহাদের কলবগুলি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পথ দেখান যাহারা ইমান আনিয়াছে সঠিক পথের দিকে।

এই আয়াতে জ্ঞানদান করার কথাটি বলা হয়েছে তাই যারা জ্ঞানদান করার ভাগ্যটি অর্জন করেছে তারা রব তথা প্রতিপালকের উপর ইমান আনে এবং তাদের উদ্ধৃত কলবগুলিকে ইমানের পরশে নত করে দেওয়া হয় এবং তখনই আল্লাহ পথ দেখান তথা সত্যের পথে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তখনই সব রকম ভুল পথগুলো হতে সঠিক পথটির সন্ধান মেলে। এখানে ‘মুস্তাকিম’ শব্দটির অর্থ অনেকেই ‘সরল’ করেন কিন্তু ‘সরল পথ’ আর ‘সঠিক পথ’-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সরল-সোজা পথটি মনে হয় খুবই একটি সহজ পথ, কিন্তু সহজ পথেই এগিয়ে যাবার কথাটি এখানে বলা হয় নি, বরং যে-পথে অগ্রসর হলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় সেই পথ যদি বন্ধুর এবং দুর্গমপথ হয় তবু সেটাই সঠিক পথ। সঠিক পথ দিয়েই দুনিয়ার দৃষ্টিতে মানুষ তার নিজস্ব ঠিকানায় এগিয়ে চলে। সেই সঠিক পথটি বন্ধুরই হোক অথবা দুর্গমই হোক অথবা এবড়ো-খেবড়োই হোক – সেই পথ দিয়েই মানুষ তার সঠিক গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারে।

অন্যথায় যত সহজ-সরল পিচঢালা মসৃণ পথই হোক না কেন, সেই পথ যদি গন্তব্যস্থানের দিকনির্দেশনা না দেয়, তবে উহা কখনওই সঠিক পথ নয়। সেই পথ যতই সরল-সহজ হোক না কেন, যতই মসৃণ পিচঢালা পথ হোক না কেন – সেই পথের কোনো প্রয়োজন নাই। অনেক অনুবাদক মনের অজান্তে ‘সরল পথ’ লিখে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন, কিন্তু উহা মোটেই ঠিক নয়। তারপর অনুবাদক ‘যারা ইম্মান আনে’ তথা ‘আম্মানু’দেরকে অনুমানে একলাফে ‘মোমিন’ বানিয়ে ছাড়ে। ‘আম্মানু’ আর ‘মোমিন’-এর মাঝে যে বিরাট পার্থক্য, অনুবাদক মনের অজান্তে সেই কথাটি ভুলে যায়। এই ভুলে যাবার কথাটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলতে হচ্ছে যে অন্যত্র ইম্মানদারকে আবার ইম্মান আনার কথাটি বলা হয়েছে। যিনি ইম্মান এনেছেন তাঁকে কেন পুনরায় ইম্মান আনার কথাটি বলা হলো? এই কথাটির সামান্য গবেষণা করলেই মনের অজান্তের এই ভুলটুকু সংশোধন করে নেওয়া যায়।

৫৫. এবং (ওয়া) না (লা) বিরত হইবে (ক্লান্ত হইবে, নিবৃত্ত হইবে, নিরস্ত হইবে) (ইয়াজালু) যাহারা (লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) মধ্যে (ফি) সন্ধেহের (সংশয়ের, সত্যতা নির্ণয়ে অনিশ্চয়তার) (মিরইয়াতিম্) তাহা হইতে (মিন্হ) যতরূপ না (হাত্তা) তাহাদের (কাছে) আসিয়া পড়িবে (তাতিয়াহম্মু) সাআত (সাআতু) হঠাৎ করিয়া (সহসা, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে, পূর্বে কোনো বিবেচনা না করিয়া) (বাগ্‌তাতান) অথবা (আও) তাহাদের (কাছে) আসিবে (ইয়াতিইয়াহম্ম) আজাব (আজাবু) দিনে (ইয়াওমিন্) খারাপ (মন্দ, নিকৃষ্ট, দুর্দশাগ্রস্ত, অশুভ) (আকিমিন্)।

এবং বিরত হইবে না যাহারা সন্দেহের মধ্যে কুফরি করিয়াছে যতক্ষণ না তাহা হইতে তাহাদের (কাছে) আসিয়া পড়িবে হঠাৎ করিয়া সাত্মাত অথবা খারাপ দিনে আজাব তাহাদের (কাছে) আসিবে।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে সন্দেহ নামক কুফরি করা হয় তাহা হতে আর বিরত রাখা যায় না। সুতরাং এটুকু বলা যেতে পারে যে, সন্দেহের পেট্টেই কুফরির জন্ম হয়, আবার এই সন্দেহই সঠিক পথে সত্যকে আলিঙ্গন করার প্রেরণা যোগায়। যদি সন্দেহটি মন্দ হয়ে থাকে তা হলে কুফরি হতে বিরত করা যায় না। পক্ষান্তরে সন্দেহটি যদি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় তা হলে এই সন্দেহ মজিল-এ মকসুদে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে। অনেকটা কসাইয়ের ছুরি আর সার্জনের ছুরির মতো। দুটো ছুরিই একই ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। অথচ নিয়তের ভিন্নতায় সার্জন অপারেশন করে জীবন রক্ষা করার তরে প্রাণপণ চেষ্টা চালান, যদিও হায়াত-মউত আল্লাহরই হাতে, তবু নিয়তের মহত্বই এখানে ফুটে ওঠে। কিন্তু পক্ষান্তরে কসাইয়ের ছুরি গলা কেটে গোশত বিক্রি করে। ধাতব পদার্থ একই, অথচ নিয়তের ভিন্নতায় কত তফাৎ! এই আয়াতে ‘কেয়ামত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি, বরং ব্যবহার করা হয়েছে ‘সাত্মাত’। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু সাত্মাত শব্দটি এ জন্যই ব্যবহার করেছেন যে একটি মানুষের মৃত্যু-ঘটনাটিও একটি ছোট কেয়ামত। তাই এই ছোট কেয়ামতটিকে আল্লাহ সাত্মাত বলেছেন। ব্যক্তির মৃত্যুই যে সাত্মাত তারপরেই বলা হয়েছে, খারাপ দিনের আজাব তথা যে-দিন ব্যক্তির জীবনে মৃত্যু নামক ঘটনাটি ঘটবে উহাকেই বলা হয়েছে খারাপ দিন। কাফেরদের জন্য যে আল্লাহপ্রদত্ত শাস্তিটি অবধারিত ইহাও এই আয়াতে বলা হয়েছে।

৫৬. একমাত্র মালিকানা (আধিপত্য, বাদশাহী, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব) (আলমুলকু) সেই দিন (ইয়াওমা) আল্লাহর জন্যই হইবে (ইজিল্লিল্লাহি) তিনি বিচার করিয়া দিবেন (ইয়াহকুমু) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহম) সুতরাং যাহারা (ফাল্লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আমানু) এবং (ওয়া) কাজ করিয়াছে (আমিলুস) সালেহার (সালিহাতি) মধ্যে (ফি) জ্ঞানাতগুলির (জান্নাতি) নেয়ামতে পরিপূর্ণ (নাঈম)।

একমাত্র মালিকানা সেই দিন আল্লাহরই হইবে তাহাদের মধ্যে তিনি বিচার করিয়া দিবেন, সুতরাং যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সালেহার কাজ করিয়াছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জ্ঞানাতগুলির মধ্যে (তাহারা থাকিবে)।

র যদিও এই আয়াতে বলা হয়েছে সেদিনের মালিকানা আল্লাহরই হবে, কিন্তু হাকিকতে তথা সত্য বলতে কি, সব সময়ে সর্বাবস্থায় সব কিছুর মালিকানা আল্লাহরই হাতে আছে। কিন্তু সেই সময়ের অথবা সেই দিনের মালিকানাটি একমাত্র আল্লাহরই হবে বলার মাঝে এ কথাটিই বোঝানো হয়েছে যে, মানুষের প্রবৃত্তি হতে নির্গত কাল্পনিক কথাগুলো তথা প্রবৃত্তির চিল্লাচিল্লি আর থাকবে না। তাই সেই দিনটিরও মালিকানার কথাটি বলা হয়েছে। এখানে সেই দিনটি বলতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? মৃত্যু-নামক ঘটনাটি যখন ঘটে যাবে। কারণ মৃত্যু-ঘটনাটি ঘটবার আগে মানুষকে আল্লাহ সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দিয়েছেন, কিন্তু মৃত্যু-ঘটনাটি ঘটে যাবার পর সেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটিরও সমাপ্তি ঘটে। তাই প্রতিটি মৃত্যু-ঘটনা এক-একটি সাত্মাত, যাকে মৃত্যু নামক ঘটনার কেয়ামত বলা হয়। সুতরাং সেই দিন আল্লাহ সব কিছুর ফয়সালা করে দিবেন। তাই যারা ইমান এনেছে এবং আমলে সালেহার কাজ করেছে, তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জ্ঞানাতগুলির মধ্যে যে অবস্থান করবে, তারই সুসংবাদটি দেওয়া হয়েছে।

৫৭. এবং (ওয়া) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি করে (কাফার) এবং (ওয়া) মিথ্যারোপ করে (কাজ্জাবু) আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলির সহিত (বিআইয়াতিনা) সুতরাং ওইসব মানুষ (ফাউলাইকা) তাহাদের জন্য (লাহম) শাস্তি (আজাবুম) মানহানিকর (অপমানকর, লাঞ্ছনাদায়ক, ভর্ৎসনাদায়ক, নিন্দাজনক, উৎপীড়নমূলক) (মুহিনু)।

এবং যাহারা কুফরি করে এবং আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলির উপর মিথ্যারোপ করে সুতরাং ওইসব মানুষ তাহাদের জন্য মানহানিকর আজাব (রহিয়াছে)।

এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে, যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর আয়াতগুলির উপরে মিথ্যারোপ করে তাদেরকেই শাস্তির বারতা শোনানো হয়েছে। যারা কেবলমাত্র আপন প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এবং আপন প্রবৃত্তির খেয়ালখুশিতে ডুবে আছে এবং আল্লাহর কোনো আদেশ-নিষেধই শোনে না তারাই প্রতিনিয়ত কুফরি করে চলছে। মুখে কুফরির কথা বললেই কুফরি হয় না, বরং প্রতিটি কাজকর্মের মাঝে ফুটে ওঠে তৌহিদ অথবা কুফরি। এই তৌহিদ এবং কুফরি বোঝাটাও সাদা চোখে অনেক কষ্টকর, কারণ বাহির দেখে ভেতরটা যাচাই করা খুবই কঠিন। কেউ যদি সাধু সাজে তা হলে সবার চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু আসল সাধু যারা তাদেরকে কেমন করে ধরতে পারা যায়? কারণ আসল সাধু সাধু সেজেও বসে থাকে, আবার সাধু না-সেজেও বসে থাকে। সুতরাং মোটা দৃষ্টি দিয়ে দেখা এবং মুখে মুখে কুফরির কথাটি বললেই কুফরি হয় না। ধরুন, একজন মানুষ এতিমের হক আত্মসাৎ করলো এবং পূর্ণ সুন্নতি লেবাসে নামাজ আদায় করলো। সুন্নতি লেবাসটি এবং নামাজ আদায়ের বিষয়টি সহজেই চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু

এতিম্নের মাল আত্মসাৎ করার বিষয়টি জানা না থাকলে কেমন করে ধরা পড়বে? একটা মানুষ যদি এতিম্নের মাল আত্মসাৎ করে তা হলে সেই মানুষটি কুফরি করার চেয়েও ভয়ংকর কাজটি করে ফেলে। কারণ যারা এতিম্নের মাল আত্মসাৎ করে তারা বিসমিল্লাতেই ইসলাম হতে বিনা শর্তে বাতিল হয়ে যায়। তাই সূরা মাউন-এ বলা হয়েছে, যারা এতিম্নদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা প্রথমেরই ইসলাম ধর্ম হতে বহির্ভূত তথা বাদ। কোরান মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা বলেছে, কিন্তু এতিম্নের মাল আত্মসাৎ করাটি যে মুখ ফেরানো হতে কোটি গুণে ভয়ংকর তা কি সবাই বুঝতে পারে? তারপরে বলা হয়েছে, আল্লাহর আয়াতগুলির উপরে যারা মিথ্যারোপ করে। এই আয়াত কি কালিতে ছাপানো কাগজের উপরে লেখা আয়াত, নাকি চলার পথে প্রতিটি ক্বেরে আল্লাহর আদেশগুলো পালন করা? একটি বিষয়ের সঙ্গে অপর একটি বিষয়ের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় প্রতিটি ক্বেরে। ধরুন, বলা হয়েছে বেহেশতের চাবি হলো নামাজ, কিন্তু এটুকু বলেই বিষয়টুকু শেষ করে দেওয়া হয় নি, বরং নামাজের সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেই শর্তটি পালন না করা পর্যন্ত নামাজ হয় না এবং নামাজ না হলে বেহেশতে যাওয়া যায় না ॥ নামাজের সেই শর্তটির নাম হলো ‘তাহারত’ তথা পবিত্রতা। এই পবিত্রতা বলতে কী বোঝায়? মনের পবিত্রতাই এখানে আসল পবিত্রতা এবং বাহিরের পবিত্রতা এখানে ম্লেজাজি পবিত্রতা। ভেতরের পবিত্রতা নাই, কিন্তু ম্লেজাজি পবিত্রতায় পরিপূর্ণ তা হলে কি এটাকে ‘তাহারত’ তথা পবিত্রতা বলা চলে? তাই ‘তাহারত’ তথা পবিত্রতা হলো নামাজের প্রথম এবং শেষ শর্ত এবং তারপরেই বেহেশতের চাবি হতে পারে নামাজ। সুতরাং প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখে, না গবেষণা করে সহসা একটি সিদ্ধান্ত টানা বোকামিরই লক্ষণ।

৫৮. এবং (ওয়া) যাহারা (আল্লাজিনা) ইজ্জত করিয়াছে (হাজ্জারু) মধ্যে (ফি) পথে (সাবিলি) আল্লাহর (আল্লাহি) ইহার পর (সুম্মা) কতল করা হইয়াছে (নিহত হইয়াছে) (কুতিলু) অথবা (আও) মারা গিয়াছে (মাতু) অবশ্যই তাহাদেরকে রেজেক দিবেন (লাইয়ারজুকান্নাহম) আল্লাহ (আল্লাহ) রেজেক (রিজকান) সুন্দর (উত্তম, উৎকৃষ্ট) (হাসানান) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) তিনি অবশ্যই (লাহয়া) উত্তম (অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) (খাইরু) রেজেকদাতাদের (রাজিকিন)।

এবং হিজরত করিয়াছে যাহারা আল্লাহর পথের মধ্যে ইহার পর খুন হইয়াছে (নিহত হইয়াছে) অথবা (স্বাভাবিক) মারা গিয়াছে অবশ্যই আল্লাহ তাহাদেরকে রেজেক দিবেন, সুন্দর রেজেক এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই তিনি রেজেকদাতাদের উত্তম।

এই আয়াতে যারা হিজরত করেছেন তথা বাহির হয়েছেন অথবা ত্যাগ করেছেন অথবা পলায়ন করেছেন আল্লাহর পথের মধ্যে, তাদেরই কথা বলা হয়েছে। এখানে হিজরত বলতে যে ত্যাগ করার কথাটি বলা হয়েছে সেই হিজরতটি কেমন হতে হবে এবং কোথা হতে হিজরত করতে হবে, এর উত্তরটি এভাবে দেওয়া হয়েছে যে ‘আল্লাহর পথের মধ্যে।’ এখানে ‘আল্লাহর পথের মধ্যে’ বলতেই বা কী বোঝানো হয়েছে? ইহার ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাখ্যাটি অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর পথের মধ্যে যারা হিজরত করেন অর্থাৎ যারা আপন নফস তথা জীবাত্মা হতে খান্নাসরূপী শয়তানের প্ররোচনামগ্নিত প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হবার ধ্যানসাধনায় রত আছেন এবং আল্লাহকে পাবার পথে আপন নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়াবার ধ্যানসাধনায় মশগুল হয়ে আছেন এবং এই অবস্থায় যদি খুন হয়ে যান

তথা নিহত হয়ে যান অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন তা হলেও তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই রেজেক দান করবেন। আবার প্রশ্ন এসে যায়, নিহত এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করা মানুষের জন্য যে রেজেকটি দেওয়া হবে উহা কি খাদ্যজাতীয় রেজেক নাকি খাদ্যবিহনে অন্য কোনো ধরনের বিশেষ এবং অবাক-করা রেজেক, যাহা আল্লাহর ওলিরা ছাড়া অন্যদের জানা নাই? কারণ রেজেক বলতে যদি খাদ্য-পানীয় বলে এখানে ধরে নিই, তা হলে নিহত এবং মৃত্যুবরণ করা মানুষটি কী করে খাদ্য গ্রহণ করবে? কারণ মরা মানুষের পক্ষে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাই রেজেক মৃত মানুষের জন্য নয়, বরং জীবিতদের জন্য। এই রেজেকের বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহর ওলিরাই জানেন। সাধারণ মানুষ এবং ধর্মগবেষকদের পক্ষেও এই রেজেক বিষয়টির রহস্য জানা মোটেও সম্ভবপর নয়। অনুমানের গুলতানি এবং মনগড়া প্যাচমারা অনেক রকম কথা তুলে ধরা যায়, কিন্তু এই রকম রেজেকের রহস্যটি একমাত্র আল্লাহর ওলিরা ছাড়া অন্য যে কোনো মানুষের পক্ষে বোঝাটা অসম্ভব। তাই এই আয়াতে এই রেজেকটি যে একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী রেজেক তাহাও বলে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে ‘রিজ্কান্ হাসানান্’ তথা সুন্দর রেজেক। আবার আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি যত রকম রেজেকই দেন না কেন, কিন্তু এই বিষয়ে যে রেজেকটি দেওয়া হয় উহা উত্তম।

৫৯. অবশ্যই তিনি দাখিল করাইবেন তাহাদেরকে (লাইউদখিলান্নাহম) দাখিলের স্থানে (মুদখালাই) তাহাতে তাহারা খুশি (তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, পছন্দ) হইবে (ইয়ারদাওনাহ) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) অবশ্যই সব কিছু জানেন (লাআলিমুন) অত্যন্ত ধৈর্যশীল (পরম সহনশীল) (হালিম)।

অবশ্যই তিনি দাখিল করিবেন তাহাদেরকে দাখিলের স্থানে, তাহাতে তাহারা খুশি হইবে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই সব কিছু জানেন, অত্যন্ত ধৈর্যশীল।

এই আয়াতের এই বিষয়টি সাধারণ মানুষ এবং ধর্ম-গবেষকদের সম্পূর্ণ জ্ঞানবহির্ভূত কথা। কারণ যারা আল্লাহর পথের মধ্যে হিজরত করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন অথবা মারা গিয়েছেন তাদের খুশি হবার কথাটি এই আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং তারা যে স্থানে তাদেরকে দাখিল করা হবে সেই বিষয়ে তারা খুশি হবেন অথবা সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং এই আয়াতটিতে রহস্যলোকে প্রবেশ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তাদেরই জন্য যারা আপন নফসের ভেতরে অবস্থান করা খাল্লাসটি হতে মুক্তি পাবার আশায় ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় বিরাট ধৈর্যধারণ করে দিনের পর দিন ধ্যানসাধনায় রত থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা নিহত হয়েছেন। তাদেরই জন্য এই আয়াতে আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাই সর্বশেষে আল্লাহ বলছেন যে তিনি সব কিছু জানেন এবং বিরাট ধৈর্যশালী। এই বিরাট ধৈর্যশীল আল্লাহ পাকের গুণে যদি কেহ গুণাবিত হতে চায় তা হলে তাকেও ধৈর্যশীল হতে হবে এবং আল্লাহর পথের মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহর রহমত কামনা করতে হবে।

৬০. ওইটা (জালিকা) এবং (ওয়া) যে (মান) প্রতিশোধ লইবে (আকাবা) মিসালের সহিত (বিমিসলি) যাহা (মা) নিপীড়ন করা হইয়াছে (উকিবা) তাহার প্রতি (বিহি) ইহার পর (সুম্মা) বাড়াবাড়ি (অতিরিক্ত) করা হইয়াছে (বুগিয়া) তাহার উপর (আলাইহি) অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন (লাইয়ান্সুরান্নাহ) আল্লাহ (আল্লাহ) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) অবশ্যই কলুষ (পাপ)-মোচনকারী (লাআফুয়ান) গফুর (ক্লমাশীল) (গাফুর)।

ওইটা এবং যে সমতুল্য প্রতিশোধ লইবে যাহা তাহার প্রতি নিপীড়ন (উৎপীড়ন, নিগ্রহ, কষ্টদান, দলন) করা হইয়াছে ইহার পর তাহার উপর বাড়াবাড়ি (আতিশয্য, আধিক্য, সীমালঙ্ঘন) আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই কলুষমোচনকারী, ক্লমাশীল।

৬১. ওইটা (জালিকা) এই জন্য যে (বিআননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) ভিতরে গমন করান (প্রবেশ করান) (ইউলিজু) রাত্রিকে (রজনীকে, যামিনীকে) (লাইলা) মধ্যে (ফি) দিনের (নাহারি) এবং (ওয়া) প্রবেশ করান (ইউলিজু) দিনকে (নাহারা) মধ্যে (ফি) রাতের (লাইলি) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) শোনে (সামিউন) দেখেন (বাসিরুন)।

ওইটা এই জন্য যে আল্লাহ প্রবেশ করান রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং প্রবেশ করান দিনকে রাত্রির মধ্যে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শোনে, দেখেন।

৬২. ওইটা (জালিকা) এই জন্য যে (বিআননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) একমাত্র তিনিই (হয়াল) সত্য (হাক্কু) এবং (ওয়া) যে (আননা) যাহা (মা) তাহারা ডাকে (ইয়াদউনা) হইতে (মিন্) তাহাকে ছাড়া (দুনিহি) তাহা (হয়াল) বাতিল (বাতিলু) এবং (ওয়া) যে (আননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) একমাত্র তিনিই (হয়াল) উঁচু (আলিউল) একমাত্র বড় (কাবির)।

ওইটা এই জন্যই যে তিনি আল্লাহ একমাত্র সত্য এবং যে যাহা তাহারা ডাকে তাহাকে ছাড়া তাহা বাতিল এবং যে আল্লাহ একমাত্র তিনিই উঁচু, একমাত্র বড়।

এই আয়াতে ‘মিন্’ তথা হইতে শব্দটিকে বাক্যের মধ্যে আনতে পারলাম না। তাই পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখলাম এ জন্য যে হবহ অনুবাদ করতে গেলে খুব

কষ্ট এবং পরিশ্রম করতে হয়, তারপরেও ‘মিন্’ শব্দটিকে বাক্যের কোথাও মিলিয়ে নিতে পারলাম না এ জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

৬৩. আপনি কি দেখেন না (আলাম্‌তারা) যে (আননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) নাজেল করেন (বর্ষণ করেন) (আনজালা) হইতে (মিন্) আকাশ (সাম্মায়ি) পানি (মায়ান্) সুতরাং হইয়া উঠে (ফাতুস্বিহ) মাটি (জমিন, দেহ, পৃথিবী) (আরদু) সবুজশ্যামল (মুখদোররাতান্) নিশ্চয়ই (ইন্ননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শনকারী (সুন্‌দর্শী) (লাতিফুন্) সম্যক্ অবহিত (খুব ভালো জানেন, পরিজ্ঞাত) (খাবির)।

আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ্ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন পানি, সুতরাং মাটি সবুজ-শ্যামল হইয়া ওঠে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শনকারী, সম্যক অবহিত।

৬৪. তাঁহারই (আল্লাহ্‌র) জন্য (লাহ) যাহা কিছু (মা) মধ্যে (ফি) আকাশগুলি (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়া) যাহা কিছু (মা) মধ্যে (ফি) মাটিতে (জমিনে, পৃথিবীতে, দেহে) (আরদি) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্ননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) অবশ্যই তিনি (লাহয়া) ধনী (অভাবমুক্ত) (গানি) একমাত্র প্রশংসিত (হাম্বিদ্)।

তাঁহারই জন্য জমিনের মধ্যে যাহা এবং আকাশগুলির মধ্যে যাহা (আছে) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই ধনী, একমাত্র প্রশংসিত।

৬৫. আপনি কি দেখেন নাই (আলাম্‌তারা) যে (আন) আল্লাহ (আল্লাহা) অধীন (আয়ত্ত, বশীভূত, আশ্রিত, বাধ্য, অস্ত্রভূক্ত) করিয়া দিয়াছেন (সাখ্‌খারা) তোমাদের জন্য (লাকুম্) যাহা (মা) মধ্যে (ফি) মাটিতে (জমিনে, পৃথিবীতে, দেহে) (আরদি) এবং (ওয়া) নৌকাগুলি (ফুল্‌কা) চলাচল করে (তাজ্‌রি) মধ্যে

(ফি) সাগরে (সমুদ্রে) (বাহরি) তাহার হকুমে (বিআমরিহ) এবং (ওয়া) তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন (ইউমসিকুস) আকাশকে (সাম্মাতা) যে (আন) পতিত হয় (তাকাতা) উপর (আলা) মাটিতে (পৃথিবীতে, জমিনে, দেহে) (আরদি) একমাত্র (ইল্লা) তাহার হকুমে (বিইজ্জনিহি) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) মানুষের সহিত (বিন্নাসি) করুণাশীল (দয়ার্দ্দে, দয়াপরবশ) (লারাউফুর) পরম দয়ালু (দয়াবান, মেহেরবান) (রাহিম)।

আপনি কি দেখেন নাই যে আল্লাহ জমিনের মধ্যে যাহা (আছে) তোমাদের জন্য অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই হকুমে সাগরের মধ্যে নৌকাগুলি চলাচল করে এবং আকাশকে তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন জমিনের উপর পতিত (না) হয় একমাত্র তাঁহার হকুম (ছাড়া) নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষদের উপর করুণাশীল, রহিম।

এ আয়াতে একটি স্থানে আসমান পতিত হওয়াটিকে অনেক তফসিরকারকই ‘বৃষ্টি পড়া’ বলেছেন এবং বিশ্ববিখ্যাত কোরান-এর তফসির-লিখক হজরত আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি দ্য হোলি কোরান নামক ইংরেজি ভাষায় রচিত তফসিরেও আকাশ হতে বৃষ্টি পড়ার কথাটি বলেছেন। অধম লিখকেরও মনে হয়, ইহাই সঠিক, কিন্তু যেহেতু হবহ অনুবাদ করতে হচ্ছে তাই নিরুপায় হয়ে আকাশ হতে বৃষ্টি পড়ার কথাটি লিখতে পারলাম না।

৬৬. এবং (ওয়া) তিনিই (হয়াল) যিনি (লাজি) জীবন দিয়াছেন (আহইয়া) তোমাদেরকে (কুম) ইহার পর (সুম্মা) মৃত্যু দিবেন (ইউমিতু) তোমাদেরকে (কুম) ইহার পর (সুম্মা) তোমাদের পুনরায় জীবিত করিবেন (ইউহইকুম) নিশ্চয়ই (ইন্না) মানুষ (ইন্সানা) অবশ্যই বড় অকৃতজ্ঞ (লাকাফুর)।

এবং তিনিই যিনি জীবন দিয়াছেন তোমাদেরকে ইহার পর তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন ইহার পর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করিবেন, নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই বড় অকৃতজ্ঞ।

র এই আয়াতটিকে পুনর্জন্মবাদের একটি নির্ভেজাল স্পষ্ট দলিল বলে মনে করতে চাই। কারণ ‘সাত্বাত’ নামক কেয়ামতটি মৃত্যু-ঘটনা ঘটান পরপরই পুনরায় জীবিত করা হবে, এই কথাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সার্বিক কেয়ামতের ঘটনাটি ঘটবার আগের কথাটি বলা হয়ে থাকে। ‘সাত্বাত’ নামক মৃত্যু-ঘটনাটি ঘটবার পরপরই যে পুনরায় জীবিত করা হবে ইহাই এই আয়াতের আসল কথা। কিন্তু অন্যান্য ধর্মদর্শনের সঙ্গে মিলে যায় বলে ইহাকে নানা রকম যুক্তিতর্ক দাঁড় করিয়ে পুনরায় জীবন দান করার কথাটিকে সার্বিক কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা বলা হয়ে থাকে। আসলে ইহা মোটেই সঠিক বলে মনে করতে চাই না। কারণ আল্লাহর সৃষ্টিজগত আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, এই সৃষ্টিজগতের বয়স কম-সে-কম সাড়ে তিন হাজার কোটি বছর হবে। এই সাড়ে তিন হাজার কোটি বছরেও সার্বিক কেয়ামতের ঘটনা আমরা দেখতে পাই নি, অথচ সাত্বাত নামক মৃত্যু-ঘটনার কেয়ামতটিকে মনের অজান্তে সার্বিক কেয়ামতের সামনে এনে সবাইকে তথা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সবগুলো মানুষকে একত্রিত করে উঠানোর কথাটি বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মে পুনর্জন্মবাদের কথাটি বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু অনেক গবেষক এই পুনর্জন্মবাদটিকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। আজ যে সকল গবেষক রাজি হচ্ছে না তারাই যদি পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ধর্মে জন্মগ্রহণ করতো এবং ধর্ম-বিষয়ের উপর গবেষণা চালাতো তা হলে তাদের অবস্থানটি কেমন হতো? তাহলে পুনর্জন্মবাদে

বিশ্বাসী ধর্মে জন্মগ্রহণ করাটাই কি একটি আজন্ম মহাপাপ বলে ধরে নেব? আল্লাহ কোরান-এ, আমাদের জানা মতে, আটবার আটস্থানে বলেছেন যে, এমন কোনো জাতি, এমন কোনো কণ্ডম নাই যেখানে নবি-রসুল পাঠানো হয় নি, এবং সেই নবি-রসুলদের সেই জাতির, সেই কণ্ডমের ভাষায় আল্লাহর আয়াতসমূহকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেবার জন্য পাঠানো হয়েছে। তা হলে এত মতভেদ, এত শ্লেষ, এত কাদা ছোঁড়াছুড়ি, এত নোংরামির কুপমগ্নুকতার বৃত্তে কেন আমরা একে অপরের উপর চড়াও হই? এই ঘটনার দেয়াল আমাদেরকেই একত্র হয়ে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা চালাতে হবে। তবে এখানেও একটি মহা-কিছু থেকে যায়। সেই মহা-কিছুটির নাম হলো আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে নি, ঘটে না এবং ঘটবেও না। সুতরাং কোনো সন্দেহ না রেখেই বলতে চাই যে, কোরান-এর এই আয়াতটিতে যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে তোমরা মারা যাবে, তোমাদেরকে জীবন দান করি এবং পরে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তারপর আবার জীবন দান করা হবে ॥ আসুন আমরা সবাই সব রকম সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সত্য উদ্ধারের গবেষণাটি চালিয়ে যাই। এই গবেষণার পেছনে প্রতি পদে পদে কুপমগ্নুকতার আবর্জনা থাকবেই এবং এটাকেই সরিয়ে ধাপে ধাপে সার্বজনীন সত্যটিকে উদ্ধার করতে হবে এবং সত্যসাগরে অবগাহন করার সার্বজনীন আস্থানটি জানাতে হবে।

৬৭. প্রত্যেক জন্য (লিকুল্লি) উন্নত (জাতি, কণ্ডম, সম্প্রদায়) (উন্নতিন) আমরা (আল্লাহ) রাখিয়া দেই (জাআলনা) এবাদতের নিয়ম (মানসাকা) তাহারা (হম) সেই নিয়ম অনুসরণ করে (নাসিকুহ) সুতরাং না (ফালা) আপনার (সাথে) তর্ক (ঝগড়া, বিতর্ক, কথা

কাটাকাটি) করে (ইউনাজিউনাকাক) মধ্যে (ফি) হকুম (আদেশ, নির্দেশ) (আমরি) এবং (ওয়া) আপনি ডাকুন (আদট) দিকে (ইলা) আপনার রবের (রাব্বিকা) নিশ্চয়ই আপনি (ইন্বাকাক) অবশ্যই উপর (লা আলা) পথের (হদাম) সঠিক (মুস্তাকিম)।

প্রত্যেক কওমের জন্য আমরা (আল্লাহ) রাখিয়া দিয়াছি এবাদতের নিয়ম, তাহারা সেই নিয়ম অনুসরণ করে, সুতরাং আপনার (সঙ্গে) তর্ক না করে এই হকুমের মধ্যে এবং আপনি ডাকুন আপনার রবের দিকে, নিশ্চয়ই আপনি সঠিক পথের উপর অবশ্যই (আছেন)।

র এই আয়াতে আমরা জানতে পারলাম যে প্রত্যেক কওমের মধ্যে এবাদত-বন্ধেগির একেক রকম নিয়ম-পদ্ধতি চালু আছে। এই নিয়ম-পদ্ধতিগুলো নবিরসুলেরাই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং শিখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক এবাদতের নিয়মকানুনগুলো ভিন্নভিন্ন হতে বাধ্য, কারণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে নিয়মকানুনগুলি ভিন্নভিন্ন হতে বাধ্য। এবাদতের নিয়মকানুন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাটা বৃথা। তাই ‘আপনি আপনার রবের দিকে’ ডাকুন, কারণ আপনি সঠিক পথের উপর অবশ্যই অবস্থান করছেন। এই সঠিক পথটি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে পথটি সঠিক সেই পথেই তো আপনি যাচ্ছেন।

৬৮. এবং (ওয়া) যদি (ইন) আপনার সাথে তাহারা তর্ক করে (জাদালুকা) সুতরাং বলুন (ফাকুলি) আল্লাহ (-ল্লাহ) জানেন (আলামু) যাহা কিছু (বিম্বা) তোমরা কাজ করিতেছ (তাম্বালুন)।

ল্ট এবং আপনার সাথে যদি তাহারা তর্ক করে, সুতরাং বলুন আল্লাহ জ্ঞানেন যাহা কিছু তোমরা করিতেছ।

৬৯. আল্লাহ (আল্লাহ) ফয়সালা করিয়া দিবেন (মীমাংসা করিয়া দিবেন) (ইয়াহকুম্বু) তোমাদের মধ্যে (বাইনাকুম্বু) দিনে (ইয়াওমাল্) কেয়ামতের (কিয়ামতি) সেই বিষয়ে (ফিমা) তোমরা ছিলে (কুনতুম্বু) ইহার মধ্যে (ফিহি) মতভেদ করিতে (তাখতালিফুন)।

কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন সেই বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে তোমরা ইহার মধ্যে।

৭০. নাকি (আলাম) আপনি জ্ঞানেন (তালাম) যে (আননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) জ্ঞানেন (ইয়ালান্নু) যাহা (মা) মধ্যে (ফি) আকাশে (সাম্মায়ি) এবং (ওয়া) জমিনে (পৃথিবীতে, মাটিতে, দেহে) (আরদি) নিশ্চয়ই (ইন্না) ওইটা (জালিকা) মধ্যে (ফি) কিতাবে (কিতাবিন্) নিশ্চয়ই (ইন্না) ওইটা (জালিকা) উপরে (আলা) আল্লাহ (-ল্লাহি) সহজ (ইয়াসির)।

আপনি কি জ্ঞানেন না যে আল্লাহ জ্ঞানেন জমিনে এবং আকাশের মধ্যে যাহা কিছু (আছে) নিশ্চয়ই ওইটা কিতাবের মধ্যে, নিশ্চয়ই ওইটা আল্লাহর উপরে সহজ।

র এই আয়াতে প্রথমেই একটি রহস্যময় কথা আল্লাহ এই বলে তুলে ধরেছেন যে, ‘আপনি কি জ্ঞানেন না?’ এই প্রশ্নটি মহানবিকে এ জন্যই করা হয়েছে যে তিনিও আল্লাহর গোপন ভেদরহস্যগুলো ভালো করেই জ্ঞানেন। এই ছোট্ট বাক্যটিতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মহানবি এলম্বে গায়েব জ্ঞানেন। আল্লাহর পক্ষে আসমান-জমিনের সব কিছু জানা তো একটি মামুলি ব্যাপার, বরং তার উপরেও

যাহা কিছু আছে উহাও তিনি জানেন। তাই আল্লাহ বলছেন, ওইটা কিতাবের মধ্যেই আছে এবং ওইটা যে একদম সহজ বিষয় আল্লাহর উপর, ইহাও সহজে বোঝা যায়। তবে ‘কিতাব’ শব্দটি এই আয়াতে একটি অতীব রহস্যময় বিষয়। ইহা কি কাগজ-কালিতে লেখা কিতাব, নাকি আল্লাহর সিফাতের প্রকাশমান অবিরাম ছুটে চলার বিকাশ এবং প্রকাশের ধারাটিকেই কিতাব বলা হয়েছে? ইহা জানতে হলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী-রচিত কোরান দর্শন নামে কোরান-এর তিন খণ্ডের তফসিরটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

৭১. এবং (ওয়া) তাহারা এবাদত করে (ইয়াবুদুনা) হইতে (মিন) পরিবর্তে (দুনি) আল্লাহ (-ল্লাহি) যাহা (মা) নাই (লাম) নাজেল করেন (ইউনাজ্জিল) এই বিষয়ের (বিহি) দলিল (সুলতায়ানাও) এবং (ওয়া) যাহা (মা) নাই (লাইসা) তাহাদের কাছে (লাহম) সেই বিষয়ে (বিহি) জ্ঞান (ইলমুন) এবং (ওয়া) নাই (মা) জালিমদের জন্য (লিঙ্জোয়ালিমিনা) হইতে (মিন) সাহায্যকারী (নাসির)।

এবং তাহারা এবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে, যাহা নাজেল করেন নাই এই বিষয়ের দলিল এবং যাহা নাই তাহাদের কাছে এই বিষয়ে জ্ঞান এবং জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই।

৭২. এবং (ওয়া) যখন (ইজা) তেলাওয়াত করা হয় (তুত্লা) তাহাদের নিকট (আলাইহিম) আমাদের (আল্লাহ) আয়াতগুলি (আয়াতুনা) সুস্পষ্ট (বাইয়িনাতিন) আপনি খেয়াল (লক্ষ্য) করিবেন (তারিফু) মধ্যে (ফি) মুখমণ্ডলগুলিতে (উজুহি) যাহারা (লাজিনা) কাফেরদের (কাফারু) অস্বীকার (অসত্তোষ, ঘৃণাভাব) (মুনকারা) মনে হয় (ইয়াকাদুনা) তাহারা আক্রমণ করিবে (ইয়াসতুনা) যাহারা সহিত (বিল্লাজিনা) তেলাওয়াত করে (ইয়াতলুনা) তাহাদের নিকট (আলাইহিম)

আমাদের আয়াতগুলি (আয়াতিনা) বলুন (কুল) তবে কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব (আফাউনাব্বিউকুম) মন্দ (নিকৃষ্ট) কিছু সম্পর্কে (বিশাররিম) হইতে (মিন) তোমাদেরকে ওইটার (জালিকুম) আগুন (আন্নারু) ওই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন (ওয়াদাহা) আল্লাহ (-ল্লাহ) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) এবং (ওয়া) কত নিকৃষ্ট (বিসা) গন্তব্যস্থল (প্রত্যাবর্তনস্থল) (মাসির)।

এবং তাহাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয় যখন আমাদের (আল্লাহর) সুস্পষ্ট আয়াতগুলিকে আপনি খেয়াল করিবেন মুখমণ্ডলগুলির মধ্যে যাহারা কাফের অস্বীকার করে মনে হয় যেন তাহারা আক্রমণ করিবে যাহারা তেলাওয়াত করে আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলি তাহাদের নিকট বলুন, ‘তবে কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব মন্দ কিছু সম্পর্কে ওইটা হইতে আগুন ওই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন আল্লাহ যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।’

৭৩. হে (ইয়াআইউহান) মানুষেরা (নাসু) সম্মুখে স্থাপন (দাখিল, নিবেদন, পেশ) করা হইতেছে (দুরিবা) একটি উপমা (সাদৃশ্য, তুলনা) (মাসালুন) সুতরাং তোমরা মনোযোগ দিয়া শোনো (ফাসতামিউ) ইহার প্রতি (লাহ) নিশ্চয়ই (ইন্নাল) যাহাদেরকে (লাজিনা) তোমরা ডাকিতেছ (তাদউনা) হইতে (মিন) পরিবর্তে (দুনিল) আল্লাহর (-লাহি) কখনই নয় (লান) তাহারা সৃষ্টি করিতে পারে (ইয়াখলুকু) একটি মাছি (জুবাবাউ) এবং (ওয়া) যদি (লাও) তাহারা একত্রিত হয় (ইজ্জামাউ) সেই জন্য (লাহ) এবং (ওয়া) তাহাদের হইতে ছিনাইয়া লয় (ইয়াসলুবহমুজ্জ) মাছি (জুবাবু) কোনো কিছুই (শাইয়া) না (লা) তাহা উদ্ধার (পরিব্রাণ, নিষ্কৃতি, উত্তোলন) (ইয়াস্তানকিজুহ) তাহা হইতে (মিনহ) রূপ (দুর্বল,

হীনবল, শক্তিহীন, ক্লীণ) (দাউফা) প্রার্থী (যাচক, প্রার্থনাকারী) (তালিব) এবং (ওয়া) যাহার কাছে প্রার্থনা করা হয় (মাতলুব)।

হে মানুষেরা, একটি উপমা সামনে ধরা হইতেছে, সুতরাং তোমরা মনোযোগ দিয়া শোনো ইহার প্রতি, নিশ্চয়ই যাহাদেরকে তোমরা ডাকিতেছ হইতে আল্লাহর পরিবর্তে তাহারা কখনই সৃষ্টি করিতে পারে না একটি মাছি এবং যদি তাহারা সেই জন্য একত্রিত হয় এবং যদি তাহাদের হইতে মাছি ছিনাইয়া লয় ইহা হইতে কোনো কিছুই উদ্ধার করিতে পারিবে না, দুর্বল প্রার্থী এবং যাহার কাছে চাওয়া হয় (সে-ও দুর্বল)।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, আপন কলুষিত প্রবৃত্তির দ্বারা যে সব মূর্তি মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে এবং এমনকি স্বর্ণ দিয়ে ॥ গরুর বাছুরের মতো স্বর্ণের বাছুর বানিয়ে, পূজা করা হয়, তাদের ভালো-মন্দ করার কোনোই ক্ষমতা নাই। সুতরাং এরা দুর্বল। এদের না আছে সাহায্য করার ক্ষমতা আর না আছে সাহায্যপ্রার্থীর প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা। একটি মাটির পাত্র অথবা স্বর্ণের মূর্তির কোনো ক্ষমতাই নাই, এমনকি একটি অতিক্রুদ্ধ মাছিও যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবু না। মানুষ জীবাত্মার অধিকারী এবং সেই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মাও নিকটেই অবস্থান করেন। যদি জীবাত্মার অধিকারী মানুষ ধ্যানসাধনার মাধ্যমে পরমাত্মার রূহরূপটিকে জাগ্রত করে ফেলতে পারে তবে সেই রূহরূপী পরমাত্মাই কর্ম করেন, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে উহা জীবাত্মার অধিকারী মানুষই করছে। তাই যার কাজ তিনিই করে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে হবে জীবাত্মার অধিকারী মানুষই করে যাচ্ছে। এই সূক্ষ্ম দর্শনটি অনেকেই বুঝতে না পেরে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় এবং

এটাসেটা লিখে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সুতরাং সে নিজেও বিভ্রান্ত এবং তার লিখনীও বিভ্রান্তিতে ভরা থাকে।

৭৪. না (মা) মর্যাদা দেওয়া (কাদার) আল্লাহর (-ল্লাহা) সত্য (হাককা) তাহার মর্যাদা (কাদরিহি) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) অবশ্যই ক্রমতাবান (শক্তিমান, মহাশক্তিধর) (লাকাইউন্) মহাপরাক্রমশালী (পরাক্রমযুক্ত, মহাবলশালী, মহাতেজী, মহাবীরত্বপূর্ণ) (আজিজ)।

উহারা আল্লাহর মর্যাদা দিল না, হক্ মর্যাদা তাঁহার, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই ক্রমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।

হক্ মর্যাদাবান এবং মহাপরাক্রমশালী যে একমাত্র আল্লাহ, উহা এই জাতীয় লোকেরা বোঝেও না এবং বুঝবার চেষ্টাও করে না। এই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ মানুষের জীবনরগের নিকটেই ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে অবস্থান করার কথাটি কোরান-এ অন্যত্র ঘোষণা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী হয়েও ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে প্রতিটি মানুষের জীবনরগের নিকটেই যে অবস্থান করার কথাটি কোরান-এর অন্যত্র ঘোষণা করেছেন ইহা একটি মহাবিস্ময়কর মহাবিজ্ঞানময় ঘোষণা। কারণ এই ক্ষুদ্র মানুষ জীবাত্মার অধিকারী, তার উপর পরীক্ষা করার উদ্দেশে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জাল্লা শানাহ ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছেন এই আল্লাহর ঘোষণাটি একটি মহাবিস্ময়কর ঘোষণা একটি মহাচমকানো চমকিয়ে দেবার ঘোষণা। এইখানেই তাঁর বিজ্ঞানময় ওয়াহাদানিয়াতের পরিচয়টি ফুটে ওঠে। তৌহিদের মহারহস্যের ঢাকনাগুলো খুলে যায়। জীবাত্মার অধিকারী সাধকেরা তখন চমকে উঠে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে

দেখতে পায়, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জাল্লা শানাহুর লীলাখেলাই চলছে। এই মহাবিস্ময়কর বিষয়টি একমাত্র তারাই বুঝতে পারে যারা আল্লাহকে পাবার জন্য ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় বছরের পর বছর ডুবে থাকে, যারা যোগী তথা দায়েমি সালাত পালনকারী; অন্যথায় বইপড়া বিদ্যাওয়ালা অথবা বড় বড় ডিগ্রিধারীরা এই রহস্যের ধারেকাছেও যেতে পারে না। তাই অনুমান আর আন্দাজের কত রকম রঙ্গিলা ঢিল ছুঁড়তে থাকে আর সেই ঢিলের আঘাতে অনেকেই জর্জরিত হয়ে বিদ্রান্ত হতে বাধ্য হয়। দ্য স্পিরিট অব ইসলাম এবং দ্য হিন্দু অব স্যারাসিন্স-এর রচয়িতা শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত আমির আলি সাহেব এই রহস্যময় জ্ঞানের ধারেকাছেও যেতে পারেন নি, তাই সুফিবাদের উপর যা-তা মন্তব্য করে গেছেন। যদিও সৈয়দ আমির আলি একজন শিয়া ফেরকার অনুসারী, কিন্তু নিরপেক্ষতার ভান করে শিয়াদের মতাদর্শই প্রচার করে গেলেন এবং সুফিবাদকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন। দুনিয়ার বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্মানিত হতে পারেন, কিন্তু সুফিবাদের মানদণ্ডে তাঁর মর্যাদা কতটুকু তা আল্লাহই ভালো করে জানেন এবং সাধকেরাও সৈয়দ আমির আলিকে বোকার স্বর্গে বাস করা কাণ্ডময় অতিথি মনে করে।

৭৫. আল্লাহ (আল্লাহ) মনোনীত করেন (ইয়াসতাকি) মধ্য হইতে (মিনাল) ফেরেশতাদের (মালাইকাতি) রসুল (রসুলান) এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনান) মানুষদের (নাসি) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) শোনে (সামিউন) দেখেন (বাসিরুন)।

আল্লাহ মনোনীত করেন ফেরেশতাদের মধ্য হইতে রসুল এবং মানুষদের মধ্য হইতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শোনে, দেখেন।

যদিও এই আয়াতটি আয়তনের প্রশ্নে ছোট, কিন্তু নীতিনির্ধারণের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। কারণ এই আয়াতে স্পষ্ট আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ মনোনীত করেন ফেরেশতাদের থেকেও রসূল এবং তারপরে বলা হলো, মানুষদের থেকেও রসূল মনোনীত করা হয়। ফেরেশতাদের থেকে রসূল মনোনীত করার কথাটি কোরান-এর অন্যত্র কয়েকবার দেখতে পাই। ফেরেশতারা আল্লাহর সেফাতি নুরে তথা গুণবাচক নুরে তৈরি এবং ফেরেশতাদেরকে নফস তথা জীবাত্মা এবং রুহ তথা পরমাত্মা ॥ এই দুইটির একটিও আল্লাহ কর্তৃক দান করা হয় নি। সুতরাং ফেরেশতাদের কোনো নিজস্ব সীমিত স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি। ফেরেশতারা যতই সেফাতি নুরে তৈরি হোক না কেন এবং যত বড় ক্ষমতাই আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু ফেরেশতাদেরকে কোরান-এর একটি আয়াতেও ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় নি, বরং মানবজাতির প্রত্যেক এবং পরোক্ষভাবে সেবা করার জন্যই বানানো হয়েছে। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ ফেরেশতাদের নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে ভাবে গদগদ হয়ে পড়ি, কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখতে পাই যে সকল ফেরেশতাকেই মানুষের খেদমতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং ফেরেশতাদের আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হবার প্রশ্নই ওঠে না। ফেরেশতাদের মন্দ কর্ম করার কোনো প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, তাই ফেরেশতাদের দ্বারা কোনো মন্দ কর্ম করার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আমরা এই আয়াতে দেখতে পাই যে আল্লাহ প্রথমেই বলছেন যে, তিনি ফেরেশতাদের মধ্য হতে রসূল মনোনীত করেন। তারপর বলা হয়েছে, মানবজাতি হতেও রসূল মনোনীত করা হয়। একটু খেয়াল করে দেখুন তো, কোরান-এর কোনো একটি আয়াতেও ফেরেশতাদের থেকে নবি মনোনীত করার কথাটি আছে

কি না। না, নাই। নবি মনোনীত করার প্রশ্নে ফেরেশতাদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানবজাতি হতে নবি মনোনীত করার কথাটি পাই। সুতরাং নবির মর্যাদা রসুলের মর্যাদা হতে উপরে। এই সোজা কথাটির মধ্যে অনেকেই এটাসেটা বলে এবং ব্যাখ্যা দিয়ে রসুলকে নবি হতে বেশি মর্যাদা দেবার কথাটি দেখতে পাই। ইহা একটি অনিচ্ছাকৃত মারাত্মক ভুল। এই ভুল শিক্সার দরুন সহজ-সরল মানুষগুলো বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়। যদি মানুষ হতে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশি হয়ে থাকে তা হলে কোনো সন্দেহ নাই যে রসুলই নবির চেয়ে মর্যাদার প্রশ্নে বড়। কিন্তু মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় নি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে অনেক গবেষকদের কিছু কিছু ভুলের খেসারত আমরা দিয়ে চলছি। যেমন কোরান যেখানে ‘আম্মানু’ তথা ইম্মানদার বলছে সেখানে অনুবাদক আম্মানুকে ‘মোম্বিন’ লিখে ফেলেন। কেন? আল্লাহ কি আম্মানুর সাথে মোম্বিন বলতে পারতেন না? কোরান খুলে দেখুন, আম্মানুর মর্যাদা কোথায় আর মোম্বিনের মর্যাদা কোথায়। এই রকম ভুলগুলো আমাদেরকে সত্য উদ্ঘাটনের প্রশ্নে বিব্রত করে ছাড়ে।

৭৬. তিনি জানেন (ইয়ালান্নু) যাহা (মা) মধ্যে (বাইনা) তাহাদের (আইদিহিম) এবং (ওয়া) যাহা (মা) তাহাদের পিছনে (খাল্ফাহম) এবং (ওয়া) আল্লাহর দিকে (ইলান্নাহি) ফিরিয়া আসিতে হয় (প্রত্যাবর্তিত হয়) (তুরজাউ) সব বিষয়ে (সব ব্যাপারে, সব ঘটনায়) (উম্মুর)।

তিনি জানেন যাহা তাহাদের মধ্যে এবং যাহা তাহাদের পিছনে (আছে) এবং সব বিষয়ে আল্লাহরই দিকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

৭৭. হে (ওহে) (ইয়াআইউহাল্) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছ (আম্মানু) রুকু করো (আরকাউ) এবং (ওয়া) সেজদা করো (আসজুদু) এবং (ওয়া) এবাদত করো (বুদু) তোমাদের রব (রাব্বাকুম) এবং (ওয়া) তোমরা করো (আফআলু) ভালো কাজ (খাইরা) যাহাতে তোমরা (লাআল্লাকুম) সফলতা লাভ করিতে পারো (সফলকাম হইতে পারো) (তুফলিহন)।

ওহে যাহারা ইমান আনিয়াছ, রুকু করো এবং সেজদা করো এবং এবাদত করো তোমাদের রবের এবং তোমরা করো ভালো কাজ যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৭৮. এবং (ওয়া) জেহাদ করো (জাহিদু) আল্লাহর মধ্যে (ফিল্লাহি) সত্য (হাক্কা) তাহার জেহাদ (জিহাদিহি) তিনি (হয়া) তোমাদেরকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন (আস্তাবাকুম) এবং (ওয়া) না (মা) অর্পণ করিয়াছেন (জাআলা) তোমাদের উপর (আলাইকুম) মধ্যে (ফি) দ্বীনের (দ্বীনি) হইতে (মিন) সক্ষীর্ণতা (হারাজিন) মিল্লাতে (মিল্লাতা) তোমাদের বাবা (আবিকুম) ইব্রাহিমের (ইব্রাহিমা) তিনি (হয়া) তোমাদের নাম দিয়াছেন (সাম্মাকুম) মুসলিম (মুসলিমিনা) হইতে (মিন) আগেও (কাবলু) এবং (ওয়া) মধ্যে (ফি) এই (হাজা) হয় যেন (লিয়াকুনা) রাসূল (রাসুলু) সাক্কী (শাহিদান্) তোমাদের উপর (আলাইকুম) এবং (ওয়া) তোমরা হও (তাকুনু) সাক্কী (শুহাদায়া) উপর (আলা) মানুষদের (নাসি) সুতরাং কায়েম করো (ফাআকিমুস্) সালাত (সালাতা) এবং (ওয়া) দাও (আতুজ্) জাকাত (জাকাতা) এবং (ওয়া) আঁকড়াইয়া ধরো (তাসিমু) আল্লাহর সহিত (বিল্লাহি) তিনিই (হয়া) তোমাদের মাওলা (মাওলাকুম) সুতরাং

কত ভালো (ফানিমা) মাওলা (মাওলা) এবং (ওয়া) কত ভালো (নিমা) সাহায্যকারী (নাসির)।

এবং জেহাদ করো আল্লাহর মধ্যে তাঁহার হক জেহাদ। তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন এবং দুীনের মধ্যে তোমাদের উপর হইতে কঠোরতা (সকীর্ণতা) আরোপ করেন নাই। তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাতে তিনি তোমাদের নাম দিয়াছেন মুসলিম পূর্ব হইতে এবং তোমাদের উপর সাক্ষী হন রসূল ইহার (কোরান-এর) মধ্যে মানবজাতির উপর তোমরাও সাক্ষী হও সুতরাং কায়েম করো সালাত এবং দাও জাকাত এবং আঁকড়াইয়া ধরো আল্লাহকে তিনিই তোমাদের মাওলা সুতরাং কত উত্তম মাওলা এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

এই আয়াতে প্রথমেই আল্লাহর পথে জেহাদ করতে বলা হয়েছে এবং এই জেহাদটিকে বলা হয়েছে হক জেহাদ তথা সত্য জেহাদ। এই জেহাদ তরবারি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করার জেহাদ নয়, এই জেহাদ মানুষ হত্যা করার বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘোরাঘুরির জেহাদ নয়, এই জেহাদ আপন নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষার উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেবার জেহাদ, উহাকে মুসলমান বানাবার জেহাদ। এখানে আল্লাহর পথে বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহকে পাবার পথে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তিগুলো সামনে এসে দাঁড়ায় উহাকে পরাভূত করে সত্যের মধ্যে ডুবে যাবার জেহাদ। তাই এখানে ‘ফি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ফি’-র অর্থ হলো মধ্যে, তারপরের শব্দটি আল্লাহ, সুতরাং আল্লাহর মধ্যে বলা হয়েছে। আবার ‘হাক্কা’ শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। ‘হাক্কা’ শব্দটির অর্থ হলো নিরোট সত্য। ইহা কোনো বৈষয়িক বিষয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারার জেহাদ নয়। বৈষয়িক বিষয়ের মারামারি-

কাটাকাটিকে মোটেও জেহাদ বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে যুদ্ধ। জেহাদ এবং যুদ্ধের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এই ব্যবধানটুকুর কারণেই পিতা ইব্রাহিমের দেওয়া মুসলিম নামকরণটিকে কলঙ্কিত করে যুগে যুগে, কালে কালে ॥ মুসলমান নাম ধারণ করেই ॥ মুসলমানে মুসলমানে অনেক অনেক করুণ নৃশংস যুদ্ধ ঘটে গেছে। ইতিহাস হতে জানতে পারি যে, একই মুসলমান নামধারী একদল যখন অপর দলকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেছে তখন সেই দলের নিরীহ মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি বিশ্বাসে অবাক হতে হয় যখন ইতিহাসের পাতায় পড়তে হয় যে নিরীহ মুসলমানদেরকে অপর মুসলমানেরা কেবল হত্যাই করে নি, বরং কবর হতে অর্ধগলিত লাশগুলোকে উঠিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেহাদের নামে কী জঘন্য এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডগুলিই না করা হয়েছে! ইচ্ছা করেই সেইসব মুসলমানদের নামগুলো পাঠকদেরকে জানিয়ে দিলাম না। আশা করি ইসলামের ইতিহাসের উপর রচিত বড় বড় গ্রন্থগুলো পড়লেই হাড়ে হাড়ে টের পাবেন, টের পাবেন মুসলমান নাম ধারণ করে এদের বর্বরতার বীভৎস চিত্র। মুসলমান হয়ে মুসলমান খুন করার দানবীয় অট্টহাসি। মুসলমান হয়ে মুসলমানের মস্তক ছিন্ন করার সময়ে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিয়ে উল্লাস প্রকাশের দৃশ্যগুলো। তাই আজ মুসলমানদের অবস্থানটি কোন পতনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে তা পাঠকই বিচার করবেন। অথচ এই আয়াতে পরে বলা হলো যে আল্লাহর দ্বীনের উপর কোনো প্রকার সর্কীর্ণতার স্থানই নাই, অথচ ইসলামের ইতিহাস পড়লেই দেখা যায় প্রতি পদে পদে, প্রতি ছত্রে ছত্রে সর্কীর্ণতার বিকট দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোরান আমাদেরকে কী শিখাচ্ছেন আর আমরা কী শিখছি! কোরান-এ কত আশা করে আল্লাহ মুসলমানদেরকে মানবজাতির

সাক্ষীরূপে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই তথাকথিত মুসলমান নামধারীরা কী জঘন্য সাক্ষী হয়ে আল্লাহর বাণীকে উপহাস করছে! তারপর এই আয়াতে বলা হয়েছে, এই মানবজাতির জন্য মুসলিম নামটির যদি সার্থকতা ফুটিয়ে তুলতে চাও তা হলে নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে আঁকড়িয়ে ধরো। তাহলে তো এদের নামাজ এবং এদের জাকাত আদায় এবং এদের আল্লাহকে আঁকড়িয়ে ধরার নমুনাগুলো কেমন তার বিচারের ভার পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম। সব শেষে এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তিনিই তোমাদের মাওলা, সুতরাং কত উত্তম মাওলা এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। দুনিয়ার আশিটি বছরের জীবনে লোভনীয় স্বার্থগুলো যখন মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মুখে মুখে আল্লাহকে উত্তম মাওলা, উত্তম সাহায্যকারী বলে থাকে, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এর পরিচয়টুকু সমাজ জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে বা হচ্ছে তার বিচারের ভারটি পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম।

সূরা : রুম
মকী র আয়াত : ৬০, রুকু : ৬

বিসম্বিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহর নামের সাথে (বিস্মিল্লাহে) যিনি একমাত্র দাতা (আর রাহমান)
একমাত্র দয়ালু (আর রাহীম)

১। আলিফ-লাম-মীম। (ইহার অর্থ সিনার এলেক্সের (এলম্মে লাদুনির)
অধিকারী ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়।)

২। রোম (শক্তির প্রতীক) পরাজিত হইয়াছে। (গুলেবাতির রুম্ম)।

৩। তাহাদের নিকটবর্তী পৃথিবীর (ভূমিতে) মধ্যে এবং তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয় লাভ করিবে। (ফী আফনাল্ আরদে ওয়াহম মিন বাআদে গালাবেহিম হাইয়াগলেবুনা)।

+ ৪। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই। (ফি বেদএ সিনিনা)। আগের এবং পরের সকল নির্দেশেই আল্লাহর জন্য। (লিল্লাহিল্ আমরু মিন কাবলু ওয়া মিন বাআদু)। এবং সেই দিন মোমিনগণ আনন্দিত হইবেন। (ওয়া ইয়াওমা এজিন ইয়াফরাহল মোমেনুনা)।

৫। আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন, এবং তিনিই সর্বোচ্চ দয়ালু। (বেনাস্রিল্লাহে, ইয়ানসুরু মান ইয়াশাউ, ওয়া হ্যাল আজিজুর রাহীমু)।

৬। ওয়াদা আল্লাহর, আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (ওয়াদাল্লাহে, লা ইউখলেফুল্লাহ ওয়াদাহ)। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তাহা জানেন না। (ওয়া লাকিন্না আক্সারান্ নাসে লা ইয়ালামুনা)।

৭। তাহারা তো (লোকগণ) দুনিয়ার জীবনের প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কেই অবগত। (ইয়ালামুনা জাহেরাম্ মিনাল্ হাইয়াতিদুনিয়া)। অথচ তাহারা পরকাল সম্পর্কে গাফেল (বেখবর)। (ওয়া হম আনিল্ আখেরাতে হম গাফেলুনা)।

৮। তাহারা (লোকেরা) কি নিজেদের নফস (জীবন) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না? (আওয়ালাম ইয়াতাফাক্কারু ফী আনফুসীহীম)। আল্লাহ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে, যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেন নাই? (মা খালাকাল্লাহস্ সাম্মাওয়াতে ওয়াল আরদা ওয়াম্মা বাইনাহম্মা ইল্লা বিল হাককে ওয়া আজালীন্ মুসাম্মান) এবং নিশ্চয়ই অধিকাংশ

মানুষ তাহাদের রবের সাক্ষাৎ বিষয়ে অবশ্যই কুফরি করে। (ওয়া ইন্না কাছিরাম্ মিনাননাসে বেলেকায়ে রাব্বেহীম লাকাফেরনা)।

৯। তাহারা (লোকেরা) কি পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে নাই? সুতরাং তাহা হইলে তাহারা (লোকেরা) দেখিয়া নিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল? (আওয়ালাম্ ইয়াসীরু ফীল আরদে ফাইয়ানজুরু কাইফা কানা আকেবাতুল লাজীনা মিন্ কাবলেহীম)। বস্তুতঃ তাহারা (পূর্ববর্তীরা) তাহাদের (লোকদের) চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল। এবং তাহাদের চাইতে অধিক ভূমিকর্ষ ও আবাদ করিয়াছিল এবং তাহাদের (পূর্ববর্তীদের) নিকট তাহাদের রসূলগণ বাইয়েনাতেসহ (সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ) আগমন করিয়াছিলেন। (কানু আশাদ্দা মিন্হম্ কুওয়্যাতান্ ওয়া আসারুল্ আরদা ওয়া আম্মারুহা আক্সারা মিম্মা আম্মারুহা ওয়া জাআত্হম্ রসূলুমহম্ বিল্ বাইয়েনাতে)। সুতরাং আল্লাহ তাহারও উপর অবশ্যই জুলুম করেন না। বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল। (ফাম্মা কানাল্লাহ লেইয়াজ্লেম্মাহম্ ওয়া লাকিন্ কানু আনফুসাহম্ ইয়াজ্লেম্মুনা)।

১০। অতঃপর যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছে তাহাদের পরিণাম মন্দ হইয়াছে। কারণ তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিত এবং তাহা নিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। (সুম্মা কানা আকেবাতুল লাজীনা আসাউস্ সুআ আন্ কাজ্জাবু বে আইয়াতীল্লাহে ওয়াকানু বেহা ইয়স্তাহজেউনা)।

১১। আল্লাহই প্রথম সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। অতঃপর তোমরা তাঁহার (আল্লাহর) দিকেই ফিরিয়া আসিবে। (আল্লাহ ইয়াব্দাউল্ খাল্কা সুম্মা ইউঈদুহ্ সুম্মা ইলাইহি তুরজাউনা)।

১২। এবং যেইদিন সাআত (কেয়ামত) প্রতিষ্ঠিত হইবে। (সেইদিন) অপরাধীরা নিরাশ হইয়া পড়িবে। (ওয়া ইয়াওম্মা তাকুমুস সাআতু ইউব্লেসুল্ মুজ্জেম্মুনা)।

১৩। এবং (সেইদিন) তাহাদের জন্য তাহাদের শরিকদের (দেবতাদের) কেহই সুপারিশকারী হইবে না। অথচ (সেইদিন) তাহারা তাহাদের শরিকদের (দেবতাদের) সাথেও কুফরি করিবে (তাহাদেরকে অস্বীকার করিবে)। (ওয়া লাম্ম ইয়াকুল্ লাহম্ম মিন্ শুরাকায়েহীম্ শুফাউ ওয়া কানু বেশুরাকায়েহীম্ কাফেরীনা)।

১৪। এবং যেই দিন সাআত (কেয়ামত) প্রতিষ্ঠিত হইবে (সেইদিন) তাহারা পরস্পর বিভক্ত হইয়া পড়িবে। (ওয়া ইয়াওম্মা তাকুমুস সাআতু ইয়াওম্মায়েজীন ইয়াতাকাররাকুনা)।

১৫। সুতরাং যাহারা ইমান আনয়ন করিয়াছে এবং আমলে সালেহা (সৎকর্ম) করিয়াছে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে বাগান (জান্নাত)। তাহারা তাহাতে (জান্নাতে) সম্ভাষিত হইবে। (ফাআম্মমাললাজীনা আম্মানু ওয়া আম্মেলুস সালেহাতে ফাহম্ম ফী রাওদাতীন ইউহবারুনা)।

১৬। এবং যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ এবং আখেরাতের মিলনকে অস্বীকার এবং মিথ্যা বলিয়াছে। সুতরাং তাহারা আজাবের সম্মুখীন হইবে। (ওয়া আম্মমাললাজীনা কাফারু ওয়া কাজ্জাবু বেআয়াতেনা ওয়া লেকাইল্ আখেরাতে ফাউলাইকা ফীল্ আজাবে মুহ্দারুনা)।

১৭। সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহর পবিত্রতা (তস্বিহ) পাঠ কর। (ফাসুবাহানাল্লাহে হীনা তুমসূনা ওয়া হীনা তুসবেহনা)।

১৮। এবং তাঁহার জন্যই সকল প্রশংসা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মধ্যে রাতের বেলায় এবং দুপুর বেলায়। (ওয়ালাহ্ হাম্দু ফীস্‌সাম্মাওয়াতে ওয়াল্ আরদে ওয়া আশিইয়্যান্ ওয়া হীনা তুজ্‌হেরুনা)।

১৯। তিনিই (আল্লাহ) মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন এবং পৃথিবীকে মৃত্যুর (শুকিয়ে যাবার) পর জীবিত করেন এবং এভাবেই তোমাদেরও বাহির করা হইবে। (ইউখরেজুল্ হাইয়্যা মিনাল মাইয়েতে ওয়া ইউখরেজুল্ মাইয়েতা মিনাল হাইয়ে ওয়া ইউহয়ীল আরদা বাআদা মাওতেহা, ওয়া কাজালীকা তুখরাজুনা)।

২০। এবং তাঁহার আয়াতসমূহের মধ্যে ইহাও একটি আয়াত (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমরা বাশার (মানুষ) রূপে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া পড়িয়াছ। (ওয়ামিন আইয়াতীহি আন্ খালাকাকুম মিন তুরাবীন্ সুম্মা ইজ্‌আ আনতুম বাশারুন্ তানতাশেরুনা)।

২১। এবং তাঁহার আয়াত (নিদর্শন) সমূহের মধ্যে হইতে ইহাও একটি আয়াত (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নফস হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদের (স্ত্রী) জোড়, যাহাতে তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার এবং তোমাদের পরস্পরের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন ভালোবাসা এবং রহমত (দয়া)। (ওয়া মিন আয়াতেহী আন্ খালাকা লাকুম মিন আনফুসেকুম আজওয়াজান্ লেতাস্কুনু ইলাইহা ওয়াজাআলা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতান্ ওয়ারাহমাতান)। নিশ্চয়ই উহার মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অবশ্যই আয়াত (নিদর্শন) রহিয়াছে। (ইন্না ফী জালীকা লা আইয়াতীন্ লেকাওমীন ইয়াতাফাককারুনা)।

+ ২২। এবং তাঁহার আয়াত (নিদর্শন)-সমূহের মধ্যে ইহাও রহিয়াছে যে, তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন। (ওয়া মিন্ আইয়াতেহী খাল্কুস্ সাম্মাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়াখ্ তেলাফু আলসেনাতেকুম্ ওয়া আলওয়ানেকুম্)। নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য আয়াত (নিদর্শন)-সমূহ রহিয়াছে। (ইন্না ফী জালীকা লা আইয়াতীন লীল্ আলেমীনা)।

+ ২৩। এবং তাঁহার আয়াত (নিদর্শন)-সমূহের মধ্যে ইহাও রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদেরকে রাতে ও দিনে নিদ্রার এবং তাহার অনুগ্রহ অব্বেষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (ওয়া মিন্ আইয়াতেহী মানামুকুম্ বিল্ লাইলে ওয়াননাহায়ে ওয়াব্ তেগাউকুম্ মিন্ ফাদলেহী)। নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে শ্রবণশীল জাতির জন্য অবশ্যই আয়াত (নিদর্শন)-সমূহ রহিয়াছে। (ইন্না ফী জালীকা লা আইয়াতীন লে কাওমিন্ ইয়াসমাউনা)।

২৪। এবং তাঁহার আয়াত (নিদর্শন)-সমূহের মধ্যে ইহাও রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদেরকে ভয় ও আশার জন্য বিদ্যুতের চমক দেখান এবং আকাশ হইতে পানি নাজিল (বর্ষণ) করেন। সুতরাং তাহাতে মৃত পৃথিবী (ভূমি) জীবিত করেন। (ওয়ামিন্ আইয়াতেহী ইউরীকুমুল্ বারকা খাওফান্ ওয়া তাম্মাআন্ ওয়া ইউনাজ্জেলু মিনাস্ সাম্মায়ে মাআন ফাইউহয়ী বিহীল্ আরদা বাদা মাওতেহা)। নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে বোধসম্পন্ন জাতির জন্য অবশ্যই আয়াত (নিদর্শন)-সমূহ রহিয়াছে। (ইন্নাফী জালীকা লা আইয়াতীন লেকাওমিন্ ইয়াকেলুনা)।

২৫। এবং তাঁহার আয়াত (নিদর্শন)-সমূহের মধ্যে ইহাও রহিয়াছে যে, তাহার নির্দেশেই আকাশ এবং পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত (স্থিতি) রহিয়াছে। (ওয়া মিন্ আইয়াতেহী

আনতাকুম্বাস্ সাম্মাউ ওয়াল আরদু বে-আম্মরেহী)। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে পৃথিবী (দেহ) হইতে ডাকার মত ডাক দিবেন তখন তোমরা তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবে। (সুম্মা ইজ্জা দাআকুম্ব দাওআতুন, মিনাল আরদে, ইজ্জা আনতুম্ব তাখরজুনা)।

২৬। এবং তাঁহার জন্যই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্ত কিছুই তাহার আচ্ছাবহ। (ওয়া লাহ মান্ ফীস্ সাম্মাম্মাওয়াতে ওয়াল্ আরদে কুল্লুন্ লাহ কান্নেতুনা)।

+ ২৭। এবং তিনিই তো সেই সত্তা যিনি সৃষ্টিকুলকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনিই আবার পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। বস্তুতঃ তাহা তাঁহার জন্য অধিকতর সহজ। (ওয়া হওয়াল্লাজী ইয়াব্দাউল্ খাল্কা সুম্মা ইউঈদুহ ওয়াহওয়া আহওয়ানু আলাইহে)। এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার জন্যই রহিয়াছে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত এবং তিনিই সর্বোচ্চ হেকমতওয়ালা (প্রজ্ঞাবান)। (ওয়ালাহল্ মাসালুল্ আলা ফীস্ সাম্মাওয়াতে ওয়াল্ আরদে। ওয়া হওয়াল্ আজ্জীজুল্ হাকিমু)।

২৮। তিনিই তোমাদের জন্য তোমাদের নফস হইতে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছেন। (দারাবালাকুম্ব মাসালান্ মিন্ আনফুসেকুম্ব)। আমরা তোমাদেরকে যেই রেজেক প্রদান করিয়াছি, তাহাতে কি তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারীরাও তোমাদের সমান অংশীদার? (হাল্ লাকুম্ব মিন্ মা মালাকাত আইমানুকুম্ব মিন্ গুরাকাআ ফীমা রাজাক্নাকুম্ব ফাআনতুম্ব ফীহে সাওয়াউন)। তোমরা কি তাহাদেরকে তেমনি ভয় কর, যেমনি পরস্পর একে অন্যকে ভয় কর? (তাখাফুনাহম্ কাখীফাতেকুম্ব আনফুসাকুম্ব)। এভাবেই আমরা বোধসম্পন্ন জাতির

জন্য আমাদের আয়াত (নিদর্শন)-সমূহকে বিস্তারিতভাবে অবশ্যই বর্ণনা করি। (কাজালীকা নুফাসসেলুল্ আইয়াতে লেকাওমিন্ ইয়াকেলুনা)।

+ ২৯। বরং জালিমেরা তাহাদের নির্বুদ্ধিতার (অজ্ঞতার) কারণে নিজেদের খেয়ালখুশির (প্রবৃত্তির) আনুগত্য করে। (বালিত্তাবাত্তাল্ লাজ্জীনা জালামু আহওয়াআহম্ বেগাইরে ইলমিন্)। সুতরাং যাহাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে কে হেদায়েত দান করিবে? এবং তাহাদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও নাই। (ফাম্মান্ ইয়াহদি মান্ আদাল্ লাল্লাহ, ওয়াম্মা লাহম্ মিনান্নাসেরীনা)।

৩০। সুতরাং তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। (ফাত্বাকেম্ ওয়াজ্জাহকা লীদ্বীনে হানীফান্)। আল্লাহ যেই প্রকৃতির (বিধানের) উপর মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই তো তাহাদের জন্য আল্লাহর একমাত্র প্রকৃতি (বিধান)। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নাই। (ফেত্ৱাতাল্ লাহীল্লাতী ফাতারান্নাসা আলাইহা, লা তাব্দীলা লেখাল্কীল্লাহে)। উহাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন, অথচ অধিকাংশ মানুষেই তাহা জানে না। (জালীকাদ্দ্বীনুল্ কাইয়েয়ুম্, ওয়ালা কিন্না আক্সারান্ নাসে লা ইয়ালামুনা)।

৩১। তোমরা সবাই তাঁহার দিকেই অনুগত হও এবং তাঁহাকে ভয় কর এবং সালাত কায়েম কর এবং তোমরা কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (মুনিবিনা ইলাইহে ওয়াত্ তাকুহ ওয়া আকিমুসসালাতা ওয়ালাতাকুনু মিনাল্ মুশ্ৱেকীনা)।

+ ৩২। যাহারা তাহাদের দ্বীনকে (স্বভাবকে) বিভক্ত করিয়াছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলেই তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে, তাহা নিয়াই সন্তুষ্ট। (মিনাল্লাজ্জীনা ফাররাকু দ্বীনাহম্ ওয়াকানু শীয়াআন, কুল্লু হেজ্বীন বেম্মা লাদাইহীম্ ফারেহনা)।

৩৩। এবং যখন মানুষদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তাহারা অনুগতভাবে তাহাদের রবের নিকট প্রার্থনা করে, অতঃপর যখন তাহাদেরকে তিনি রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করান তখনই একদল তাহাদের রবের সাথে শরিক করা আরম্ভ করে। (ওয়া ইজা মাস্‌সান্নাসা দুররুন্ দাআও রাব্বাহুন্ মুনিবীনা ইলাইহে সুম্মা ইজা আজাকাহুন্ মিন্‌হু রাহ্মাতান্ ইজা ফারিকুন্ মিন্‌হু বেরাব্বিহীন্ ইউশরেকুনা)।

৩৪। যাহাতে আমরা তাহাদেরকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করে সুতরাং তোমরা ভোগ করিতেই থাক। অতঃপর অচিরেই তোমরা (ইহার পরিণাম ফল) জানিতে পারিবে। (লেইয়াক্‌ফুরু বেমা আতাইনা হুন্ ফাতাম্মাত্তাউ। ফাসাওফা তাআলাম্মুনা)।

৩৫। আমরা কি তাহাদের নিকট এমন কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ (নাজিল) করিয়াছি যে, তাহা তাহাদেরকে শরিক করিতে বলে? (আম্‌ আনজালনা আলাইহীন্ সুল্‌তানাল্‌ ফাহুওয়া ইয়াতাকাল্‌লামু বেমা কানু বেহী ইউশরেকুনা)।

৩৬। এবং যখন আমরা লোকদেরকে আমাদের রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করাই তখন তাহারা তাহাতে আনন্দিত হয়। (ওয়া ইজা আজাক্‌নান্নাসা রাহ্মাতান্ ফারেহু বেহা)। এবং যদি তাহাদের কৃতকর্মের কারণে তাহাদের কোনো অমঙ্গল (মুসিবৎ) হয় তখনই তাহারা নিরাশ হইয়া যায়। (ওয়াইন তুসেব্‌হুন্ সাইয়েআতুনা বেমা কাদ্দাম্মাত্‌ আইদীহীন্ ইজাহুন্ ইয়াক্‌নাতুনা)।

+ ৩৭। তাহারা কি দেখে নাই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা রেজেকে প্রশস্ততা দান করেন এবং (যাহাকে ইচ্ছা) কমাইয়া দেন। নিশ্চয়ই উহার মধ্যে যাহারা ইমান আনয়ন করিয়াছে, এমন জাতির জন্য অবশ্যই আয়াত (নিদর্শন)

রহিয়াছে। (আওয়ালাম্ ইয়ারাও আননাল্লাহা ইয়াবসুতুর রেজ্কা লেমাইইয়াশাউ ওয়া ইয়াকদের ইন্না ফী জালীকা লা আইয়াতীন লেকাওমিন্ ইউমেনুনা)।

+ ৩৮। সুতরাং নিকট আত্মীয়কে তাহাদের অধিকার (পাওনা) দিয়া দাও এবং মিসকিনকে এবং মুসাফিরকেও (ফাত্মাতে জালকুরবা হাক্কাহ ওয়াল মেস্কীনা ওয়াবনাসাবীলে)। যাহারা আল্লাহর চেহারা (মিলন) পাইতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্য উহাই উত্তম। এবং উহাই হইল তাহাদের জন্য সফলতা। (জালীকা খাইরুন লীল্লাজীনা ইউরীদুনা ওয়াজ্ হাল্লাহে, ওয়া উলাইকা হমুল্ মুফলেহনা)।

৩৯। এবং মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির আশায় তোমরা যেই সুদের কারবার কর তাহা আল্লাহর নিকট মোটেই বৃদ্ধি পায় না। (ওয়াম্মা আতাইতুম্ মিন্ রেবান্ লেইয়ারবুআ ফী আম্ওয়ালীননাসে ফালা ইয়ারবু ইন্দাল্লাহে)। বরং তোমরা আল্লাহর চেহারার (সন্তুষ্টির) জন্য যেই জাকাত দিতে ইচ্ছা কর, উহাই তাহাদের জন্য দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়। (ওয়াম্মা আতাইতুম্ মিন্ জাকাতীন তুরিদুনা ওয়াজ্ হাল্লাহে ফাউলাইকা হমুল্ মুদয়েফুনা)।

+ ৪০। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রেজ্কে দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যু দান করিবেন। তারপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করিবেন। (আল্লাহল্লাজী খালাকাকুম্ সুম্মা রাজ্জাকাকুম্ সুম্মা ইউম্মিতুকুম্ সুম্মা ইউহয়ীকুম্)। তোমাদের শরিকদের (দেবতাদের) কেউ কি এই সবার কিছু করে? তিনিই ভাসমান (পবিত্র) সত্তা। তাহাদের শরিকদের (উপাস্যদের) থেকে তিনিই সর্বোচ্চ। (হাল্ মিন গুরাকায়েকুম্ মান্ ইয়াফআলু মিন্ জালেকুম্ মিন্ শাইইন, সুবহানাহ ওয়াতাতাআলা আম্মা ইউশরেকুনা)।

৪১। মানুষের হাতের অর্জনের কারণে (কৃতকর্মের কারণে) স্থলে এবং জলে বিপর্যয় (ফ্যাসাদ) প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের কিছু কিছু কর্মের পরিণাম তিনি (আল্লাহ) তাহাদেরকে (লোকদেরকে/মানুষকে) আশ্বাদন করান যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে। (জাহারান্ ফাসাদু ফীল্‌বাররে ওয়ান্ বাহারে বিন্না কাসাবাত্ আইদ্দিন্‌নাসে লেইউজ্জিকাহ্‌ম্ বাদাল্‌লাজী আমেলু লাত্‌আল্লাহ্‌ম্ ইয়ারজেউনা)।

+ ৪২। বল, (হে মুহাম্মদ) তোমরা পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখিয়া নাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল? (কুল্, সিরু ফীল্ আরদে ফান্‌জুরু কাইফা কানা আকেবাতুল লাজীনা মিন্ কাবলু)। তাহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক (অংশীবাদী)। (কানা আক্সারুহ্‌ম্ মুশরেকীনা)।

৪৩। সুতরাং তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে দ্বীনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কর, সেই দিন আসিবার পূর্বে যেই দিন আল্লাহর পক্ষ হইতে কোনো কিছু প্রত্যাহার করা হইবে না অথচ (মানুষ) সেই দিন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। (ফাত্মাকেম ওয়াজ্‌হাকা লীদ্‌দীনিল্ কাইয়েম্‌মে মিন্ কাবলে আন্ ইয়াতীইয়া ইয়াওমুন্ লা মারাদ্দা লাহ্ মিনাল্লাহে ইয়াওমায়েজীন্ ইয়াস্‌সাদ্দাউনা)।

৪৪। যেই ব্যক্তি কুফরি করিবে সুতরাং তাহার কুফরির শাস্তি তাহারই উপর বর্তাইবে এবং যেই ব্যক্তি সংকর্ম করিবে সুতরাং সেই নিজের নফসের জন্যই সুখশয্যা রচনা করিবে। (মান্‌কাফারা ফাত্মালাইহে কুফরুহ্, ওয়া মান্ আমেলা সালেহান্ ফালেআনফুসেহীম্ ইয়াম্‌হাদুনা)।

৪৫। যাহারা ইমান আনয়ন করিয়াছে এবং আমলে সালেহা (সংকর্ম) করিয়াছে, তাহাদেরকে যেন (আল্লাহ) নিজ দয়ায় (অনুগ্রহে) পুরস্কৃত করিতে

পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না। (লেইয়াজ্জীয়ালাজীনা আমানু ওয়া আম্মেলুস্ সালেহাতে মিন্ ফাদলেহী ইল্লাহ্ লা ইউহেব্বুল্ কাফেরীনা)।

৪৬। এবং তাহার আয়াত (নিদর্শন)-এর মধ্য হইতে ইহাও রহিয়াছে যে, তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদদাতারূপে বাতাসকে প্রেরণ করেন। যাহাতে তিনি তোমাদেরকে তাহার রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করাইতে পারেন, এবং তাহার নির্দেশেই জৌযান প্রবাহিত হয় (চলাচল করে)। যেন তোমরা তাহার অনুগ্রহ হইতে কিছু পাইতে পার এবং যাহাতে তোমরা তাহার কৃতজ্ঞতা (শোকর) আদায় করিতে পার। (ওয়ামিন্ আয়াতেহী আন্ ইউরসেলার রিইয়াহা মুবাসশেরাতীন ওয়া লেইউজীকাকুম্ মিন্ রাহ্মাতেহী ওয়া লেতাজ্জরীইয়াল্ ফুলকু বে-আম্মরেহী ওয়া লেতাব্তাণ্ড মিন্ ফাদলেহী ওয়া লাআল্লাকুম্ তাশ্কুরুনা)।

৪৭। এবং অবশ্যই আমরা তোমার পূর্বেও তাহাদের কওমের (সম্প্রদায়ের) নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর তাহারা তাহাদের নিকট বাইয়ে্যেনাতসহ আসিয়াছিল। (ওয়াল্লা কাদ্ আরসাল্না মিন্ কাবলেকা রুসূলান্ ইলা কাওম্মেহীম্ ফাজ্জাউহম্ বিল্ বাইয়ে্যেনাতে)। অতঃপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। (ফান্তাকাম্না মিনাল্লাজীনা আজ্জরাম্মু)। কেননা আমাদের উপর মোমিনদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য। (ওয়াকানা হাক্কান্ আলাইনা নাসরুল্ মু'ম্মেনীনা)।

৪৮। এবং আল্লাহ্ তিনিই যিনি বাতাস প্রেরণ করেন। অতঃপর মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, তারপর তাহাকে যেইভাবে ইচ্ছা আকাশের মধ্যে ছড়াইয়া দেন এবং তাহাকে (মেঘমালাকে) নির্বাচিত করেন স্তরে স্তরে। (আল্লাহল্লাজী ইউরসেলুর রিইয়াহা ফাতুসীরু সাহাবান্ ফাইয়াবসুতুহ ফীস্ সাম্মায়ে কাইফা

ইয়াশাউ ওয়া ইয়াজ আলুহ কেসাফান)। অতঃপর তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহার মধ্য হইতে বৃষ্টির ধারা বাহির হইয়া আসিতেছে। (ফাতারান্ ওয়াদকা ইয়াখরুজু মিন্ খেলালেহী)। অতঃপর তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাদের নিকট উহা পৌছান যাহাতে তাহারা আনন্দ লাভ করে। (ফাইজা আসাবাবিহী মান্ইয়াশাউ মিন্ এবাদেহী ইজাহম্ ইয়াস্তাবশেরানা)।

৪৯। অথচ ইহা তাহাদের উপর নাজেলের (বর্ষণের) পূর্বে তাহারা নিরাশায় ছিল। (ওয়া ইনকানু মিন্ কাবলে আন্ ইউনাজ্জালা আলাইহীম্ মিন্ কাবলেহী লাম্মোবেলসীনা)।

৫০। সুতরাং তুমি দেখিয়া নাও যে, আল্লাহর রহমতের কার্যকারিতা কেমন? তিনি কিভাবে মৃত্যুর পর পৃথিবীকে (দেহকে) জীবিত করেন? (ফানজুর ইলা আসারে রাহামাতীল্লাহে কাইফা ইউহঈল্ আরদা বাদা মাওতেহা)। নিশ্চয়ই ওইভাবেই (আল্লাহ) মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান। (ইন্না জালীকা লামুহয়ীল্ মাওতা, ওয়াহয়া আলা কুল্লেশাইইন্ কাদীকুন)।

৫১। এবং আমরা যদি এমন বাতাস পাঠাই যাহার ফলে তাহারা দেখিতে পাইবে যে, (বাতাসের ফলে তাহাদের শস্যক্ষেত) হলুদ রং (বিবর্ণ) ধারণ করিয়াছে, এরপর তাহারা কুফরি করিতেই থাকে। (ওয়ালা ইন আরসাল্না রীহান্ ফারাআওহ মুস্ফাররান্ লাজাল্লু মিন্ বাদেহী ইয়াক্ফুরানা)।

+৫২। সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি মৃতদেরকে শোনাইতে পারিবে না এবং বধিরকেও তোমার ডাক শোনাইতে পারিবে না। বরং তাহারা উল্টা মুখ ফিরাইয়া নিবে।

(ফাইন্লাকা লা তুসম্বেউল মাওতা ওয়ালা তুসম্বেউস সুম্মাদ্দুয়াআ ইজা ওয়ালা ও মুদবেরীনা)।

+৫৩। অন্ধদেরকেও তুমি তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে হেদায়েতের পথ দেখাইতে পারিবে না। (ওয়াম্মা আন্তা বেহাদীল উম্মই আন্ দালালাতেহীম)। তুমি তো তাহাদেরকেই শোনাইতে পার। যাহারা আমাদের আয়াত (নিদর্শন)-সমূহের উপর ইম্মান আনয়ন করিয়াছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহারাই হইতেছে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। (ইন্ তুসম্বেউ ইল্লা মন্ ইউম্মেনূ বে-আইয়াতেনা ফাহম্ মুসলেমূনা)।

+৫৪। আল্লাহ তো তিনিই, যিনি তোমাদেরকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর দুর্বলতার পরে শক্তিদান করিয়াছেন, তারপর শক্তির পর দুর্বলতা ও বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন। (আল্লাহল্লাজী খালাকাকুম্ মিন্দুফীন্ সুম্মা জাআলা মিন্বাদেদুফীন্ কুওয়্যাতান্ সুম্মা জাআলা মিন্বাআদে কুওয়্যাতীন্ দুফান্ ওয়া শাইবাতান্)। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং তিনিই তো হইলেন সর্বজ্ঞ (এবং) শক্তিমান। (ইয়াখলুকু মা ইয়াশাউ, ওয়াহওয়াল্ আলিমুল্ কাদীর)।

৫৫। এবং যেইদিন সাআত্ (কেয়ামত) প্রতিষ্ঠিত হইবে সেইদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে, তাহারা এক মুহূর্তের বেশি (পৃথিবীতে) অবস্থান করে নাই। এভাবেই তাহারা তো উল্টা পথে ফিরিয়া যাইতো। (ওয়া ইয়াওম্মা তাকুমুস্ সাআতু ইউক্সেমুল্ মুজ্জেমূনা মা লাবেসু গাইরা সাআতীন, কাজালীকা কানু ইউফাকূনা)।

৫৬। এবং যাহাদেরকে জ্ঞান ও ইম্মান দান করা হইয়াছে তাহারা বলিবে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর লেখা অনুযায়ী পুনরায় উঠানো পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ।

(ওয়ালালালালালালালা উতুল এল্লা ওয়াল ঈমানা লাকাদ্ লাবেসতুম্ ফী কিতাবিল্লাহে ইলা ইয়াওমিন্ বাআসে)। সুতরাং ইহাই হইল পুনরুত্থান দিবস। কিছু তোমরা তো তাহা জানিতে না। (ফাহাজা ইয়াওমিন্ বাআসে ওয়ালা কিন্না কুম্ কুনতুম্ লা তাআলামুনা)।

৫৭। সুতরাং সেইদিন জালিমদের ওজর-আপত্তি তাহাদের কোনো উপকারেই আসিবে না এবং তাহাদের অনুশোচনাও (গ্রহণ) করা হইবে না। (ফাইয়াওম্মায়েজীন্ লা ইয়ান্ ফাউল্ লাজীনা জালামু মাজেরাতুহুম্ ওয়ালাহুম্ ইউশ্‌তাআবুনা)।

৫৮। এবং অবশ্যই আমরা মানুষদের জন্য এই কোরান-এর মধ্যে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছি। (ওয়ালাকাদ্‌দারাবনা লীনাসে ফী হাজাল্ কোরআনে মিন্‌কুললে মাসালীন)। এবং যদি তুমি তাহাদের নিকট কোনো প্রকার আয়াত (নিদর্শন) নিয়া আগমন কর তখন কাফেররা অবশ্যই বলিবে যে, তোমরা তো বাতিলপন্থী ব্যতীত আর কিছুই নও। (ওয়ালাইন্ জেতাহুম্ বেআইয়াতীন্ লাইয়াকুলান্নাল্লাজীনা কাফারু ইন্ আনতুম্ ইল্লা মুবসেলুনা)।

+ ৫৯। এইভাবেই যাহারা জানে না (জান রাখে না) আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেন। (কাজালিকা ইয়াত্বাউল্লাহ আলা কুলুবীললাজীনা লা ইয়ালামুনা)।

৬০। সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য, বরং যাহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত (চিন্তিত) করিতে না পারে। (ফাসবের ইন্না ওয়াদাল্লাহে হাক্কুন্ ওয়ালা ইয়াস্ তাখেফ্‌ফান্না কাল্ লাজীনা লা ইউকেনুনা)।

বি. দ্র. হাতের কজ্জি চিহ্নিত আয়াতগুলো বার বার পাঠ করুন। চিন্তা করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন। অবশেষে গবেষণা করুন।

হাদিস সংগ্রহের নানা কথা

মহানবির অনেক বাণী (হাদিস) আছে যা মহান সাহাবাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। এইসব পবিত্র বাণী তথা হাদিসের আর কোনো সনদের প্রয়োজন হয় না। তবুও কিছু সনদটি বাদ দেওয়া হয় নি। কারণ কেউ যদি কোনোদিন অস্বীকার করতে চায়! তাই সব কিছু পাকাপাকি দলিল সম্মত লিখিত আছে। আমরা জানি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সাহেব দশ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন তবে নয় লক্ষ সত্তর হাজার হাদিস ফেলে দিয়েছেন এই বলে যে, কোরান-এর মানদণ্ডে টেকে না। এখন প্রশ্ন হলো, সমগ্র কোরান-এর মানদণ্ডটি হজরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের দৃষ্টি ও দর্শনেই কি শেষ সিদ্ধান্ত? অবশ্যই উনি যা কিছুই করেছেন পবিত্র নিয়তেই করেছেন বলে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আল্লাহ যেখানে বলেছেন যে, পৃথিবীর সবটুকু পানি যদি কালি হয় আর গাছগুলো কলম হয় তবুও কোরান-এর ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না ॥ তা হলে একজন মনীষী তা তিনি যত বড় জ্ঞানীই হন না কেন, তিনি কি কোরান-এর সবটুকু বুঝবার মানদণ্ড হতে পারেন? অনেক ইসলাম-গবেষকদেরকে বলতে শুনি যে, সংগ্রহ করা সবগুলো হাদিস

প্রত্যেক হাদিস সংগ্রহকারী তুলে ধরে যদি বলতেন যে হাদিস সংগ্রহ করার কাজটি করেছি এবং তা হবহ তুলে ধরলাম, গবেষকদের যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্তটি নেবার দায়িত্বটি দিয়ে গেলাম ॥ এতে গবেষকদের মতপার্থক্য অবশ্যই দেখা দিত এবং এখনও কি এই মতপার্থক্যটি আমরা দেখতে পাই না? তা হলে এমনও তো হতে পারে, এই একক যাচাই-বাছাইয়ের প্রশ্নে অনেক মূল্যবান হাদিস আমরা হারিয়ে ফেলেছি! কারণ সেই যুগের মানদণ্ডে এবং সেই যুগের ধ্যান-ধারণার পরিবেশের উপর দাঁড়িয়ে বিচার করেই গ্রহণ-বর্জন করা হয়েছে। আবার অনেক গবেষক বলেছেন যে, এত ডেজাল হাদিস বানানো হয়েছে যে, তা লোকের মুখে মুখে ফিরতো বলেই হাদিস সংগ্রহকারী মনীষীরা যাচাই-বাছাই করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তা হলে এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সেই যুগেও ॥ যে-যুগে অধিকাংশ মানুষ সত্যবাদী, মহৎ ও আদর্শবাদী ছিলেন, তখনও মহানবির নামে বহু জাল হাদিস চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতাটি ছিল। তখনকার দিনেও কিছু মানুষের বুক খর খর করে কেঁপে ওঠে নি যে, কী করে মহানবির নামে জাল হাদিস তৈরি করছি! তা হলে বোঝা গেল, সেই যুগেও কিছু মানুষ এ রকম মহাপাপ কাজটি করলে পরকালে যে সুনিশ্চিত জাহান্নামে যেতে হবে সেটা ভেবেও করতে পেরেছে। তা হলে কি এটাকে অবিশ্বাস, প্রতারণা, ধান্দাবাজির চেয়েও জঘন্য কিছু একটা ধারণায় আসে না? কারণ মহানবির নামে জাল হাদিস বানাতে কি তাদের বুক-বিবেক এতটুকু আহত হয় নি? তাদের হাতের কলম কি খর খর করে কেঁপে ওঠে নি? পরকালে এদের শাস্তিটা কেমন হবে এটা আল্লাহ এবং তার রসূলই ভালো জানেন। সুতরাং হাদিস সংগ্রহ করতে গিয়ে সংগ্রহকারীকে খুব সাবধান হতে বাধ্য করা হয়েছে। ডেজাল খাদ্যে বাজার ছেয়ে গেলে যেমন মানুষ খাঁটিটা হন্যে হয়ে

খোঁজে এবং খুঁজতে বাধ্য করা হয়, তেমনি তাঁরাও সংগ্রহ করতে গিয়ে সতর্ক হতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং অনেক হাদিসও জাল হাদিসের সঙ্গে বর্জন করতে বাধ্য করা হয়েছে। কারণ সেই যুগে টেপ করার যন্ত্রটি ছিল না যে কাশিটুকুও হবহ তুলে ধরা যাবে। জাল হাদিসের নমুনা তুলে ধরার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন মহানবি বলেছেন যে, বেগুন সর্বরোগের ঔষধ। এই হাদিসটির সনদ যত শক্ত আর নির্ভরযোগ্যই হোক না কেন, বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব বিচারে বেগুন যে সর্বরোগের ঔষধ হতে পারে না এটা সবাই একবাক্যে মেনে নেবে। তবে একটা কথা কিছু থেকে যায় যে, এখন এই মুহূর্তে মানব জিন আবিষ্কার হয়েছে যা কিছুদিন আগেও কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। ধরে নিলাম, ঠিক সে রকমভাবে যদি কোনো অনাগত কালের বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন যে, বেগুনের মাঝে যে দুর্লভ এবং অতি সূক্ষ্ম কেমিক্যালটি আবিষ্কার হয়েছে উহার দ্বারা মানব শরীরের জিনগুলোর অপূর্ব চিকিৎসা চলে; তা হলে আজ এবং আগেও যারা হেসেছে তাদের অবস্থাটি কেমন হবে? ক্লোন করে জীবন বানানো হচ্ছে ॥ এটা এখন এই সর্বাধুনিক যুগেই একটা বিষয় যা মানুষকে অনেকটা গলাধাক্কা খাওয়া বিশ্বাসীতে পরিণত হতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং এই বিষয়টির উপর যদি মহানবির বাণীটি থাকতো তো সবাই হাসতে হাসতে ছুঁড়ে ফেলে দিত। কারণ সেই যুগে ইহা চিন্তা করাটাও মহাপাপ।

অধম লিখকের একটি অভিজ্ঞতার পুরনো স্মৃতি জীবনেও ভুলতে পারি না, বরং মনে হলে আপন মনে হাসতে থাকি। একদিন এ রকম অকারণে হাসতে দেখে আমার বড় মেয়ে ধরে বসলো। অবশেষে বলতে বাধ্য হলো।

উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের একটি অভিজ্ঞতা। আমাদের শুভাচ্যা ইউনিয়নের তখন প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে চেয়ারম্যান বলা হয়) ছিলেন জনাব আজিজুর রহমান

চৌধুরী ওরফে জুলু চৌধুরী। টিনের চুস্কা (যেটা এখন চানাচুর বিক্রিতে ব্যবহার হয়) দিয়ে এখানে-সেখানে ঘোষণা করা হলো যে, আজ সন্ধ্যার সময় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়িতে (বেশ বড় দুয়ারে) কলের গান শোনানো হবে। আপনারা দেখতে পাবেন যে, কেমন করে কলে গান গায় ॥ ইত্যাদি। তারপর সন্ধ্যার পর বেশ কিছু মানুষ কলের গান শোনার বিরাট কৌতুহল আর বিস্ময় নিয়ে হাজির হলো এবং আমি অধম লেখকও। কলের উপর বসানো ইঁয়া বড় চেউতোলা পিতলের বড় চোঙ্গা, কলে একটা লোহার হ্যাণ্ডেল দিয়ে চাবি দেওয়া হলো। একটি কাপড়-বিছানো টেবিলটি দুয়ারের মাঝখানে বসানো ছিল। ঘূর্ণায়মান টাঁচের বানানো রেকর্ডের ওপর পিনটি বসিয়ে দিতেই গান-বাজনা শুরু হয়ে গেল (এই মিনমিনে সুরের গান এখন বাচ্চারাও শুনতে চাইবে না)। সবাই অবাক। যেন পৃথিবীর নবম আশ্চর্য দেখার চেয়েও ভয়ংকর কিছু দেখছি। আমার গ্রাম চুনকুটিয়ার পাশেই বেগুনবাড়ি নামক গ্রাম হতে কয়েকজন প্রোঢ় বয়সের মানুষ বলাবলি করছে, ‘টেবিলের কাপড়ের নিচে মানুষ গান গাইছে আর ঐ যে উপরে বসানো যন্ত্রটা হলো চোখে ধুলা দেওয়া, বুঝেছ?’ অন্যরা বললো, ‘সব কিছু বুঝে গেছি। তোমার কথা একদম ঠিক।’ আমি অধমও সেদিন তাদের সাথে একমত পোষণ করেছিলাম। আর আজ! এই একবিংশ শতাব্দীতে এই কথাগুলো বলার যোগ্যতাটুকু হারিয়ে গেছে বলে মনে হলে হো হো করে হেসে উঠি।

প্রত্যেক হাদিস সংগ্রহকারী মনীষী সেই যুগে দাঁড়িয়ে যত প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার মনে হয় তার চেয়েও বেশি করেছেন। তা হলে প্রত্যেকে লক্ষ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করার পর মাত্র কয়েক হাজার রেখে বাকিগুলো কেন ফেলে দিলেন? আন্তরিকতার প্রশ্নে তারা যে কত মহান ছিলেন তা ধারণা করতে গেলে

অবাক হতে হয়। এতে যদি বেশ কিছু সত্য হাদিস বাদ পড়ে থাকে তাও ভালো। কারণ মিথ্যার বস্তা ফেলতে গেলে কিছু সত্য হাদিস তো যাবেই। অনেকটা বলা যায় যে, বৃহত্তম স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ক্ষুদ্রতম স্বার্থটিকে বিসর্জন দেওয়া। কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, একবার হজরত ইমাম বোখারি সাহেব হাদিস সংগ্রহ করতে যাবেন অন্য দেশে। তিনি অনেকের কাছে জানতে পেরেছেন যে, সেই লোকটির কাছে বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য মূল্যবান হাদিস আছে। অবশেষে সেই দিনে কখনও উটের পিঠে, কখনও পায়ে হেঁটে সেই দেশে গেলেন। বুকভরা আশা নিয়ে সেই লোকটির বাড়িতে গিয়ে দেখা পেলেন। লোকটির কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, লোকটি একটি খালি টুকরি উঁচু করে ধরে অব্যাহত অথবা পাজি গাথাটাকে ধরার জন্য ডাকছে। গাধা মনে করেছে যে, নিশ্চয়ই মালিকের টুকরিতে খাদ্য আছে, তাই কাছে আসতেই লোকটি গাধাটিকে ধরে ফেললো এবং শূন্য টুকরিটি মাটিতে ফেলে দিল। ইমাম বোখারি এই খালি টুকরি দেখিয়ে গাধা ধরার দৃশ্যটি এবং নতুন কৌশলটি দেখে আর একটি হাদিসও গ্রহণ করা তো দূরে থাক, বরং সোজা বিদায় নিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন যে, যত মূল্যবান হাদিসই এই লোকটির কাছে থাক না কেন, এ হেন প্রতারণার আজব দৃশ্য দেখার পর এমন প্রতারকের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রথমেই প্রতারণার দৃশ্যটি দেখতে হলো! না জানি মহানবির নামে কী-না-কী বানিয়ে ফেলে। সুতরাং যে সকল ইসলাম-গবেষকেরা সব কিছু তুলে ধরার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, তাদের দুঃখের মাঝে আন্তরিকতা অবশ্যই থাকতে পারে এবং তাদের এই রকম আত্মবিশ্বাসটিকে কটাক্ষ না করে বলছি যে, এতে আরও বিপদ, আরও জটিলতা, আরও ফেরকাবাজি তৈরি হতো এবং কোনো বিষয়েই ঐক্যমত পোষণ করা কঠিন হতো। ইয়া হয়তো বলতে চাইবেন যে, আজ

এই যুগে আমাদের দুইই রুমে কত রকম হুবহু প্লাস্টিকের ফুল ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে আর এই ধরনের নকল ফুল দেখতে পেলে বোধ হয় তিনি একটি হাদিসও গ্রহণ করতেন না। না ভাই, এমন কথাটি বলতে যাবেন না। কারণ সেই যুগ আর এই যুগ এক নয়। যুগের পরিবেশটি কী করে ফেলে দিতে চান? আদমের বংশবিস্তারের জন্য কি আপন ভাই-বোনদের বিবাহ তথা যৌন মিলন হয় নি? অবশ্যই হয়েছে এবং সেই যুগে এর বিকল্প চিন্তাটি কেমন করে করা যায়? যৌন সম্পর্কটিকে তখন সন্তান জন্ম দেবার মাধ্যম বলার মাঝে কি নিগেটিভ (নেতিবাচক) কিছু একটা চিন্তা করতে চান? অনেকেই টিটকারির ভাষায় গোবর-গণেশের মতো যুক্তি দেখিয়ে বলতে চান যে, উনাদের বেলায় লীলাখেলা আর আমাদের বেলায় বদমায়েশি। হ্যাঁ, আপনি টিটকারি করে বলতে চাইলেও মনের অজান্তে একদম সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন। কারণ লতা মুন্সেজকর গান গাইলে হাজার টাকার টিকেট দিয়ে লোকে শুনতে যায়, বাংলাদেশের (মা) মমতাজ গান গাইলে শত টাকার টিকেটের বিনিময়ে শুনতে যায়, অথচ অধম লিখক যখন সেই একই গান হারমোনিয়ম দিয়ে গলা সেধে গাইতে শুরু করি তখন মাগনা শোনা তো দূরে থাক, বরং কুকুরসমূহের আগমনপূর্বক ঘেঁউ ঘেঁউ ধমকটি শুনে হাঁশ আসে যে, না তো! আমার বেলায় যা-তা, কিছু লতা-মমতাজের বেলায় ঠিকই লীলাখেলা। আসলেই সমাজে বেশ কিছু মানুষ আছে যারা কেবল নিগেটিভটাই দেখতে ভালোবাসে এবং সমালোচনা করে তৃপ্তি পায়। অনেক ইসলাম-গবেষক বলতে চান যে, ইমাম বোখারি এত সাবধানতা অবলম্বন করার পরও তো কয়েক লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার নির্ভরযোগ্য হাদিস মনে করে গ্রহণ করলেন এবং বাকিগুলো বর্জন করলেন। গবেষকেরা বলতে চান যে, ইমাম

বোখারি সাহেব কি সত্য-মিথ্যা হাদিস যাচাই-বাছাই করার একমাত্র মানদণ্ড? তারা আরও বলেন যে, এতো যাচাই-বাছাই করার পরও তো বেশ কিছু হাদিসের উপর গবেষকেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। তা হলে সবগুলো হাদিস রেখে দিলে কি ভালো হতো না? অবশ্য উনি কেবল একাই এ রকম কাজটি করেন নি, বরং সব হাদিস-সংগ্রহকারীরাই নিজেদেরকে বিচারকের মানদণ্ডে বসিয়েছেন এবং এতে আমরা দোষারোপ করতে যাচ্ছি না, বরং অনুরোধের ভাষায় আবেদন করলাম। আর তা ছাড়া অনুরোধ করেই বা কী লাভ হবে? কারণ যা হবার তা তো হয়েছে। গবেষকদের এ রকম মতামতের স্বাধীনতা না থাকলে গবেষণার কাজটির মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠবে এবং গবেষণার স্বাধীনতাটুকু হরণ করা হয়। ইমাম বোখারি সাহেব একটি হাদিসে মাওলা আলির পিতা আবু তালেবকে দোজখের খড়ম পরিষে দিয়েছেন মাত্র সামান্য সময়ের জন্য। এতেই আবু তালেবের মাথার মগজ গলে শরীর বেয়ে পড়তে থাকবে। অনেক গবেষক এই হাদিসটির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। গবেষকেরা প্রথমে বলেন যে, আর যত রকম হাদিস গ্রন্থ আছে সেইসব বিরাট বিরাট হাদিস গ্রন্থের একটিতেও এই জাতীয় আর একটিও হাদিস নাই। কেবলমাত্র এই একটিই, যা ইমাম বোখারি সাহেব বর্ণনা করেছেন। আর অপর কথাটি গবেষকেরা বলেন যে, একজন সাধারণ মুসলমানের বিবাহের উকিলদাতা বা পিতা অন্য কোনো ধর্মের হতে পারবে না এবং কাফের হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ মহানবির সঙ্গে যখন মা খাদিজাতুল কোবরার বিবাহ দেওয়া হয় সেই বিবাহের উকিলদাতা বা পিতা ছিলেন এই মাওলা আলির পিতা আবু তালিব। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম এবং মুফতি, যিনি নয় মাস ইউরোপেই ওয়াজ করেন এবং তিন মাসের জন্য বাংলাদেশে আসেন, সেই মুফতি আজম গাজী আবু তাহের

রহমানপুরী এবং খাঁটি আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী যখন ওয়াজের মধ্যে বার বার হজরত আবু তালিব আলাইহে সালাম সালাম বলছিলেন তখন দেখতে পেলাম, আরও অনেক বড় বড় আলেম-উলামারা প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, বরং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছেন এবং মারহাবা তথা ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এমনকি খাবার টেবিলে বসে আবু তালেব সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য তুলে ধরলেন এবং আমরা শুনলাম।

প্রচার মাধ্যম নিয়ে আক্ষেপ

আমাদের কপাল খারাপ যে, বাংলাদেশের টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোতে ওহাবি দ্বিষে ইসলামের বাণী শোনানো হচ্ছে। যদি কোনোদিন আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত কখনও নাফেল হয় তো যে দিন সুন্নি আকিদার মাত্র একটি টেলিভিশনের চ্যানেল খোলা হয় তো আলো জ্বালিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেমন পালিয়ে যায় সে রকম অবস্থাটি হবে এবং শ্রোতারা তওবা তওবা করবে। কারণ হাজার হাজার বিশ্ববিখ্যাত ওলিদের কথা ও দর্শন এক রকম এবং ওহাবি মাওলানাদের কথা ও দর্শন সম্পূর্ণ তার উল্টা। ওলিদের কথাটি হলো, মাধ্যম তথা উসিলা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওহাবিরা মাধ্যম তথা উসিলা ধরাটি মানে না, বরং শেরেক-বেদাতের ফতোয়া দেয়। দুই দলেরই যুক্তি আছে তবে ওলিদের কথাটি কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রশ্নে নয়, বরং বাস্তব জগতে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্নেও মাধ্যমটি তথা উসিলাটির প্রয়োজন হয়। ওলিরা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলে থাকেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর কালাম সরাসরি বান্দাকে দেন নি, বরং আল্লাহ তাঁর কালাম পাঠাতে গিয়েও দুইটি

মাধ্যম তথা উসিলা গ্রহণ করেছেন। প্রথমে জিবরাইল পরে মহানবি, প্রথমে জিবরাইল পরে হজরত ইসা নবি এবং প্রথমে জিবরাইল পরে হজরত মুসা নবি এবং আরও নাম না জানা সর্বমোট একশত চারখানা কিতাব পাঠাতে গিয়ে দুইটি মাধ্যম তথা উসিলা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তো সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর কালাম তথা বাণী সরাসরি বান্দাদের নিকট দিতে পারতেন। তিনি তাঁর কালাম আকাশে আলোর অক্ষরে লিখে দিতে পারতেন। মেঘের যেমন গর্জন হয় সে রকমভাবে গর্জন করে কালাম শোনাতে পারতেন এবং আরও অনেক নিয়মে সরাসরি পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো তা করেন নি, বরং দুইটি মাধ্যম, দুইটি উসিলা তথা দুইটি মিডিয়ায় কালাম পাঠাবার খবরটি জানতে পারি। ওলিরা বলেন যে, এই বিষয়টি দিয়েই আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, উসিলা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। আবার ওহাবিদেরও যুক্তি আছে। তাই ওহাবিরা মাধ্যম মানে না, বরং একদম সোজা আল্লাহকে ডাকার উপদেশ দেয়। এখন প্রশ্ন হলো আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন, কোনটি মেনে নেবেন? আপনার পক্ষে কোনোটাই গ্রহণ করা অথবা মেনে নেওয়াটা সম্ভবপর নয়। মোটেই নয় ॥ ইহা আমি হলফ করে বলতে পারি, কারণ আপনার জন্মের পূর্বেই আপনার তকদিরটিকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মেনে নেবার তকদিরটি পূর্বেই যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়ে থাকে তো আজ হোক আর কাল হোক আপনাকে মেনে নিতেই হবে। সুতরাং আপনার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার কথাটি এখানে একদম বেকার। আবার না মানার প্রশ্নেও একই কথা। তকদির বিষয়ের হাদিসগুলো পড়ে দেখলেই আমার কথাগুলোর সত্যতা যাচাই করা হয়ে যাবে। সুতরাং এই বিষয়গুলো যখন একজন আহলে সুন্নাতুল জামাতের আলেম পরিষ্কার ব্যাখ্যাসহ টেলিভিশনের পর্দায় তুলে

ধরবেন, তখন সবাই বুঝতে পারবেন। কিন্তু আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের আলেম-উলামাদের জন্য যে একটি টেলিভিশনের চ্যানেল খোলা হয় নি, তাই তো ওহাবিরা ফাঁকা মাঠ পেয়ে গোলের পর গোল দিয়ে যাচ্ছে। সব বিষয়ের উপর যদি আলোচনা চলতে পারে, একমাত্রা, দুইমাত্রা, তিনমাত্রা নাম দিয়ে যদি সবার কথা তুলে ধরা হয়, তো এই ধর্ম-বিষয়টি একদম একপেশে হয়ে যায়। সব ধর্মীয় দলের কথাগুলো শোনানো হলে তো গণতন্ত্রের মূল্যবোধটুকু জাগ্রতরূপ ধারণ করে। তা না হলে যে গণতন্ত্রের লেবাসে স্বৈরতন্ত্রটিকেই মনের অজান্তে গ্রহণ করে নেওয়া হচ্ছে। স্বৈরতন্ত্র চালু আছে, কোনো গণতন্ত্র নাই ॥ বলে দিলে তো আর কথাই থাকে না। আবার অনেক সময় স্বৈরতন্ত্রের রাজত্বে কোনো কোনো বিষয়ের উপর গণতান্ত্রিক আলোচনাটি শুনতে পেয়ে অবাক হই। ইতিহাসে এর অনেক নজির পাওয়া যায়। খুবই স্পর্শকাতর বিষয় বলে এখানে নাম বলা হলো না।

রুহ ও নফস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

এখন সেই রকম একটি হাদিস তুলে ধরবো, যে হাদিসটি সাহাবাদের মুখে মুখে ফিরতো এবং সবাই কন্মবেশি জানতো। সেই হাদিসটি হলো, মহানবি বলেছেন, মান আরাফা নাফসাহ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ তথা, যে কেহ নিজের নফসকে চিনতে পেরেছে, আর কোনো সন্দেহ নাই সে তার রবকে চিনতে পেরেছে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, এখানে মান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তথা যে কোনো মানুষ বলা হয়েছে। এখানে মুসলমান আরাফা নাফসাহ, আম্মানু আরাফা নাফসাহ, মোম্বিন আরাফা নাফসাহ, আলবাব আরাফা নাফসাহ, আবসার

আরাফা নাফসাহ, আলেম আরাফা নাফসাহ, মুসল্লি আরাফা নাফসাহ, গাজি আরাফা নাফসাহ ॥ এ রকমভাবে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। বিষয়টি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বলা হয় নি, বরং সার্বজনীন করে বলা হয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো মানুষ ॥ যে কোনো গোত্রের, যে কোনো জাতি এবং ধর্মেরই হোক না কেন, যদি কোনো মানুষ তার নিজের নফসকে চিনতে পেরেছে তো তার রব (পালনকর্তা)-কে চিনতে পেরেছে। কারণ প্রতিটি মানুষের নফসের সঙ্গে রুহ (পরমাত্মা) দেওয়া হয়েছে। আবার, ভালো করে খেয়াল করুন যে, এখানে মান আরাফা রুহহ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ বলা হয় নি। যে তার রুহকে চিনতে পেরেছে সে তার রবকে চিনতে পেরেছে বলা হয় নি। কারণ কী? কারণ তিনি নিজেই রুহ তথা পরমাত্মা, তাই পরমাত্মাটিকে চেনার জন্য নফসকে বলা যায়, কিন্তু রুহকে বলা যায় না। তাই মান আরাফা রুহহ বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে নাফসাহ, কারণ আল্লাহর রবরূপটি হলো প্রতিপালকের রূপ। নফসের সঙ্গে প্রতিপালকের রূপটি গাছ আর লতার মতো জড়ানো আছে বলেই আল্লাহ না বলে রাব্বাহ বলা হয়েছে। যদিও আল্লাহ আর রাব্বাহ বলতে মূলে একই বিষয়। কিন্তু নফসের কথা বললেই প্রায় স্থানেই আল্লাহ না পেয়ে রাব্বাহ পাই। কী বিজ্ঞানময় শব্দ চয়ন! আবার মানুষ এবং জিনের নফসকেই বলা হয়েছে। কারণ যদিও জীবজন্তুতে নফস দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই নফসের পাশে আল্লাহকে রুহরূপে থাকার কথাটি পাই না। রুহরূপটি বিকশিত হলেই রবরূপ ধারণ করে তথা আল্লাহ পাক স্বয়ং আপনরূপে মূর্তিমান। তাই আল্লাহ বলছেন যে, তাঁর প্রিয় বান্দার কান, চোখ ইত্যাদি তাঁর হয়ে যায়। এখানেও অনেক সূক্ষ্মদর্শী সূক্ষ্ম ভুলটি করে ফেলেন এবং এই ভুলটি হলো, ফেরেশতাদেরকেও রুহের

অধিকারীর আসনে বসিয়ে ফেলেন। অথচ ফেরেশতাদের নফসও নাই এবং রুহও নাই। দুইটির একটিও ফেরেশতাদের দেওয়া হয় নি। তাই ফেরেশতাদের সবাই একবাক্যে মেনে নিয়ে বলেছেন যে, আদমের যে অসীম জ্ঞান সেই জ্ঞানের ধারে কাছেও আমরা নাই। কেবলমাত্র যে সীমিত জ্ঞানটুকু দেওয়া হয়েছে সেটাই আমাদের সম্বল। সুতরাং রুহের অধিকারী আদম। কোনো ফেরেশতা নয়। বিষয়টা আরও জটিল রূপ ধারণ করে যখন গবেষক দেখতে পায় রুহ বিহীন ফেরেশতাকে কোরান-এর অনেক স্থানে রসুলরূপে পাঠানো হয়েছে। যদিও ফেরেশতাদেরকে নবিরূপে পাঠানোর একটি বাক্যও সমগ্র কোরান-এ নাই। তাই আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, নবি বড় রসুল ছোট। কারণ রসুল মানুষ এবং ফেরেশতা উভয় শ্রেণী হতে মনোনীত করা হয়। কিন্তু নবি কেবলমাত্র মানুষ হতেই নির্বাচন করা হয়েছে। এই প্রাথমিক সূত্রগুলো জানা না থাকলে গবেষণার বইগুলোয় যে আত্মবিরোধের সমাহার থাকবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে! এ রকম আত্মবিরোধ দিয়েই আমরা বইপুস্তকগুলো ভরপুর দেখতে পাই। একেকটা বই আত্মবিরোধের ঝুড়ি অথচ ধরতেই পারি না যে এগুলো আত্মবিরোধের ঝুড়ি। তারপর ভুল ধরতে গেলে আরও বিপদ। কেউটে সাপের মতো উত্তেজনায় ফাঁস ফাঁস করে ছোবল মারতে চায়। কারণ সব কিছু যারা জেনে গেছে, বুঝে গেছে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়াটাও এক ধরনের বোকামি। তবে কি অপ্রিয় সত্যকথাটি বলার মতো যোগ্য গবেষকের অভাব অনেক বেশি, না কম? পাঠক বাবা-মায়েরাই বিচার করবেন। অনেকে তো মূল বিষয়টি না জেনেই হাদিস-কোরান হতে অনেক কথা তুলে ধরে গবেষণামূলক বই লিখে চলেছেন এবং লেখার গণতান্ত্রিক অধিকার অবশ্যই আছে, কিন্তু সবাই মিলে-মিশে ভাই-ভাইয়ের মতো

আপোষে নিজেদের ভুলগুলো শুদ্ধ করে নিলে কি ভালো হয় না? এতে কি মনঃস্থ এবং ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনটি আরও শক্ত হয় না? আমরা সত্যটি জানবার আগ্রহ দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছি। আমরা দলকে ভালোবাসি, গোষ্ঠিকে ভালোবাসি, সম্প্রদায়কে ভালোবাসি, জাতিকে ভালোবাসি॥ কিন্তু সার্বজনীন সনাতন সত্যটিকে উপেক্ষা করে চলি এবং এটা একটা মানবজীবনের জন্য কতই না বড় দুর্ভাগ্য!

নফসের ভিতরেই অগুরুপে রুহের অবস্থান। লোভ, মোহ আর মায়া নামক কুয়াশাগুলো দূর করতে পারলেই সাধক দেখতে পায়, নিজের নফসের ভিতরেই তো রুহ বিরাজ করছে। অন্য কোথাও নয়। অন্যসব স্থানে রুহের প্রত্যক্ষ প্রকাশটি নাই, একমাত্র মানবের নফস ছাড়া। (জিনের কথাটি ইচ্ছা করেই বাদ দিলাম)। সৃষ্টির অন্যসব স্থানে জাতের সীমাতসমূহ বিরাজ করছে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। মানুষের নফস বিশেষ সীমাত। তাই জাতের প্রত্যক্ষ রূপটি ধরা পড়ে। এই জাত এক, একক এবং অখণ্ড। তখনই সাধক দেখতে পান, তিনি ওয়াহাদাহ লা শারিকালাহ। বিভাগ, বিভাজন, খণ্ডিত দর্শনের তখনই হয় মৃত্যু। তখনই সাধক আপন নফসকে চিনতে পারে। তাই যে নফস নিজেকে চিনতে পারে নাই সেই নফস অন্য নফসটিকে (যিনি আপন নফসটি চিনতে পেরেছেন) কেমন করে বুঝতে পারবে? আলো আর অন্ধকার এককথা নয়। জ্ঞানী আর অজ্ঞানী এককথা নয়! প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এককথা নয়! তাই দুইজনের কথা বলা, চাল-চলন কখনওই এক হতে পারে না। দুজনের দর্শন দুই রকম। এক করে দেখতে গেলেই আত্মবিরোধের বুড়ি দেখতে হয় বার বার। একটি দর্শন খান্নাসের, অপরটি পরমের। জটিলতার জট পাকিয়ে যায়। খুলতে না পেরে

দিশেহারা হতে হয়। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয়। বিষণ্ণতায় সত্য-মিথ্যাটি ফারাক করতে পারে না।

একটি মানুষের ভেতর তিনটি শক্তি পাশাপাশি অবস্থান করে : নফস, খান্নাসরূপী শয়তান এবং রুহরূপী রব। তাই কোরান বলছে যে, আল্লাহপাক প্রতিটি মানুষের শাহারগের নিকটেই অবস্থান করেন। (এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি জ্ঞানতে হলে বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী রচিত সিররে হক জাম্মে নূর বইটি পড়ে দেখতে পারেন, এবং মূল বইটি উর্দু, ফারসি এবং আরবি-সহ অনুবাদটি পাবেন সুরেশ্বর দরবার শরীফে)।

শয়তানের অবস্থান কোথায়

যে কোনো ব্যক্তি যদি সাধনার দ্বারা আপন নফসকে চিনতে পারেন তো সে তার প্রতিপালক তথা রবকেও চিনতে পারবেন। হাদিসের বাণীটি একদম সার্বজনীন। তাই বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে এই সুসংবাদটি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, নফসকে (জীবাত্মা) চিনতে পারলে রুহকে (পরমাত্মা) তথা রবকে তথা প্রতিপালককে চেনা যাবে, জানা যাবে এবং আপন পরিচয়ের রহস্যটি পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়বে। নফস আর রুহের মাঝখানে পর্দা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খান্নাসরূপী শয়তান। এই খান্নাসরূপী শয়তানকে ধরাই যায় না এবং মনেই হয় না যে, খান্নাস কেমন করে দুইয়ের মাঝে পর্দা হয়ে থাকতে পারে। ষোলআনা খাঁটি দুধের মধ্যে যদি এক ছটাক পানি মিশিয়ে দেওয়া হয় তো পানির পরিচয় জানবার আর অবকাশ থাকে

না। ধরবার উপায় থাকে না। তাই তো প্রতিটি মানুষ মনে করে যে, খান্নাসরুপী শয়তান আবার কেমন করে মিশে আছে! তাই মানুষ শয়তানটিকে দেহের বাহিরে খোঁজে। সে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, শয়তান কেমন করে আমাদের দেহেতে বিরাজ করছে। বিশ্বাস নাই বলেই শয়তানটির বাহিরে অবস্থান করার ধারণাটি জন্মায়। অথচ কোরান বলছে, শয়তানকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে মাত্র দুইটি স্থানে অবস্থান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেই দুইটি স্থান হলো জিন ও মানুষের অন্তর। এমনকি মানুষের দেহের কোনো অংশেই শয়তান থাকে না, কেবলমাত্র অন্তরটিতে ছাড়া। সুতরাং শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্তরটি পাকপবিত্র। সুতরাং অন্তর যখন পাকপবিত্র তখন সমস্ত দেহটিও পাকপবিত্র। এই বিষয়ের ওপর একটি মশহুর হাদিস অনেকেরই জানা থাকার কথা। তবে আমরা সেই হাদিসটি মূল আরবিসহ অনুবাদ করে জায়গা মতো তুলে ধরবো। শয়তানের অবস্থানটি রূপক ভাষায় বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে গেলে কুয়াশার কথাটি মনে পড়ে। শীতের দিনে অনেক সময় সকাল বেলায় এমন ঘন কুয়াশা পড়ে যে, পথ-ঘাট, নদী-নালা কিছুই দূর হতে দেখা যায় না। তখন নদীপথে লঞ্চ স্টিমার এবং আকাশপথে প্লেন আর রাস্তায় গাড়ি চালানো যায় না। সূর্য উঠে যখন কুয়াশা কেটে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় তখনই সব কিছু চলতে পারে। কুয়াশায় যেমন কাছের জিনিসটি দেখা যায় না তেমনই শয়তান নফস আর রুহের মাঝে কুয়াশার মতো পর্দা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই লালন বলেছেন, লালন মরে জল-পিপাসায় থাকতে নদী মেঘনা, অর্থাৎ আমাদেরই শাহারগের নিকটে আল্লাহ্ আছেন অথচ মনে হয় লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করছেন। আপনাকে আর চেনা হয় না এই শয়তানরুপী কুয়াশার ঢেকে রাখার দরুন। এই শয়তানরুপী কুয়াশাটাই মায়ার শক্ত এবং চিকন বন্ধন। মনে হয় কোনো

বন্ধন নাই অথচ মায়ার অদৃশ্য বন্ধনে বন্দী হয়ে আছি। এই খান্নাসরূপী শয়তানের বন্ধনটি যে কত শক্ত, কত শক্তিশালী তা টের পাওয়া যায় তখনই যখন সাধক মোরাকাবায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবার পর বুঝতে পারে। সুতরাং মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া নিজেকে চেনা এবং জানাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই মহানবি তাঁর নিজের জীবনে খলিলের কাবা ছেড়ে হেরাণ্ডহায় মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি পনের বছর (একটানা নয়) করে বিশ্ববাসীকেই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া আপন পরিচয় জানা মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই বড় বড় ওলিরা বলেন যে, ফানা গাস্তাম, ফানা গাস্তাম, মান নম্বিদানাম তথা ‘ফানার মোকামে অবস্থান করার সময় আমি কিছুই জানি না’ অর্থাৎ ফানার মোকামে একাকার হয়ে যায় তথা গ্লাসের পানি পুকুরে ঢেলে দিলে গ্লাসের অবস্থানটির কথা আর মনে থাকে না। কারণ অনেক পানির সঙ্গে মিলে মিশে সব কিছু একাকার হয়ে যায়।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি এই চরম সত্যটিই তুলে ধরেছেন তাঁর রচিত মসনভি শরিফ-এ এবং ব্যবহারিক জীবনের ঘটনার ইতিহাসটির গুরুত্ব অল্লেখ্য দিয়েছেন। রুমি মানবজীবনের আসল ও একমাত্র লক্ষ্য আত্মপরিচয় জানবার জন্য পথপরিক্রমা সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন গল্প ও রূপক কাঠামো তৈরি করে। তাই তিনি বলেই ফেলেছেন যে, তিনি কোরান-এর মূল বিষয়টি গ্রহণ করেছেন এবং বাকি অংশটুকু শাস্ত্রবিদদের জন্য রেখে গেছেন। তাই শাস্ত্রবিদেরা অনেকেই রুমির এরূপ মন্তব্যে খুশি হতে পারেন নি, বরং চাপা একটি ক্লোভ প্রায়ই ছাইচাপা আগুনের মতো জ্বলছে। আর ওহাবি ও শিয়ারা তো রুমির নামটাই শুনতে পারে না। কারণ, এই দুইটি ফেরকা অধ্যাত্মবাদকে সরাসরি অস্বীকার করে। তাই ওহাবিরা রুমিকে পাঁচ

শ্রেষ্ঠ কাফেরদের (?) একজন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছে। ওহাবি এবং শিয়াদের আচার-আচরণে এত বেশি আত্মবিরোধের বুড়ি পাওয়া যায় যে, একটু নিরপেক্ষ গবেষণা করতে গেলেই দিবালোকের মতো ধরা পড়ে। কোরান-এর সূরা ইব্রাহিমে আল্লাহ বলছেন যে, এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায় নাই যে, সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহ বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেবার জন্য মহামানব (রসূল) পাঠানো হয় নি। তা হলে আমরা দেখতে পাই, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আঞ্চলিকতার প্রশ্নে বিরাট পার্থক্য থাকতে পারে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মূল বিষয়ে একটি ঐক্যের সুর যেন বেজেই চলছে। কেউ সেই মূল ঐক্যটি ধরতে পারেন, কেউ আবার পারেন না। বিজাতীয় আচার-আচরণ বলে সবাই সবাইকে দোষারোপ করতে থাকেন, সমালোচনা করতে থাকেন, অনেক কিছু একে অপরের বিরুদ্ধে লিখতে পারেন, কিন্তু একটি বিষয়ে বিশেষ করে মূল বিষয়টিতে একটি অদৃশ্য ঐক্যের সুর যেন আদি হতে অন্ত পর্যন্ত বেজেই চলছে। মূল বিষয়ে যেন একটি ঐক্যের সেতু কোথায় লুকিয়ে আছে বলে গবেষকদের গবেষণায় ধরা পড়ে যায়। লালন, বুল্লে শাহ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, আমির খসরু, হাফিজ সিরাজি, সানায়ি, জামি, রুমি, কবির, জগদ্বন্ধু, সুধন বৈষ্ণব, জগদীশ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, জালালদের রচনায় কোথায় যেন একটি মহা ঐক্যের সুর বেজে ওঠে। সার্বজনীনতার সনাতন বাণীটি এঁদের কণ্ঠে ও লিখনীতে দেখতে পাই। শাস্ত্রবিদদের জটিল প্যাচে পড়ে অনেক সুফি মতবাদে বিশ্বাসীদের গায়ে সামান্য ওহাবির গন্ধ যেন লেগেই আছে। অবশ্য সমাজের চাপে অনিচ্ছাকৃত এই গন্ধটিকে তাকিয়ারূপে অনেকেই রাখতে বাধ্য হয়। আবার অনেক শাস্ত্রবিদেরাও সুফি সাজে এবং এঁদের খপ্পরে অনেকেই ধরা পড়ে।

এরাই সুফিবাদের সার্বজনীন মার্চে পায়খানা পেশাব করে উৎকট গন্ধ তৈরি করে বিষয়টি আরও বিদ্রাষ্ট, আরও ঘোলাটে, আরও জটিল করে তোলে। এদের খপ্পরে পড়ে সারা জীবন শুধু ‘বাবা-বাবা’ ডেকে যাও, কিন্তু পাবে না কিছুই এবং মরার পর তথা দেহত্যাগ করার পর সব কিছু পাবার দর্শনটি প্রচার করে। অবশেষে যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করতে নারাজ তারাই বাকির খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়।

শয়তানের প্রকারভেদ

এই খান্নাসরূপী শয়তানটি যাহা দ্বারা আমার এবং আপনার মাঝে কুয়াশা তৈরি করে ‘তৃ’-টির অদৃশ্য মাকড়শার জাল বুনে রেখেছে, সেই আমিত্বটি কেমন করে তাড়াতে হবে সেই শিক্ষা কোথায় পাবো? কে এই কুয়াশার অঙ্ককার হতে উদ্ধার করার পথটির পরিচয় করিয়ে দেবে?

কারণ শয়তান দুই প্রকার : একটি জাহেরি শয়তান এবং অপরটি বাতেনি শয়তান। জাহেরি শয়তান তিন প্রকার। জগতের মাত্র একটি স্থানেই এই তিনটি শয়তান আছে। আর কোথাও নাই। জাহেরি তিনটি শয়তান কেবলমাত্র মক্কার মিনাতেই অবস্থান করে। বড় শয়তান, মেঝ শয়তান এবং ছোট শয়তান। এই তিনটি শয়তান খালি চোখে দেখা যায়। আর বাতেনি শয়তান মাত্র একটি। এই একটি বাতেনি শয়তানের রূপ আবার চারটি। প্রথম রূপটির নাম হলো ইবলিস। দুই নম্বর রূপটির নাম হলো শয়তান। তিন নম্বর রূপটির নাম হলো খান্নাস। চার নম্বর রূপটির নাম হলো মরদুদ। বাতেনি শয়তানের চারটি রূপ আর মানুষগুলোকে বিপথে নেবার অস্ত্র তথা হাতিয়ার হলো উনিশটি। উনিশ প্রকার হাতিয়ার ব্যবহার

করা হয়। একটি হাতিয়ার কাজে না এলে অপরটি ব্যবহার করা হয়। এভাবে একে একে উনিশটি হাতিয়ার ব্যবহার করেও যখন ঘায়েল করতে না পারে তখন সব আশা ছেড়ে দেয় শয়তান। এই উনিশটি শয়তানের হাতিয়ারের নামগুলো একটি একটি করে কোরান-এ বর্ণনা করা হয়েছে। (সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যা পড়লে পাঠক চমকে উঠবেন।)

বাতেনি শয়তানের চারটি রূপ খালি চোখে ধরা যায় না, এমনকি হৃদয় থাকা সত্ত্বেও ধরা যায় না। কী বিজ্ঞানময় সৃষ্টির কৌশল দিয়েছেন মহান কৌশলদাতা আল্লাহ পাক! বাতেনি শয়তানের থাকার একমাত্র স্থানটি হলো মানুষের অন্তর এবং জিনের অন্তর। বাতেনি শয়তানের চারটি বিকশিত রূপও থাকে একমাত্র অন্তরে। সৃষ্টিজগতের আর কোথাও নয়। বাতেনি শয়তানের উনিশটি ধোঁকা দেবার হাতিয়ারও থাকে একমাত্র এই অন্তরে। সুতরাং অকপটেই বলতে চাই যে, শয়তান-বিষয়ের মূলসূত্রটি না জেনে না শুনে যারা বড় বড় ধর্মীয় বই লিখে চলেছেন তাদেরকে কী বলে ডাকব সেই ভাষাটি জানা থাকলেও বলতে চাই না। এদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে বলেছেন খাজা গরিব নেওয়াজ এবং অন্যান্য গুলিরা। যে বা যারা বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে চাইবে না, বরং উল্টা যা-তা মন্তব্য করে বসে এবং যারা সব কিছু বুঝে গেছে তাদেরকে কেমন করে বোঝানো যাবে তা আমার জানা নাই। আল এলমু হেজাবুল আকবর তথা ‘এই জ্ঞানই আল্লাহকে পাইবার পথে সবচাইতে বড় দেয়াল তথা প্রাচীর তথা পর্দা হয়ে দাঁড়ায়’ ॥ মহানবির এই মহাবাণীটি যে, কত বড় ধ্রুব সত্য তা কেমন করে বোঝাব?

জাহেরি তিনটি শয়তানের খুবই প্রয়োজন। কারণ জাহেরি শয়তান চোখে দেখা যায়। জাহেরি শয়তান তিনটিকে ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারতে হয়।

জাহেরি শয়তানকে জাহেরি পাথর ছুঁড়ে মারার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, কেমন করে অন্তরে বাস করা চার বাতেনি শয়তানকে বাতেনি পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে। এই বাতেনি পাথর ছুঁড়ে মারার জন্যই জাহেরি পাথরের প্রয়োজন। একটি পাথর দেখা যায়, কিন্তু অপর পাথরটি দেখা যায় না। একটি মূর্ত, অপরটি বিমূর্ত। একটির আকার আছে, অপরটির আকার নাই। জাহেরি শয়তান তিনটিকে পাথর মারতে গিয়ে অনেক সময় ভিড়ের চাপে পড়ে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে নিজেকে মরতে হয় এবং প্রতিবছর মারা যাবার খবরটি পড়তে হয়। বাতেনি শয়তানটিকে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় তাড়িয়ে দিতে হয়। ধ্যানসাধনার আলোতে শয়তানরূপী কুয়াশা তাড়িয়ে দিতে হয়। এই রকম তাড়ানোটিকেই বলা হয়, ‘মরার আগে মরে যাও’ (মুতু কাবলা আনতা মুত)। জাহেরি শয়তানকে পাথর মারতে গিয়ে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মরাকে বলা হয় ‘জিন্দা লাশ’ তথা জীবিত মরা। সুতরাং নফসের উপর খান্নাসরূপী শয়তানের কুয়াশাটি কেটে গেলেই নিজেকে চেনা হয়ে যায়। আর নিজেকে চেনা হয়ে গেলে রবকে তথা প্রতিপালক, পালনকর্তা, সদাপ্রভুকে চেনা যায়। প্রত্যেক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে মোরাকাবার ধ্যানসাধনা আছে। তবে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি অনেক রকম হতে বাধ্য। এক জাতি ও সম্প্রদায়ের ধ্যানসাধনার নিয়ম-কানুন অন্য জাতি ও সম্প্রদায় হতে আলাদা হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ একেক জনের ভাষা ভিন্ন, খাদ্য ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, চালচলন ভিন্ন, আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন ইত্যাদি। কিন্তু মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। তাই আমরা বৈচিত্র্যের মাঝে অনেক রকম দৃশ্য দেখতে পাই এবং এটাই স্বাভাবিক এবং এই বিষয়ে একে অপরের সমালোচনা করা ঠিক নয়।

শয়তানের বিষয়ে একটি কথা না বলে রাখলে সামান্য সংশয় দেখা দিতে পারে। কেউ হয়তো কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারেন। আর সেই বিষয়টি হলো, শয়তান আকাশ হতে আগ্নেয় গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে মানুষকে দিশেহারা করে তোলার জন্য। কিন্তু আল্লাহ পাক সেই নিক্ষেপ করা শয়তানের আগ্নেয় গোলাগুলোকে সরিয়ে দেন। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, তা হলে তো শয়তানের আকাশেও থাকার কথাটি জানতে পারলাম। কিন্তু এই আকাশ হতে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করার অর্থটি হলো মানুষের মনের আকাশ হতে। পৃথিবীর ওপর যে আকাশ সেই আকাশের কথা এখানে মোটেই বলা হয় নি। পৃথিবীর আকাশটি তৌহিদে বাস করে, কিন্তু মনের আকাশ তৌহিদে বাস করে না। তৌহিদের আকাশ হতে উল্কাপিণ্ড পড়তে পারে আর সেই উল্কাপিণ্ডটিও তৌহিদে বাস করে। সুতরাং শয়তানের অগ্নিগোলা নিক্ষেপের প্রশ্নই ওঠে না। তাই ইহা মনের আকাশ। পৃথিবীর উপরের আকাশ নয়। ওহি নবি-রসুলের কাছে নাজেল হয়। ওহি হজরত মুসা (আ.)-এর মায়ের কাছে নাজেল হয়। ওহি হজরত ইসা (আ.)-এর মায়ের নিকট নাজেল হয়। আবার এই একই ওহি মোম্বাহির কাছেও নাজেল হয়। সূরা নহলের ৬৮ নম্বর আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মোম্বাহির কাছেও ওহি নাজেল হয়। সত্যি বলতে কি, আরবি ভাষায় শব্দের ভাণ্ডারটি এতই সীমিত যে মাত্র একটি শব্দের অর্থ হয় প্রায় শত রকমের। এই কারণে আমরা বিব্রত বোধ করি এবং একটার অর্থ আরেকটার সঙ্গে লাগিয়ে দিতে বাধ্য হই এবং এতে ভাবের খিচুড়ি পাকানো হয়ে যায় মনের অজ্ঞানত্বে। কারণ যদিও মোম্বাহির নিকট ওহি নাজেল হবার কথাটি কোরান-এ আছে, তাই বলে তো আর কেউ ভুলেও মোম্বাহির পরে আলাইহে সালাতুস সালাম বলবে না এবং বলার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ মোম্বাহি

জীবাত্মার অধীন, তার মধ্যে পরমাত্মা তথা রুহ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। রুহ কেবলমাত্র মানুষের সঙ্গে থাকার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য আমাদের জানা মতে। এমনকি এত মর্যাদাবান ফেরেশতাদেরকেও রুহ দেওয়া হয় নি, বরং মানুষের মধ্যে রুহ জাগ্রতরূপ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাদের পাহারা দেয়ার কথাটি বলা হয়েছে। কারণ জাগ্রত রুহের আদেশ পালন করতে হয়। রুহ যেকোনো দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করবে, সৃষ্টি সম্মান প্রদর্শন করবে তথা দরুদ পাঠ করবে। আর সেই রুহটি কেবলমাত্র মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। জিনজাতিকে আমরা দেখতে পাই না, তাই ইচ্ছে করেই তাদের কথা বাদ দেওয়া হলো। নফস এবং রুহের মিলনের পথে শয়তান খান্নাসরূপ ধারণ করে বাধা প্রদান করে, কুয়াশা তৈরি করে রাখে নফসের অগ্নিসর হবার পথে। তাই নফস দেখতে না পেয়ে বার বার ধাক্কা খায়। বার বার এক্সিডেন্ট করে বসে। পথের সঠিক রেখা ধরে এগুতে না পেরে গর্তে পড়ে বার বার। সংগ্রামরত নফস বার বার সংগ্রাম করে সঠিক পথে অগ্নিসর হবার জন্য। প্রতি পদে পদে সংগ্রামরত নফসকে ধাক্কা খেতে হয়, তবু নিরাশ হয় না। এই সংগ্রাম করার জন্যই নফসটির নাম দিয়েছে কোরান-এর সূরা কেয়ামতে নফসে লাউয়াম্মা। তাই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ পাক নফসে লাউম্মার কসম খাচ্ছেন কোরান-এর সূরা কেয়ামতে। আমরা নফসের কসম খাবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ খান্নাসরূপী শয়তান তাকে ঢেকে রাখে। আবার নফসে মোৎমায়েন্না তথা পরিতৃপ্ত নফসের কসম খাবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ পরিতৃপ্ত নফসকে জান্নাতে যাবার সংবাদ সূরা ফজর-এ দেখতে পাই। এই জান্নাত বিষয়টিতে একটি কথা থেকে যায়, আর সেটা হলো, এই জান্নাত সুখভোগের জান্নাত নয়, বরং মুক্তির জান্নাত। স্বাধীনতার জান্নাত। শৃঙ্খলমুক্ত হবার জান্নাত। আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আরবি ভাষার

শব্দভাণ্ডারটি খুবই সীমিত, তাই কোথাও জ্ঞানাত বলতে মুক্তিকে বোঝানো হয়েছে আবার কোথাও জ্ঞানাত বলতে সুখভোগের অপূর্ব কথা বলা হয়েছে। অনেকটা ওহি নাজেল করার মতো। ওহি নবি-রসুলের কাছে নাজেল হয়, আবার ওহি মোমাহির কাছেও নাজেল হয়। পার্থক্য করার জ্ঞান না থাকলে, ফারাক করার রহমত দান করা না হলে কোথায় কোনটা হবে সেটা বোঝা যায় না। ফারাক করার রহমত দান না করলে খিচুড়ি পাকানোটা স্বাভাবিক। এ জন্যই অনুবাদ আর তফসির করতে গিয়ে এত মত ও পথের দৃশ্যগুলো আমাদেরকে দেখতে হয়। ফারাক করার জ্ঞানটি অর্জন করা যায় না, বরং রহমতরূপে দান করা হয়। তবে সমাজের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ইচ্ছে করেই অনেক সময় খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাকিয়া (ক্যামোফ্লাজ) গ্রহণ করতে অনেকটা বাধ্য হয়। হিন্দুধর্মে একটি কথা বলা হয় আর সেটা হলো ‘সত্যং ক্রিয়াং প্রিয়ং ক্রিয়াং মা ক্রিয়াং সত্যমাপ্রিয়ম্’ তথা ‘সত্য কথাটি বলবে, প্রিয় কথাটি বলবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথাটি বলবে না।’ অবশ্যই সেই সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, যিনি বা যারা অপ্রিয় সত্য কথাটি ধারণ করার যোগ্য তাদের কাছে অবশ্যই বলবে। যারা অনুপযুক্ত তাদের কাছে বলতে যেয়ো না। বরং যারা উপযুক্ত তাদের কাছেই তো বলতে হবে। সুতরাং তোমার লিখনী পরিষ্কার বলে দেবে যে, তুমি ফারাক করার জ্ঞানটি রহমতরূপে পেয়েছ কি না। ইসলামের মূল বিষয়ের সূত্রগুলো জানা নাই অথচ বিরাট ইসলাম-গবেষক! মোটামোট বই লিখে চলছে, অথচ সমাধান নাই। বলেই ফেলেন, সমাধান দিতে জানি না, কেবল সমালোচনা করতে পারি, রেফারেন্স তুলে ধরতে পারি। অনেকটা অনেক কিছু জানি, কিছু সমাধান দিতে জানি না। এরা আরাম কেদারায় বসে গবেষণার তথ্য আবিষ্কার করেন, কিছু বাস্তব সমাধানটি দিতে পারেন না বলে নিজেরাই স্বীকার করেন। এরা

শরৎ বাবুর নুরানি অঙ্ককারের গবেষণা করে চলেছেন। শব্দের বিচিত্র অলঙ্কার দিয়ে রাশভারী বাক্যগঠন করে বই লিখে ফেলেন, অথচ মূল বিষয়টির সঙ্গে কোনো যোগসূত্র থাকে না। এই জাতীয় গবেষক বিশেষ করে সুফিবাদের নামে এমন সব গবেষণা চালিয়ে যান যে, সুফিবাদের দুয়ারে কথার পায়খানা-পেশাব করে সবাইকে দুর্গন্ধের কুয়াশায় ফেলে দেন। যারা সুফিবাদ জ্ঞানার আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হয় এবং এদের রচনাসমগ্র পড়ার পর চোখে কুয়াশা দেখতে পায়, তখন সিদ্ধান্ত নেবার সংশয় জেগে ওঠে মনে। নুরানি অঙ্ককারে সঠিক পথটি পেতে কষ্ট হয় বৈ-কি! এরা নীতি আর আদর্শের এমনই পূজারি যে, নীতির মূল বিষয়টিতে একেবারেই অন্ধ। এরা প্রেমহীন নীতিবান। এরা ভালোবাসাহীন আদর্শবান। ধরাই যাবে না প্রথমে। কিছু দিন সন্ধানী চোখে চলাফেরা করলেই আচার-আচরণে ধরা পড়তে শুরু করবে। এরা কাঁধের উপর সাইনবোর্ড নাই বলে চীৎকার করে, কিছু সন্ধানী চোখ অবশেষে দেখতে পায় নিয়ন বাতির অদৃশ্য সাইনবোর্ডটি কাঁধের উপর ঝুলছে। এদের আসল পরিচয়টি ধরা খুবই কষ্টকর। কারণ সব সময় নীতির পোশাক পরিধান করে চলেেন। এরাই সুফিবাদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে। প্রেমের শরীরে এরা বন্ধন পরিয়ে দেয়। প্রথমে খুব হালকা বন্ধন, তারপর শক্ত বন্ধন। এরা প্রেমের উলঙ্গ শরীরে নীতির অলঙ্কার পরিয়ে দেয়। ভালো লাগে। কারণ খান্নাসরুপী শয়তানটি যে সঙ্গেই অবস্থান করছে। উলঙ্গ সুফিবাদ এরা দেখতে পছন্দ করে না। একটার পর একটা করে অলঙ্কার পরাতে থাকে। অবশেষে উলঙ্গ সুফিবাদ অলঙ্কারের ভারে ও চাপে ঢেকে যায়। তখন অলঙ্কারগুলোকেই আসল সুফিবাদ বলে মনে করে নিতে বাধ্য করা হয়। বিভ্রান্তির চোরা-গলিপথগুলো তৈরি হতে থাকে। পা রাখতে গেলেই এদের রচিত নুরানি অঙ্ককারের খপ্পরে পড়তে হয়। তখন

সঠিক সুফিবাদের বিশ্বাসীদেরকে নকল মনে হয়। আসলটি নকল মনে হয় আর নকলটাকে আসল মনে হয়। এখানে এসেই আল্লাহ রাব্বুল আল-আম্বিনের সাহায্য চাইতে হয় কায়মনোবাক্যে। এখানে এসেই বিরাট ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর দরবারে রহমত চাইতে হয় চোখের জলে।

সুফিবাদের উপর একজন গবেষক একদিন আমারই সামনে আমার ভক্তদেরকে উপদেশ দিলেন। উপদেশের ভাষাটি এতই চমৎকার, এতই মধুমাখা এবং এতই আকর্ষণীয় যে, ভক্তরা চমকানো তো দূরে থাক বরং আমিই চমকে উঠলাম। চমকে উঠলাম এই কারণে যে, এই সূক্ষ্ম অজ্ঞতাটি সহজে কেউ ধরতে পারবে না। পারার কথা নয়, বরং সঠিক বলে মনে হবে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতাটি সেই সুফিবাদের গবেষকও ধার করে এনেছেন। কারণ এই রকম কথাটি একমাত্র খান্নাসরূপী শয়তানের সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজি। শুনতে কথাটি আমার-আপনার কাছে এতই ভালো লাগবে যে, টেরই পাবেন না যে, এটাও খান্নাসরূপী শয়তানের একটি সূক্ষ্ম ধোঁকা। সেই গবেষকের সামনে যদি মুখ ফসকে বলে ফেলতাম তো জাত সাপের মতো ফনা তুলে দু-চারটি যে ছোবল মারতেন তা প্রায় নিশ্চিত। কারণ সুফিবাদের প্রেমে এরা যতটুকু বিশ্বাসী তার চেয়েও বেশি নীতিতে বিশ্বাসী। সেই সুফিবাদী গবেষকের সঙ্গে একজন পীর সাহেবও এসেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই গবেষকের কথাটি সমর্থন করে ফেললেন। আমি খুবই বিব্রত বোধ করলাম, কিছু চুপ করে রইলাম। কারণ উভয়েই আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু। কথাটি এভাবে ভক্তদের বলা হয়েছিল, ‘আপন পীরকেই ভক্তি করতে হবে এবং অন্য কোনো পীরকে ভক্তি করা যাবে না, তা সেই পীর যত বড়ই হোন না কেন।’ কথাটি শুনতে কার না ভালো লাগবে! অথচ সুফিবাদের দর্শনের গভীরে প্রবেশ না করার দরুন তা বলতে

পেরেছেন এবং ভক্তদের মাঝে অনেকের কাছে কথাটি ভালোই লেগেছে। অথচ কথাটি সুফিবাদের উপর একটি চপেটাঘাত। একটি মারাত্মক ভুল। কারণ সব বাস্তব একই আলো জ্বলছে। বাস্তব অনেক হতে পারে, বাস্তব বহু রঙের হতে পারে, কিন্তু কারেন্ট তথা বিদ্যুৎ একটাই এবং একক। আমরা বাস্তবকে ভক্তি করি না, বরং আলোকে, বিদ্যুৎকে ভক্তি (?) করি। আমরা কাবাঘরটিকে সেজদা করি না, বরং কাবাঘরের যিনি মালিক সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহকেই সেজদা করি। আমরা আপন পীরকে ভক্তি করি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য পীরদেরকেও ভক্তি করি। আমরা আপন পীরকে যেমন ভক্তি করি সে রকম খাজাবাবার মাজার, মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার, দাতা গঞ্জি বখশের মাজার, গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর মাজার, বাবা সানালা শাহ ফকিরের মাজার, বাংলার আবদুহ বেলতলির সোলায়মান শাহ লেংটার মাজার এবং সব ঠলিদের মাজারকে ভক্তি করি। কারণ ঠলি ভিন্ন হতে পারেন, কিন্তু সব ঠলি এক আল্লাহকে পেয়েই ঠলি হয়েছেন। তাই এই সকল ঠলিদের মাজারে গিয়ে কাঠখণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে থাকব আর আপন পীরের দোহাই দিব? আসলে গবেষক বন্ধুটি এবং তার সঙ্গে আসা পীর সাহেব নফস এবং রুহের পার্থক্যটি করার গবেষণাটি করেন নি, অথচ যারা সবাইকে ভক্তি করছেন তাদেরকেই গবেষণার সীমাবদ্ধতার দরুন উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই সুফিবাদের দুয়ারে পায়খানা-পেশাব করে দেওয়া হয় আর গন্ধের কুয়াশায় পথ দেখতে কষ্ট হয়।

বর্তমান জামানার অঘোষিত মোজাদ্দের শাহ সুফি সদর উদ্দীন আহমদ চিশতী সাহেবকে আমি নিজের চোখে দেখেছি আমার আপন পীরবাবা শাহ সুফি জালাল নুরী আল সুরেশ্বরীকে ভক্তি দিতে। যদিও উনি বয়সের প্রশ্নে অনেক বড় এবং কয়েক

লক্ষ মুরিদান আছে। আমি লিখে গেলাম। কিন্তু শাহ সুফি সদর উদ্দীন আহমদ চিশতী সাহেব হলে কিছুই বলতেন না। আমি অধম লিখকও উনার সঙ্গে অতি নগণ্য বিষয়ে একমত হতে না পারলে উনি কিছুই বলেন না। এমনকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলার সময়ে সেই বিষয়টি জ্ঞানা থাকা সত্ত্বেও সামান্য প্রতিবাদটুকু করতে দেখি নি। আপনি আপন পীরকে ছাড়া আর কাহাকেও ভক্তি করেন না কথাটি ভালো কথা। কারণ এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার ও বিষয়। এটা আপনার একান্ত গণতান্ত্রিক অধিকার। সুতরাং এই নাজুক বিষয়ের প্রতিবাদ করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গায়ে পড়ে অন্যান্য ভক্তদের এহেন উপদেশবাণী শুনিয়া সাবধান করে দিতে চাইলে প্রতিবাদ তো অবশ্যই করতে হয়। এবং এ রকম প্রতিবাদটি একান্ত অনিচ্ছায় করতে হয়। কারণ হস্তক্ষেপ যেখানে, প্রতিবাদটি যে সেখানে অবধারিত হয়ে পড়ে।

শায়খুল আকবর একদিন খানকাতে মাস্তির হালে বসে আছেন। এমন সময় এক মুরিদ কাছে এসে ‘বাবা, বাবা’ বলে ডাকলেন। শায়খুল আকবর তাঁর আপন মুরিদকে ভক্তি করাতে মুরিদ হতভম্ব হয়ে বললেন, ‘হজুর, এ কী করছেন?’ উত্তর এলো, ‘কেন! আমাকেই আমি ভক্তি করছি।’ লৌহখণ্ড কালো। আগুনের স্পর্শে আগুনের মতো লাল হয়ে যায়। তখন লৌহখণ্ড বলে মনে হয় না। যখন স্বাভাবিক তখনই লৌহখণ্ড।

কাবা শরিফ তথা পবিত্র কাবা আল্লাহর ঘর ॥ এটা আর নূতন করে বলার দরকার নাই। তবে আলোচনার খাতিরে বার বার একই কথা আসলে দোষের তেমন কিছু নাই। কাবা শরিফের অনুকরণ আর অনুসরণে প্রতিটি মসজিদ ঘর তৈরি করা হয়। সুতরাং প্রতিটি মসজিদ ঘরও পবিত্র, কারণ মসজিদও আল্লাহর

ঘর। কাবায় আল্লাহ্ আছেন। সুতরাং মসজিদেও আল্লাহ্ আছেন। কারণ দুইটিই আল্লাহর ঘর। মর্যাদায় তারতম্য থাকতে পারে এবং আছে। তবে কাবা ও মসজিদ দু'টোকেই আল্লাহর ঘর বলা হয়। আল্লাহর ঘরে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নামাজ তথা সালাত তথা যোগাযোগ করার চেষ্টা চালায়। আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া না-পাওয়ার বিষয়টি অন্য বিষয়। জামাতে তথা সংঘবদ্ধ হয়ে নামাজ আদায় করা হয়, আবার একা একাও আদায় করা যায়। ইহাতে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। তবে জামাত চালু অবস্থায় একা একা নামাজ পড়া ঠিক নয়। এই কথাগুলো অতি সাধারণ কথা। হজরত ইব্রাহিম নবি (আ.) এই কাবাঘরটি নির্মাণ করেন। তবে এই কাবাঘরটিকে কতজন নবি কেবলা করে নামাজ আদায় করেছেন তা আমার জানা নাই। এটাও সত্য কথা যে, অনেক নবি বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামাজ আদায় করেছেন। এমনকি মহানবিও কিছুদিন বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামাজ আদায় করেছেন। পরে কেবলা পরিবর্তন করা হয়। তা হলে কি বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহর ঘর নয়? অবশ্যই আল্লাহর ঘর। কারণ বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহর ঘর না হলে কেবলা করার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহর ঘর বলেই মহানবিকে ইমামে কেবলাতাইনে তথা দুই কেবলার ইমাম বলা হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসকে দূরতম মসজিদও বলা হয়। দূরতম বলতে কী বোঝায়? ইহা কি ভৌগোলিক দূরত্ব নাকি আধ্যাত্মিক দূরত্ব? ভৌগোলিক দূরত্ব হলে কোথা হতে দূরতম মসজিদ? দূরতম বলতে গেলেই প্রশ্নটি আসবে, কোথা হতে দূরতম? কোন স্থান হতে এই দূরত্ব মাপা হবে? যদি বলা হয় কাবা হতে, তবে দূরতম মসজিদ হয় কেমন করে? যদি বলি আধ্যাত্মিক মসজিদ, তা হলে ইহার দূরত্বটি এক মুহূর্তে বলে দেওয়া যায় যে, ইহার দূরত্ব কাবা শরিফ হতে মাত্র চল্লিশ বছর। পায়ে হাঁটার

পথ, উটের পিঠে চড়ে যাবার পথ, ঘোড়া-গাধার পিঠে চড়ে যাবার পথ, গাড়িতে বসে যাবার পথ, সেটা কোন গাড়ি? রেলগাড়ি নাকি বাস, ট্রাম, জিপ, মাইক্রো না টেক্সিতে করে যাবার পথ? নাকি উড়োজাহাজ তথা এরোপ্লেনে যাবার পথ? আদিম স্তর পায়ে হাঁটার পথই বলা হোক আর উড়োজাহাজের পথই বলা হোক না কেন, ইহা কখনওই ভৌগোলিক পথ হতে পারে না। কারণ পায়ে হেঁটে গেলেও চল্লিশ বছর হাঁটতে হবে ॥ এই কথাটি বিজ্ঞানের যুগে অচল। তা হলে এই দূরতম মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাসে আসতে যে চল্লিশ বছর সময় লাগার কথাটি বলা হলো, উহা একদম আধ্যাত্মিক সময়। মহানবি নবুয়ত পেয়েছিলেন চল্লিশ বছরে। তাই তিনি নিজের কথাটিই এখানে উল্লেখ করেছেন। কারণ তৌহিদের শিক্ষাটি হলো, আগে নিজে করে অপরকে উপদেশ দান করা। সুতরাং এই জলজ্যান্ত আধ্যাত্মিক বিষয়টিকে ওহাবিরা কেমন করে অস্বীকার করতে চায়? মহানবির প্রতিটি কথায় এবং কার্যে অধ্যাত্মবাদের মিশ্রণ আছে বলেই তো দুইটি দিকের একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। আপন খেয়ালখুশি মতো যদি কেউ বাদ দিয়ে বুঝতে চায় তো বলার কিছু নাই। কারণ এখানেও তকদিরটি পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দুইটির একটিকে বাদ দিতে গেলেই গোঁজামিলের গন্ধ থেকে যাবে। বায়তুল মোকাদ্দাসে মহানবি অন্যান্য অনেক নবিদেরকে নিয়ে নামাজ পড়েছেন তথা সালাত কায়েম করেছেন তথা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটিকে কায়েম করেছেন এবং আশ্বিয়াদের ইমাম হয়ে ইমামতি করেছেন (মাওলানা জালাল উদ্দীন সয়ুতী)।

যিনি বা যারা নামাজ পড়েন তাকে বা তাদেরকে নামাজি তথা মুসল্লি বলা হয়। এই সালাতটিকে তথা যোগাযোগটিকে চিরস্থায়ী করার জন্য সূরা মারেরের ২৩ নম্বর আয়াতে দায়েমি সালাত কায়েম করার প্রত্যক্ষ আদেশটি পাই। আমরা

এখানে যোগাযোগের ব্যবস্থাটিকে চিরস্থায়ী বলতে যাব না। কারণ তা হলে বাংলা ভাষায় হয়ে যায় যোগী। যোগী বলতে গেলেই হিন্দুধর্মের গন্ধ আবিষ্কার হবার সম্ভূত বিপদ থাকতে পারে বলে যোগী শব্দটি উল্লেখ করা হলো না। কারণ সত্যকথাটি বলা যায়, কিছু অপ্রিয় সত্যকথাটি মহাপুরুষেরা পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই বলতে উপদেশ দিয়েছেন। অধ্যাত্মবাদের অনেক গোপন বিষয় মহানবি তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবাদেরকেই বলেছেন। তা না হলে হজরত আবু হরায়রা (রা.), হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হজরত হোজায়ফা (রা.)-র মতো জلیل কদর সাহাবারা কেন এই বিষয়টি উল্লেখ করে গেলেন? তা ছাড়া আরও কিছু কথা থেকে যায়, আর তা হলো কোরান-এ স্পর্শ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য সেই জাতির, সেই সম্প্রদায়ের ভাষায় রসূল পাঠানো হয় আল্লাহর নিদর্শনগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার জন্য (সূরা ইউরাহিম ৩)। কোরান-এর এত সুন্দর এত স্পর্শ এত দিবালোকের মতো সত্যকথাটি ঘোষণা করার পর ধর্মাবলম্বীদের (ধর্মপ্রাণ নয়) প্রবল চাপের কাছে বিষয়টি স্পর্শকাতর-এ পরিণত হয়। ধর্মপ্রাণ আর ধর্মাবলম্বী যে মোটেই এক নয় তা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে গেলেও বুঝবে না। কারণ ওই তকদির।

জ্ঞানের প্রকারভেদ

কাবা আল্লাহর ঘর। ঘরটিতে আল্লাহ আছেন বলেই সেজদা করি এবং তোয়াফ করি। কাবাতে আল্লাহ আছেন বলেই তো বলতে হয় যে, আমি তোমার সামনে হাজির আছি। কিছু পর্বতের উপরে একদম নির্জন হেরাণ্ডহাটিকে তো একবারও

আল্লাহর ঘর বলা হয় নি। তবে কেন পবিত্র কাবায় নির্জন ধ্যানসাধনাটি না করে মহানবি পনেরটি বছর (নিয়মিত নয়) পর্বতের উপর অবস্থিত নির্জন হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনাটি করতে গেলেন? এই হেরাণ্ডহাতেই মহানবি নবুয়ত পেয়েছেন। এই হেরাণ্ডহাতেই আল্লাহর কালাম কোরান শরিফ নাজেল হয়েছে। এই হেরাণ্ডহাতেই জিবরাইল কালাম নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর ঘর কাবা শরিফে আল্লাহর কালাম পেলাম না, পেলাম পর্বতের উঁচু স্থানে অবস্থিত হেরাণ্ডহায় নির্জনে একাকী (জামাতবন্দি হয়ে নয়) ধ্যানসাধনার মাধ্যমে। তাও আবার দুই-এক মাসে নয়, পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করার পর। আল্লাহর ঘরে আল্লাহর কালাম পাবো, কিন্তু তা না পেয়ে হেরাণ্ডহায় পাবো কেন? আমার জানা মতে কোরান-এর একশ চৌদ্দটি সুরার একটি আল্লাহর কালামও আল্লাহর কাবাতে পেলাম না। তা হলে আমাদের সামাজিক জীবনের প্রশ্নে নির্জন হেরাণ্ডহার গুরুত্ব কতখানি এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হলো। বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান তথা এলম্নে লাদুনি হাসেল করতে হলে হেরাণ্ডহার মতো নির্জন স্থানে একাকী ধ্যানমগ্ন হতেই হবে। ধ্যানমগ্ন না হলে দায়েমি সালাত তথা চিরস্থায়ী যোগাযোগের ধ্যান আশা করাটি বৃথা। এই ধ্যানসাধনাটি চোখ বুজে করতে হয়। কারণ ইহা কলবের জ্ঞান তথা সিনার এলম্ন। সিনার এলম্ন মাথায় থাকে না, থাকে কলবে। তাই চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হতে হয়। মাথার এলম্ন চোখ খুলে অর্জন করতে হয়। মাথার এলম্ন বই পড়ে অর্জন করতে হয়। তা হলে হেরাণ্ডহাটি কি এলম্নে লাদুনি হাসেল করার বিশ্ববিদ্যালয়? অবাক হবার বিষয় হলো, হেরাণ্ডহায় বই-খাতা আর হারিকেন নিয়ে যেতে হয় না। কারণ ইহা বই-খাতার জ্ঞান নয়। হারিকেন জ্বালিয়ে আলো তৈরি করে চোখ খুলে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি এখানে সম্পূর্ণ অচল। কাবাঘরে কোরান নাজেল না হয়েও কাবা

শরিফ আর হেরাণ্ডহায় কোরান নাজেল হবার পরও হেরাণ্ডহাকে শরিফ বলা হয় না। বলবার প্রচলন সামাজিক জ্ঞান-বিদ্যায় রাখা হয় নি। তা হলে ইঁহা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, এলেন দুই প্রকার : একটি জাহেরি এবং অপরটি বাতেনি। তা হলে ওহাবিরা কেমন করে বাতেনি এলেনটিকে অস্বীকার করতে চায়? জাহেরির কাছে কাছেই তো ছায়ার মতো বাতেনি এলেনটি বোবার মতো অবস্থান করেছে। জাহেরি এলেনটির সঙ্গে বাতেনি এলেনটি আরও ব্যাপক, আরও প্রসারিত, আরও বেশি গোপনীয়। তাই তো দেখতে পাই জলিল কদর সাহাবারা, যেমন হজরত আবু হরায়রা (রা.), হজরত ইবনে আব্বাস (রা.), হজরত হজায়ফা (রা.), হজরত সালমান ফারসি (রা.) এবং হজরত আবুজর গিফারি (রা.) বাতেনি এলেনটির অধিকারী হয়েও প্রকাশ করেন নি। মাদারজাত ওলিরা (মায়ের পেট থেকেই যারা ওলি তাদেরকে মাদারজাত ওলি বলে) কেন বছরের পর বছর নির্জনে ধ্যানমগ্ন থেকেছেন? বড়পীর সাহেব কেন বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করেছেন? খাজা গরিব নেওয়াজ কেন পাহাড়ের গুহায় ধ্যানসাধনাটি করেছেন? খাজা গরিব নেওয়াজের ধ্যানসাধনার পর্বতগুহাটি অধম লিখক নিজে দেখেছি এবং সেই গুহায় ঢুকে কিছুক্ষণ থাকার পর অবাক হয়েছি। আল্লাহর ওলিরা কমনবেশি সবাই ধ্যানসাধনা করেই ওলি হয়েছেন। নিয়ত ঠিক রেখে যে কেউ ধ্যানসাধনা করলে অবশ্যই আল্লাহকে পাবে। যাকে এই বাতেনি জ্ঞান তথা এলেনে লাডুনি দেওয়া হবে না তাকে কখনই আল্লাহ ধ্যানসাধনাটি করতে দেবেন না। জোর করে ধ্যানসাধনায় বসলেও বসা যাবে না। কারণ যাকে দেবার নয়, সে যদি জোর করে ধ্যানসাধনাটি করতে যায় তো পাহায় লাখি মেরে উঠিয়ে দেবে অথবা এ কথা সে কথার অজুহাতে বসতেই দেওয়া হবে না। এ রকম দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আমারও কিছু

হয়েছে। যাকে ধ্যানসাধনায় বসতে দেবে না তার মাথার উপর একবোঝা দুনিয়াবি মহা (?) দায়িত্বের কাজগুলো চাপিয়ে দেবে যাতে সে ধ্যানমগ্ন হবার সময়টুকু আর না পায়। একজন উচ্চশিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বগুড়ার মহাস্থান গড়ে ধ্যানসাধনার জন্য বসেছিলেন। সহসা দশ দিনের মাথায় ভীষণ পেটব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং অনেকটা বাধ্য হয়ে ধ্যানসাধনা ফেলে চলে আসতে হলো। তিনি অবশ্য একথাটি বলেছেন যে, ‘পেট-বেদনার রোগ তো আমার নাই। তা হলে কি তোমার বর্ণিত লাখি মেরে উঠিয়ে দেওয়া হলো?’ আমি বললাম, ‘হয় তো না। তুমি আবার ধ্যানসাধনাটি করে নিয়ো।’ কারণ আমি তাকে বার বার একই কথা বলেছিলাম যে, ‘তুমি বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারো, কিন্তু এলম্নে লাদুনি হাসেল করতে হলে মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।’ আমার কথায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল বলেই তো বুড়ো বয়সে ধ্যানসাধনা করতে গিয়েছিল এবং আশা করি আল্লাহ তার ইচ্ছাটি পূর্ণ করুন। আমি তাকে এও বলেছিলাম যে, ‘তুমি অনেক অনেক সুফিবাদের উপর বই পড়ে অনেক কিছু জানতে পারবে, যে কেউ তোমার জ্ঞানের বহর দেখে চমকে যেতে পারে! অনেক ভাষায় অনর্গল কথা বলে চমকিয়ে দিতে পারো ইত্যাদি। কিন্তু আসল জ্ঞান এলম্নে লাদুনিটি পাবে না। পাবে একমাত্র ধ্যানসাধনার মাধ্যমে। কারণ মোরাকাবার বিশেষ গুণটি হলো তোমার অস্থিরতা, তোমার হা-হতাশ, তোমার সব রকম অহঙ্কারগুলো তিন-চারটে মোরাকাবাতেই অনেকখানি দূর হয়ে যাবে। আগুন যেমন কাঠ খেয়ে ফেলে, ধ্যানসাধনা সে রকম অহঙ্কার হতে শুরু করে যাবতীয় দুষণীয় বিষয়গুলো দূর করে দেয়।

ধ্যানসাধনার স্বরূপ

হজরত মুসা (আ.) তুর পর্বতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আল্লাহর নুর দর্শন করলেন। দর্শনের ভেতর কমবেশি গভীরতা-অগভীরতা থাকতে পারে, কিন্তু সামান্য দর্শনটিকেও তো দর্শনই বলতে হবে। মহানবি যেমন পর্বতের হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনাটি করেছেন সে রকম হিন্দুধর্মের অনেক যোগীর কৈলাস পর্বত, হিমালয়ের আশেপাশে এবং আরও অন্যান্য পর্বতে ধ্যানসাধনার কথাটি জানতে পারি। তা হলে দেখতে পাচ্ছি যে, এলম্বে লাদুনি হাসেল করতে হলে নির্জন স্থান ও পরিবেশের প্রয়োজন। যেখানে পাহাড়-পর্বত নাই তাদের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? নির্জন পরিবেশে নির্জন ঘরে আপন পীরের দেওয়া ওজিফা ও ধ্যানসাধনার নিয়ম-কানুনগুলো মেনে নিয়েই করতে হবে। এই ধ্যানসাধনাটিকে সন্ন্যাস-ধর্ম মোটেই বলা যাবে না। কারণ বিবাহ করার বা না করার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। অনেক ওলি বিয়ে করেছেন, আবার অনেকে বিবাহ করেন নি। রোহবানিয়াতের মধ্যে বাধ্যবাধকতা থাকে বলেই বলা হয়েছে যে, ইসলামে রোহবানিয়াত নাই। কিন্তু মহানবি মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করে সবাইকে দেখিয়ে গেছেন যে, এলম্বে লাদুনি হাসেল করতে হলে ধ্যানসাধনাটি অবশ্যকরণীয়। তাই আমরা দেখি গাউস-কুতুব-আবদালরা মোরাকাবার মাধ্যমেই মোকাম হাসেল করতে পেরেছেন। আজকের জামানায় যেমন পীর-ফকিরদের নামের আগে অনেক স্থানে আলহাজ্জ টাইটেলটি থাকে সে রকম সেই যুগে প্রায় পীর-ফকিরদের জীবনী পাঠ করলে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনার নিরলস পরিশ্রম করার বিষয়টি জানতে পারি। সুতরাং ঘুরে ফিরে বার বার একই কথা বলছি। বলছি এই কারণে যে, কথার মধ্যে খোদা নাই, আর খোদার মধ্যে কথা নাই। আছে কেবল দর্শন, ফানা, নির্বাণ, বাকা, স্থায়িত্ব। যখন আপনাকে আল্লাহর মধ্যে বিলিয়ে দিতে

পারবে আর আমি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখনই তুমি সম্পূর্ণ থাকবে। এবং তখন তুমি দেহের মধ্যেও থাকতে পারো, আবার দেহের বাহিরেও থাকতে পারো। মুজাদ্দের আলফেসানির পীর বাবা খাজা বাকি বিল্লাহ তাই নিজের জানাজা নিজেই পড়েছিলেন এবং এ রকম কথাটি বাবা শেখ ফরিদের ভাগিনা এবং অন্যতম প্রধান খলিফা হজরত আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরিও বলে গেছেন। আসলে যত কথাই বলি না কেন, যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করবে না তাদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে বলেছেন প্রায় ওলিরা। তবু একটি গালি দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কারণ সবই যে তকদিরের খেলা। বাঘের তকদির মাংস ভক্ষণ আর হাতির তকদির সবজি ভক্ষণ। একজনের খাবার আরেকজনকে দিতে গেলেই দেখতে পাবেন যে, আশ্চর্য করে মুখটি ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং যারা করতে চাইবে তাদের জন্য বলে যান, লিখে যান, বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন ॥ দেখতে পাবেন তারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন এবং অনুশোচনায় দক্ষ হয়ে সঠিক পথটি আপনিই বেছে নেবেন।

এলম্নে লাদুনির রাজ্যে প্রবেশ করলে আর কথা থাকে না। কারণ, খোদার মধ্যে কথা নাই। কারণ, প্রেমের গভীরে প্রবেশ করলে কথা বলতে চাইলেও বলা যায় না। বলতে গেলে ভাষার ব্যাকরণটি আর থাকে না, তাই সমাজ গ্রহণ করে নিতে বড় বড় প্রশ্ন তোলে, জটিল যুক্তি প্রদর্শন করে ইত্যাদি। বস্তুর বিজ্ঞানের কথাটি তুলে আরও বিদ্রোহ, আরও জটিল করে তুলে ঘায়েল করতে চায়। তৃপ্তির মিটিমিটি হাসি তুলে ঘায়েল করতে চায়। তারা জানে না যে, বস্তুর বিজ্ঞানটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আত্মার বিজ্ঞানীরা কখনই বস্তুর বিজ্ঞানের বিরোধী নয়, বরং সহায়ক। আবার বস্তুর বিজ্ঞানটিও আত্মার বিজ্ঞানের সহায়ক এবং মোটেই বিরোধিতা করে না। কিছু

স্ব-বিজ্ঞ অতিরিক্ত জ্ঞানীরা লক্ষবাক্ষ মারে। দৈহিক প্রেমের যখন মিলন হয় এবং চরম একটি বিশেষ মুহূর্তে আর কথা থাকে না। কথা, ভাষা আপনিই হারিয়ে যায়। যেটুকু প্রাণপণ চেষ্টা করে বলতে চায় ওটা মোটেই ভাষা নয়। ব্যাকরণের তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই সাধক ফানার মোকামের দিকে যত এগুতে থাকে ভাষা ঠিক সেইভাবে হারিয়ে যেতে থাকে, উর্ধ্ব গমনের রকেটের জ্বালানির মতো। তাই ফানার মোকামে গেলে সম্পূর্ণ ভিন্নরাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। এই রাজ্যটি ভাসমান তথা সোবহান। রূপক ভাষায় ‘সি-মোরগের’ কথাটি মনে করিয়ে দেয় সাধকের মনে। অন্যেরা ‘সি মোরগের’ রূপকথাটি জ্ঞানবার পর হাসে, কেবল হাসে এবং মাঝেমাঝে ঠাট্টাতামাসাও করে। তাই খাজা গরিব নেওয়াজের পীর বাবা খাজা উসমান হারুনি বাকী বলেছেন, ‘আমি উসমান হারুনি মনসুর হাল্লাজের বন্ধু। কারণ মনসুর হাল্লাজ আসল শূলের উপর দাঁড়িয়ে ঠাট্টাতামাসার রূপটি দেখেছিলেন আর আমি বাজারের মানুষগুলোর ঠাট্টাতামাসার শূলের উপর দাঁড়িয়ে তোমার প্রেমে নাচছি।’ আর আল্লাহর কোরান ও বলছে, ‘যাকে হেকমতের জ্ঞান দান করা হয় (অর্জন করা যায় না) তাকে অনেক নেয়ামত দান করা হয়।’ (ওয়া মান উতিয়ান্, হেকমাতা ফাকাদ খায়রান কাসিরান।) কারণ সাধক ধ্যানসাধনাটি করে মোকামে মালাকুত, মোকামে জাবরুতের শেষ পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু লাহত মোকামে প্রবেশ করতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আল্লাহর বিশেষ রহমতের জন্য। তবে এতদূর আসবার পর আল্লাহ কাহাকেও ফিরিয়ে দেন না। কারণ তিনি রহমান, তিনি রহিম। তাই কোরান-এর ভাষায়, ‘আমরা তাকে কানে আঘাত করে কাহাকে ঢুকিয়ে দেই।’ তথা বাহ্যজ্ঞানের শেষটুকু ঝেড়ে ফেলে দেই কানে থাপ্পড় মেরে। কানে থাপ্পড় মারলে যেন দুনিয়াটা

অঙ্ককার মনে হয় এবং কিছুই মনে থাকে না। সে রকম রূপক ভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। বৈষয়িক জ্ঞানের শেষ স্তরটুকু যখন সাধক সাধনা করে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না তখনই রহমতের আঘাত খেয়ে রহমতের রাজ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই রহমতের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারলে তিনশত নয়টি বছর ঘুমিয়ে থাকার পরও যেমন বার্ষিক্য গ্রাস করতে পারে না ॥ যুবক যুবকই থেকে যায়, সবুজ সবুজই থেকে যায়, সবুজ পেকে যায় না, তেমনি। এরাই আবদুহ। এরা আবদাল। জ্ঞানীরা খিজির নামটি আবদুহর স্থানে বসিয়ে দেন। বাংলার আবদুহ, আসরাতে খিজির মতলবের বেলতলির শাহ সুফি বাবা সোলায়মান শাহ এ রকম একটি দৃষ্টান্ত। অনেকে নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে লেংটা বাবাও বলে থাকেন। আমি অধম লিখকই তো অনেক সময় বিনয়ের ভাষায় বলে ফেলি যে, অমুক পীর সাহেবের জ্ঞানের প্রশ্নে আমি ধারে কাছেও যেতে পারি নি এবং অমুক ইসলাম-গবেষকের পায়ের নিচে স্থান হয় কিনা সন্দেহ। তাই বলে কি আসলেই তাই? বলবো না। কারণ কিছু বলতে গেলেই আর বিনয়ের ভাষাটির কোনো মূল্যই থাকে না। বেলতলির শাহ সুফি সোলায়মান বাবাজান যদি কোনো গুলির প্রশ্নে বলেই থাকেন যে, ওমুক গুলি আমার চেয়েও পাঁচশত বছরের পথটি এগিয়ে আছেন, তা হলে ইহা নিছক বিনয়ের ভাষা। আসল কথাটি নয়। যারা এই বিনয়ের ভাষাটিকে বাস্তবসম্মত মনে করতে চায়, তারা করুক। কারণ আইনত কিছুই বলার থাকে না। তবে কেন জানি বিবেকটাকে দংশন করে বার বার এদের কথাগুলো শোনার পর। বিনয়ের ভাষাটিকে স্বল্প করে অনেকেই মাওলা আলি (আ.) তো দূরের কথা, হজরত ওমর ফারুক (রা.), হজরত ওসমান (রা.) এবং তামাম সাহাবাদের এবং তামাম মানুষদেরকে এক পাল্লায় বসিয়ে দিলেও হজরত আবু বকর (রা.)-এর

পাল্লাটি ভারীই থাকবে বলে থাকেন। এখানেও আমরা বলার কিছু নাই। কারণ বিনয়ের ভাষাটিকে বিনয়ের স্থানেই সমতলে থাকতে দিন। যারা বাস্তব জগতে প্রয়োগ করতে চান, তাদেরকেও বলার কিছু নাই। কিন্তু যারা এই বিনয়ের রহস্যটি বুঝতে পারেন তারাও কিছু বলেন না। যারা নেহায়েত বোকা তাহাই এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে লাফালাফি শুরু করে দেয় এবং অনেকেই এদের লাফালাফিতে ভুল পথে পা বাড়িয়ে দেয়।

কেমন করে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করতে হবে, যিনি মুরিদদেরকে বলে দেন না তিনি কেমন করে পীর হন? যিনি অন্ধকার হতে আলোর পথটি দেখাবেন তিনিই তো পীর। তার সেই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি অনেক রকম হতে পারে, কিন্তু কিছুই শিখিয়ে দেওয়া হবে না। কেবল গং মারা কতগুলো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করার কথাটি তো আর ধ্যানসাধনার বিষয় হয় না এবং হতে পারে না। তাই হজরত ইসা (আ.) বার বার তাঁর সাহাবাদেরকে একটি কথা বলেছেন আর সেই কথাটি হলো, ‘এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে গেলে অবশেষে দুজনকেই গর্তে পড়তে হয়।’

হালে কত রকম ভুল কথা, ভুল ব্যাখ্যা যে সুফিবাদের উপর করা হয়ে থাকে আর সেই ব্যাখ্যায় বেশিরভাগ মানুষই ভুল বুঝে ভুল পথে পা বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে ভুল পথে ভুলটি উপহার পাইতে হয়। শাস্ত্রের বিধি-বিধান আচার-অনুষ্ঠানের অনেক রকম কথাবার্তা বলে মানুষদেরকে সবচেয়ে বেশি ভুল-পথে ঠেলে দেওয়া হয়ে থাকে। মোনাফেকদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারটির নামই হলো শাস্ত্রকথা, শাস্ত্রের আদর্শ ও নীতিকথা। প্রয়োজনে এইসব শাস্ত্রবিশারদরা যে মানুষকে ভুল পথে টেনে আনার জন্য বল্লমের মাথায় পবিত্র কোরান ঝুলিয়ে শাস্ত্রের

ললিত বাণী শোনায় তাহা ইতিহাসবিখ্যাত কথা। খরগোশের মতো দুই কান খাড়া না রাখলে এবং প্রচুর পড়াশোনা না করলে বিদ্রান্ত হবার সমূহ বিপদ হতে নিজেকে মুক্ত রাখা কষ্টকর ব্যাপার। অবশ্য তকদির বিষয়টি তো আঠার মতো সব সময় লেগে থাকবেই।

একদিন অধম লিখকের বাড়িতে দুইজন অতি উচ্চশিক্ষিত লোক দেখা করার জন্য এসেছিলেন। দেখা হলো এবং কথায় কথায় বলে ফেললেন যে, তারা চেতন গুরু (সম্যক গুরু, পীরে মোগা, সরিয়াল গুলি, গালবাতের পীর) সন্ধানে বেশ কিছুদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বললাম, ‘পেয়েছেন কি?’ বললেন, ‘সে জন্যেই তো আপনার কাছে আসা।’ বললাম, ‘আমার কাছে আসাটার মানে বুঝতে পারলাম না।’ বললেন, ‘আপনি যদি সত্যিই চেতনগুরু হয়ে থাকেন তো আমরা এখনই মুরিদ হবো।’ অবাক হয়ে বললাম, ‘চেতনগুরু বলতে কী রকম গুরু হতে হবে বুঝিয়ে বলুন।’ বললেন, ‘চেতনগুরু হলো এমনই শক্তিশালী গুরু যে, মুরিদ হবার পর সঙ্গে সঙ্গে রুহানি ফয়েজ দিয়ে কামেল বানিয়ে দেবে। আর আমরা কামেল হয়ে বিদায় নেব তথা যার যার বাড়িতে চলে যাব।’ আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এদের মাথাগুলো বাউল সন্ন্যাসীদের রচিত গান শুনে এ রকম হয়েছে, তাই এমন কথা বলতে পেরেছেন। আমি টিটকারির ছলে বললাম, ‘এখন বুঝতে পেরেছি যে চেতনগুরু বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন।’ বললেন, ‘হজুর এতকালে আমাদের মনের কথা সুন্দর ধরে ফেলেছেন।’ বললাম, ‘তা হলে তো চেতনগুরু বলতে আপনারা ইগলু এবং কোয়ালিটি আইসক্রিমের কথা বলছেন।’ বললেন, ‘এটা আবার কেমন কথা!’ বললাম, ‘আপনাদের হাতে একটা একটা করে ইগলু আইসক্রিম তুলে দেব আর আপনারা সেটা চেটে চেটে কামেল গুরু হয়ে

যাবেন, তাই না?’ লজ্জায় তারা খতমত খেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। বললাম, ‘যারা চেতনগুরু পকেটে নিয়ে ঘোরাফিরা করেন তাদের নামগুলো আপনারা জানেন কি? যারা মায়ের পেটেই ওলি ॥ যেমন গাউসুল আজম গাউসে পাক, খাজা গরিব নেওয়াজ, আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি, শেখ ফরিদ, শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরি, আরও অনেক অনেক। তারা কেন মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করতে গেলেন? বড়পীর সাহেব কেন ২৩ বছর ধ্যানসাধনা করলেন? খাজাবাবা কেন ১৪ বছর ধ্যানসাধনা করলেন? আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি কেন ১২ বছর ধ্যানসাধনা করলেন? শেখ ফরিদ কেন ৩৬ বছর ধ্যানসাধনা করলেন? শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরি কেন ২৯ বছর ধ্যানসাধনা করলেন? তারা সবাই মাদারজাত ওলি এবং মহানবির ডাইরেক্ট বংশধর। তা ছাড়া যিনি মহানবি, যার নামে আল্লাহ পাক এবং সমস্ত ফেরেশতারা দরুদ পাঠ করেন তিনি কেন ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন হেরাশুহায় নির্জনে একাকী ধ্যানসাধনাটি করতে গেলেন? তাঁরা তো চেতনগুরু বানান এবং যারা চেতনগুরু বানান, তাঁরা কেন ইংলু আইসক্রিম খাবার মতো একদিনের একটি অংশে সব কিছু পাবার ঘোষণাটি দিলেন না? আপনাদের মস্তিষ্কের মগজে এমন উর্বর ফসল ফলানোর বাণীটি কোন পাগলে শোনালো? শুনুন, যার নিষ্ঠা আছে তার জন্য চেতনগুরু। যিনি বৈষয়িক মোহটাকে নাই করে দিতে পেরেছেন এবং গুরুকে ধারণ করার যোগ্যতা (আস্থা) অর্জন করতে পেরেছেন তার জন্য চেতনগুরু।

যারা চেতনগুরু তৈরি করেন তাঁরা বছরের পর বছর ধ্যানসাধনাটি করে গেলেন আর আপনারা ধ্যানসাধনাটি করা তো দূরে থাক, এর ধার কাছ দিয়েও একবার

হেঁটে দেখলেন না, অথচ ইঁগলু আইসক্রিম, কোয়ালিটি আইসক্রিম খাবার মতো চেতনগুরু খুঁজে বেড়াচ্ছেন?’

দুনিয়ার নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কারের আশায় বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর কী প্রচণ্ড ধ্যানসাধনা করে গেছেন, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত অবশ্যই আপনাদের মনে আছে আর যেখানে আত্মপরিচয় জানার প্রশ্নটি ওঠে সেখানে কি কোনই ধ্যানসাধনার দরকার নাই? মনগড়া কথা বলে নিজেকে সন্তুষ্ট দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এরচেয়ে বেশি আর কী-বা আশা করা যায়? মনগড়া কথা বলে বলে সব ধর্মের পাণ্ডা-পুরোহিতদের কাছে স্বর্গে যাবার কথাটি কমবেশি শুনতে পাই এবং সেই সঙ্গে আরও একটি নূতন আবিষ্কারের কথা শুনতে পাই আর সেটা হলো, সবাই নরকে যাবে কেবলমাত্র তারা যে ধর্মে বিশ্বাসী তারাই স্বর্গে যাবে। কী চমৎকার ব্যবস্থাপত্র! কী চমৎকার চেতনগুরু! কী চমৎকার মুরিদ!

গরুর নাকে গোলাপ ফুল ধরেছিল সুগন্ধ দেবার জন্য। সুগন্ধ নেবার তকদির নিয়ে গরু জন্মগ্রহণ করে নি। তাই লম্বা জিভ বের করে এক ঝটকায় মুখে ভরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। তাই যারা গরুর নাকে গোলাপ ফুল ধরতে চায় তাদেরকে বোকা না বলে অভিজ্ঞতার অভাব আছে বলে ভাবাটাই মনে হয় সঠিক।

বিবর্তনবাদের কিছু কথা

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অনেক অনেক নরকের গ্যাস ও ধূলিকণা জুমাট বেঁধে চারশত ষাট কোটি বছর আগে এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। প্রাণের জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর জন্মগ্রহণ করার ষাট কোটি বছর পর এবং এই প্রাণের অস্তিত্ব প্রথম পাওয়া যায় বিশাল জলরাশি মহাসাগরে। পানির মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রাণের অস্তিত্ব। পিতার

পানিতে পুত্রের অস্তিত্ব। এই প্রাণী এককোষী প্রাণের মতো অদ্ভুত এবং জটিল প্রকৃতির ছিল না। একরকম জৈব সুপ তৈরি হচ্ছিল। সূর্য হতে আগত অতিবেগুনি রশ্মি এবং বিদ্যুৎ চমকানি সরল হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ অণুগুলো ভেঙে আলাদা করছিল আবহাওয়ায়ামণ্ডলে এবং সেই টুকরো অংশগুলো মিলিত হয়ে আরও অনেক জটিল অণু তৈরি হতে লাগলো। এই জৈব অণুটি ছিল ডি-অক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড যাকে ডিএনএ বলা হয়। যেগুলো তৈরি হয় জেনেটিক কোডের চারটি অক্ষর দিয়ে। নিউক্লিক অ্যাসিডের পার্থক্যের কারণেই প্রাণীগুলো ভিন্ন হয় এবং বংশবিস্তারে সহযোগিতা করে। বিজ্ঞানীরা এইখানে এসে ব্যাখ্যা না দিয়ে দৈবপরিবর্তন বলে ঘোষণা দিতে অনেকটা বাধ্য হন। কোনো প্রাণীকে অধিকতর ভালো অবস্থার দিকে পরিবর্তন আনতে দীর্ঘকাল লেগে যায় বলে ইহাকে দৈব পরিবর্তন বলা হয় এবং এভাবেই বিবর্তন এগিয়ে চলছে। এটাকেই বলা হয় বিবর্তনবাদ। আর সেই বিবর্তনবাদের জনক হলেন চার্লস ডারউইন। (লণ্ডন টাইমস ম্যাগাজিন হতে সংগৃহীত)। তিনি ১৮৫৯ সালে ওরিজিন অব স্পেসিস বা প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই পৃথিবীতে সমস্ত জীবসত্তা কোনো একটিমাত্র অজ্ঞাত মহাশক্তি থেকে আগমন করেছে। কোনো একটি অজ্ঞাত মহাশক্তি হতে আগমন করার অর্থটি তা হলে কী দাঁড়ায়? সে একটিমাত্র অজ্ঞাত মহাশক্তি বলে ডারউইন সাহেব কাকে এবং কী বোঝাতে চেয়েছেন? আপনারা এই অজ্ঞাত একটি মহাশক্তি হতে সৃষ্টিজগতের আগমন হয়েছে বলার মাঝে যে যাই বুঝতে চান, কিন্তু অধম লিখক সর্বশক্তিমান আল্লাহপাককেই বুঝতে চাই, এবং মনেপ্রাণে তাই বিশ্বাস করি। নাস্তিক্যবাদীরা অন্যরকম ব্যাখ্যা করেন এবং কার্ল মার্কস সাহেব তো নাস্তিক্যবাদের অপূর্ব (?) ফর্মুলাটি আবিষ্কার করতে গিয়ে ডারউইনের বুকের উপর পা

দিয়ে নাস্তিক্যবাদের কথাটি ঘোষণা করলেন। অথচ অবাক হবেন এই কথাটি শুনে যে, চার্লস ডারউইন সবসময় চার্চে গিয়ে ঈশ্বর-প্রেমে দু'চোখ বেয়ে কাঁদতেন। কার্ল মার্কস সাহেব এখানে এসে বেচারী ডারউইন সাহেবকে ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর কটাক্ষ করতে পিছপা হন নি এবং হেগেল সাহেবের দ্বান্ধিক দর্শনটি নিয়ে অধ্যাত্মবাদের দর্শনটিকে বাদ দিয়েছেন কথা ও যুক্তির যথেষ্ট মারপ্যাচ দেখিয়ে। অদ্রান্ত এবং দ্রান্ত দুটো পথই খোলা আছে। যে যেমন সে তেমন পথ দিয়েই চলবে। অনেক মনোবিজ্ঞানী বলে থাকেন যে, যারা চোখের জল বেশি ফেলেন তারা মূলত উদার প্রকৃতির হন। কারণ চোখের জল মানুষকে নরম প্রকৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই সাম্যবাদ (কমিউনিজম) যতই মধুর বলে মনে হোক না কেন, নিষ্ঠুর প্রকৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কারণ সাম্যবাদীরা তথা কমিউনিষ্টরা কাঁদে না। কারণ, কান্নাটিকে নরম মনে না করে দুর্বলতার রোগ মনে করেন।

বিবর্তনবাদের ভাষ্যকার টমাস হাক্সলি লিখেছিলেন এই বলে যে, ডারউইন এবং ওয়ালেসের গবেষণাটি হলো ঐ সব মানুষের জন্য যারা রাতের আঁধারে পথ হারিয়েছে : তাদের কাছে একটি বিরাট আলোর বিস্ফোরণ, একটি বিরাট আলোর ঝলক। টমাস হাক্সলি আরও বলেছেন যে, কত বড় বোকা ছিলাম বলে এই বিবর্তনবাদের কথাগুলো আগে ভাবতে পারি নি। যখন ওরিজিন অব স্পেসিস-এর মূল বিষয়টি বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম, তখনই এ রকমটা মনে হয়েছিল। এই কুৎসিত অন্ধকার ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য ডারউইন এবং ওয়েলসই যথেষ্ট। গির্জার পাদ্রিদের ধর্মীয় যাদুকরি ভাষণের মাঝে ভুবে ছিলাম বলেই এই আসল রহস্যটি বুঝতে পারি নি।

ধর্মের উপর যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন ॥ এই দুইটি ধারণা নিয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে বলে অনেকেই ভ্রান্ত ধারণার শিকারে পরিণত হচ্ছে। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘরছে, এই মতবাদকে এখন মৃত, পচা লাশ, অচল এবং লোক-হাসানো গল্প মনে করে। কিন্তু তাই বলে কি সবাই! না, এখনও এই দিনেও পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘোরার শাস্ত্রকথার কত দলিল হাজির করে বই লিখা হচ্ছে এবং এতে ধর্মের মান ও অবস্থাটিকে দুর্বল করা হচ্ছে। তাই তো আল্লাহ বলেছেন যে, তাঁর কিতাব পাঠ করে কেউ পথ পাবে, কেউ পথ পাবে না। এ যেন বিষয় একটাই, কিন্তু দর্শনের বিভিন্নতা। এ যেন পবিত্র কোরান-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মতো। ব্যাখ্যার মাঝে তো মিল না পাওয়াটা একদম স্বাভাবিক। কিন্তু অনুবাদেও যে এত গড়মিল পাওয়া যাবে, এটা পাঠক আশা করেন নি।

বিজ্ঞানীদের মতে চারশত কোটি বছরের প্রাণের অস্তিত্বটি কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হবার পর মানব-আকৃতির রূপ ধারণ করতে প্রাণীকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। অতি সাধারণভাবে চিন্তা করতে গেলেও আমরা দেখতে পাই যে, অতি ক্ষুদ্র গুল্মকীট সাদা পানিতে ভাসতে থাকে। তারও তো মানুষের আকৃতি ধারণ করতে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সন্দেহাত শিশুটি দেখেই একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের কথা চিন্তা করি। মানব-আকৃতি পাবার পরও সেই প্রাচীনকালের মানুষটিকে জীবজন্তুর আধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে। কারণ সেই মানুষটির আকৃতি মানুষের মতো হলেও নফসের অধিকারী মাত্র। সেই মানুষটি তখনই পূর্ণ আকার ধারণ করতে পারে যখন রুহ তথা পরমাত্মা তথা স্বয়ং আল্লাহ পাক রবরূপ ধারণ করে সেই মানুষের মধ্যে অবস্থান করেন। (সূরা

হিজর)। পরিপূর্ণ মানবের সঙ্গে আল্লাহ্ যে থাকেন তা কোরান-ই বলছে। নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ তথা ‘আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি।’ এখানে আল্লাহ একবচন ব্যবহার না করে বহুবচনটি ব্যবহার করেছেন। এখানে আল্লাহ ‘আমি’ তথা একবচন ব্যবহার না করে ‘আমরা’ তথা বহুবচন ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ এক, কিন্তু পরিপূর্ণ মানবের মধ্যে প্রবেশ করার সময় ‘নাহনু’ তথা আমরা হয়ে যান। এই বিষয়টির গবেষণা করলেই কিছুটা রহস্য উদ্ঘাটন করা যায়। যে মানুষটির মধ্যে আল্লাহ সর্বপ্রথম রুহ ফুৎকার করেছেন সেই মানুষটির নাম আদম (সূরা হিজর)। তা না হলে মাটি আল্লাহ আগে সৃষ্টি করেছেন। মাটি সৃষ্টি করলেই প্রাণের অস্তিত্ব আসতে বাধ্য। সেই মাটি দিয়ে আদমকে তৈরি করা হয়েছে। তাই জিন আজাজিল আদমকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। কারণ জিন আগুনের তৈরি আর আগুন যে মাটির আগেই তৈরি এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রতিটি জীবের মাঝে নফস থাকতে পারে, কিন্তু রুহ নাই। যখনই জীবের মাঝে রুহ ফুৎকার করা হয় তখনই সে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তাই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। প্রচণ্ডভাবে রূপকের পর রূপকতার আশ্রয়ে সত্যকথাটি ধারণাতে আসতে কষ্ট হয়। আল্লাহর বাণীতে রূপকতার ব্যাপক আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকতার মোড়ক ছাড়া সেই যুগে সত্যটি প্রকাশ করলেও মানুষের উপলব্ধির দরজায় ধাক্কা মারতে হয়তো কষ্ট হতো।

আহাদ আল্লাহ এবং ওয়াহেদ আল্লাহর পার্থক্য

প্রাচ্যের দর্শনের উপর দাঁড়িয়েই অনেকে আল্লাহ্ তথা খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করেন। কারণ ইউরোপের যত দার্শনিক আছেন তাদের মধ্যে হাতেগোনা

মাত্র কয়েকজন আল্লাহর অস্তিত্বের অনেক রকম প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন প্রথমেই নাম নিচ্ছি দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের। তারপর দার্শনিক হেগেল এবং তারপর দার্শনিক বার্মস্ট্রাম এবং বার্কলি। তবে দার্শনিক দেকার্তে এবং শোপেনহাওয়ারকেও আল্লাহতে বিশ্বাসী বলা যায়। এখন প্রধান প্রশ্নটি হলো, এদের আল্লাহ কি এক না একক, অদ্বৈত এবং স্বয়ম্ভূ? এদের দর্শনগুলো পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, এরা এক আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য কত প্রকারে প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর। আবার এদের যুক্তিগুলোকে হুঁদুরের কাপড় কাটার মতো নাস্তিকেরা জোড়ালো (?) যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে থাকেন। কেউই হার মানতে চায় না। এ যেন চ্যানেল আই-এর তৃতীয়মাত্রা-র দুইটি রাজনৈতিক দলের তর্ক-বিতর্ক। কথা আছে, ব্যাখ্যার চোখ-ধাঁধানো যুক্তি আছে আর আছে অন্য দলকে টিকা-টিপ্পনী কাটা : কিছু উভয়ের দর্শনটি সম্পূর্ণরূপে দুই বিপরীত কোণে অবস্থান করছে। এদের চোখে আঙুল ঢুকিয়ে বোঝাতে যদি কোনো নিরপেক্ষ জ্ঞানী চান তো কেহই মেনে নেয় না এবং মানে কিনা সন্দেহ। পশ্চাত্য দর্শন ওয়াহেদ (এক) আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু আহাদ (অখণ্ড) আল্লাহর ধারণাটি করতে পারে নি। সুতরাং কোরান-এ বর্ণিত আহাদ আল্লাহ হলেন অখণ্ড তথা যাহাকে কোনো অবস্থাতেই খণ্ডন করা যায় না এবং খণ্ডন করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ দ্বিতীয় কোনো অস্তিত্ব নাই বলা হয়েছে। সুতরাং অস্তিত্ব যার নাই সেটা তো শূন্য। একদম ফাঁকা। সহজ ভাষায় বলতে হচ্ছে যে, একটি গাছের পাতারও বলার কোনো ক্ষমতা নাই যে, সেই পাতা যতই ছোট হোক না কেন আল্লাহ হতে আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। কারণ আল্লাহ বলেন, ‘লা শারিকা লাহ’ তথা যার কোনো শরিক নাই। এমন কেহই নাই যে, সে বলতে পারে

আল্লাহ্ ছাড়া আমারও আলাদা অস্তিত্ব আছে তথা শরিক করার ঘোষণাটি অণু-পরমাণুরও নাই। তাই আল্লাহ্, ‘লা শরিক।’ ওহাবিরা লা-শারিকের সম্পূর্ণ উল্টা ব্যাখ্যা করে ওলি-আউলিয়াদেরকে আল্লাহ্র শরিক মনে করেন এবং তাই আউলিয়াদের কাছে কিছু চাওয়াকে শেরেক মনে করেন। ভাবখানা এমনই দেখান যে, কত বড় জ্ঞানী তারা! তারাই কেবল আল্লাহ্র সাথে শেরেক করেন না এবং বাকি সবাই শেরেক করে চলছে। সুতরাং ওহাবিদের দৃষ্টিতে সমাজকে শেরেক (?) মূক্ত করতে হবে। কোরান বলেছে : বলো, তিনি আল্লাহ্ই হলেন আহাদ। বলো, তিনি আল্লাহ্ই হলেন ‘ওয়াহেদ’ ॥ এই রকম কথা কোরান বলে নি। আহাদ আল্লাহ্ সমস্ত প্রকার সীফাত তথা গুণাবলি নিয়ে বিরাজিত আর ওয়াহেদ আল্লাহ্ হলেন সমস্ত প্রকার সীফাত তথা গুণাবলির অনেক উর্ধ্বে, কেবলই একা। সুতরাং কোরান ওয়াহেদ আল্লাহ্র কথাটি যেমন বলেছে তেমনি আহাদ আল্লাহ্ তথা অখণ্ড আল্লাহকে চিনে নেবার, বুঝে নেবার আশ্রয় রয়েছে। তুমি দেখতে চেষ্টা করো যে, আল্লাহ্ কেবলই ওয়াহেদ নন, বরং তিনি আহাদও। এই আহাদ আল্লাহ্‌টির বিষয়ে সম্যক অবগত হতে পারলে আর সিদ্ধান্তহীনতার কোনো অবকাশ থাকে না। পশ্চিমের জঁদরেল বড় বড় দার্শনিকেরা এখানে এসে সব কিছুর খেঁই হারিয়ে ফেলেন। ওয়াহেদ আল্লাহ্ এবং আহাদ আল্লাহ্র বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি পাবেন বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী রচিত সিররে হক জাম্মে নূর এবং মাতলাউল উলুম নামক দুইটি মহামূল্যবান গ্রন্থে। তারপরও পাঠকদেরকে বলছি যে, ওয়াহেদ আল্লাহ্ তথা এক আল্লাহ্ আমাদেরকে বলেছেন তথা অনুধাবন করতে বলেছেন তথা দেখে নিতে বলেছেন, তুমি দেখতে চেষ্টা করে যাও যে, এই ওয়াহেদ আল্লাহ্ তথা এক আল্লাহ্ই কিন্তু একমাত্র আহাদ আল্লাহ্ তথা অখণ্ড আল্লাহ্। যাহা

কোনভাবেই কোনো অবস্থাতেই খণ্ডন করা যায় না, বিভাজন করা যায় না, উহাই আহাদ তাই ‘লা মগজুদা ইল্লাল্লাহ’ তথা ‘কোনো অস্তিত্বই নাই একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া।’ আবার বলা হচ্ছে যে, তুমি যে দিকেই তাকিয়ে দেখ না কেন, কোথাও আল্লাহর চেহারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। চেহারাটি পরিপূর্ণতার একটি বিশেষ অংশ। চেহারাটি পরিপূর্ণ জ্ঞানের একটি বিশেষ স্ফোতি রূপ তথা গুণাবলির সুন্দর শৈলী মাত্র। আবার বলা হচ্ছে যে, পূর্ব-পশ্চিমের যেদিকেই তাকিয়ে দেখ না কেন, তুমি দেখতে পাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই। এই কথাটি আরও খোলাসা, আরও প্রকাশ্যভাবে বলা হয়েছে। এখানে কিছু বিশেষ কিছু দেখার কথাটি বলা হচ্ছে না, বরং বলা হলো যে, পূর্ব এবং পশ্চিমে তথা সবখানে, সর্বস্থানে, সর্ববিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। কারণ সামান্য কিছু আল্লাহ হতে সম্পূর্ণ আলাদা থাকলে তো দেখতে পাবে! কিছু একটি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুটিকেও আল্লাহর অস্তিত্বের বাহিরে পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনোই অবকাশ নাই। কিছু পৃথক সত্তা থাকলে তো দেখা যাবে! তাই পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা ওয়াহেদ আল্লাহর প্রমাণটি তুলে ধরেছেন আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু নাস্তিক দার্শনিকেরা সেইসব যুক্তিতর্ক কেটে দিতে চেষ্টা করেছেন। অবশেষে অনেক পাঠক নাস্তিক দার্শনিকদের কথাগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করে গ্রহণ করে নেয়। নতুবা কোরান-এর দৃষ্টিতে ওয়াহেদ এবং আহাদের আসল বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তুলে ধরলে হয়তো খুব কম লোকই নাস্তিক্যবাদের দিকে ধাবিত হতো। অবশ্য এই নাজুক বিষয়টিতেও তকদির নামক সিদ্ধাবাদের দৈত্যটিকে ফেলে দেবার কোনো উপায় নাই। আর কেউ যদি বলেন যে, এক আল্লাহ তথা ওয়াহেদ আল্লাহ কেন আমাদের এই উপদেশটি দিতে যাবেন যে, তুমি

বলো তথা তুমি দেখতে চেষ্টা করো যে আল্লাহ কিছু কেবলই ওয়াহেদ নন, বরং তিনি আহাদও। অবশ্য আহাদরূপে যিনি আল্লাহকে দেখতে পেরেছেন তিনিই আল্লাহর ওলি। এক বিনে দ্বিতীয় কিছু যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করাটাই হলো আল্লাহর আহাদরূপের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। কারণ প্রতিটি মানুষ তার মনের অজান্তে আহাদের সঙ্গে জড়িত, অথচ বোঝা যায় না। আগুন, পানি, মাটি বাতাসের দ্বারাই আমার দেহটি এবং নফসটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই চারটি জিনিস কোথা হতে এল বললেই দার্শনিকদের অনুমানভিত্তিক উত্তরটি দিতে হয় অথবা দৈব মহাশক্তি হতে আগমন হয়েছে বলে বলতে হয়। আমরা বলে দেব যে, ইহা সর্বশক্তিমান আল্লাহ হতে এসেছে। কেউ কিছু জম্মি দান করলে মনটা কেন খুশি হয়? কারণ জম্মি মানেই মাটি আর আমার দেহের একটা বিরাট অংশও মাটির। তাই মাটি মাটিকে আকর্ষণ করলে নফস খুশি হয়। এই খুশিটাকে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে যখন সাধক নিরপেক্ষ করতে পারেন, তখন তার মন খুশির বদলে নিরপেক্ষ হয়ে যায়। সুতরাং আহাদ আল্লাহর পরিচয় বই পড়ে প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব নয়। তাই আমরা সব সময় ওয়াহেদ আল্লাহর কথাই মনে করি। তাই বলা হয়েছে, বলো আল্লাহ স্বয়ং আহাদ। আহাদরূপে আল্লাহর দর্শন হলে আর কোনো সংশয় থাকে না। সাধক তখন দেখতে পান যে, সর্বভূতে (বিষয়ে, অস্তিত্বে) তিনিই শান-মান-জালুয়া নিয়ে বিরাজিত। তাই আল্লাহর আরেক নাম জুলজালাল এবং কারামতওয়ালা তথা একরাম। সুতরাং আহাদ আল্লাহর পরিচয় লাভ করার পর সেই সাধককে আল্লাহ আছে-কি-নাই বলাটাও একটি বিরাট আত্মবিরোধী কথা। এখন কেউ যদি পাথরের বাটিতে খোদাই করে ফুলের নকশা ঐকে সেই স্থানগুলোতে সোনা ঢালাই করে দিলে প্রশ্ন করেন এই বলে যে, ইহা কী?

যদি বলি, ইহা পাথরের বাটি তা হলে সে বলবে, না! এটা কেবলই পাথরের বাটি নয়, বরং এর সঙ্গে সোনাও আছে তাই ইহা সোনার পাথর বাটি।

অধম লিখকের অভিজ্ঞতার একটি কথা বলছি, যদিও দার্শনিক দৃষ্টিতে তাহা অচল। এক ধনী ব্যক্তি তার স্বীকে নিয়ে আমার ডিসপেনসারিতে এসেছেন চিকিৎসার ওষুধ নেবার জন্য। চিকিৎসা আগে থেকেই চলছে, রোগী কিছুটা ভালো, তাই পুনরায় ওষুধ নিতে এসেছেন। রোগীর কিছুটা ভিড় ছিল বলে লোকটি বললেন, ‘ডাক্তার সাহেব, আমাকে তাড়াতাড়ি আজ ছেড়ে দিতে হবে, কারণ কিছুক্ষণ পরেই চট্টগ্রাম যেতে হবে।’ আমি বললাম, ‘কাজ আছে বুঝি!’ বললেন, ‘পোর্টে যেতে হবে, কারণ চীন হতে কয়েক টন আদা জাহাজে করে এসেছে। সেই আদা জাহাজ হতে তাড়াতাড়ি খালাস করতে পারলে ভালো দাম পাওয়া যাবে।’ আমি হো হো করে হেসে বললাম, ‘আদার ব্যাপারির আবার জাহাজের খবর!’ উনি হাসবার কারণটি বুঝতে পেরে বললেন যে, ‘আদা তো অনেক দাম, এখন জাহাজে করে পিয়াজ-রসুন-হলুদ পর্যন্ত আসছে।’ এই যুগে, এই সময়ে আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরটির মতো প্রবাদ আর চলছে না। কারণ বাস্তব দৃষ্টিতে এই কথাটি সম্পূর্ণ অচল।

আল্লাহর ওলিরা বলে থাকেন যে, অসহায় গরিব মানুষগুলোর আগে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করো, তারপর ধর্মবাণী শোনাও। আগেই ধর্মবাণী শোনানোটা এদেরকে অপমান করা। কারণ ধর্মবাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে বাস্তবতা। এরা ধর্মবাণী শোনবার উপযুক্ত নয়, বরং আহার-বাসস্থানের উপযুক্ত। সম্মাধানের মাধ্যমে কমিউনিজমকে বেছে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এই মজলুমদের চোখে টাঁদ ভালোবাসার প্রতীক কেমন করে হবে? কারণ এদের

বাঁচবার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাই এরা যদি চাঁদ দেখে আধা-পোড়া রুটি, ঝলসানো রুটি বলে তো দোষটা কাদের? যদিও শুনতে মোটেই ভালো লাগার কথা নয়, আজব কথা বলে মনে হবে। তবু কবি লিখে ফেলেন : ভাত দে, হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো ॥ ইত্যাদি।

ফ্রান্সের রাজার অমানুষিক জুলুম-অত্যাচারে জনগণ খেপে গেল। তারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এদের একটাই দাবি ছিল : বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। ফরাসি বিপ্লব নামে ইতিহাস তাহার পরিচয় বহন করছে। অর্থনীতিটাই হলো মানবমুক্তির সনদ, দর্শনের মূল চাবিকাঠি, ইত্যাদি আবিষ্কার করতে বাধ্য করা হলো মার্কস-এঙ্গেলসকে। অনেকটা চাঁদকে ‘ঝলসানো রুটি’ বলতে বাধ্য করা হয়েছে। ব্যক্তির মানবীয় স্বাভাবিক গুণগুলো তখন ঝলসানো রুটির মতো ॥ বৈজ্ঞানিক (?) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করি, কিন্তু লজ্জার ইতিহাস পড়ে লজ্জায় প্রতিবাদ করি। নিজেদের বেলায় ষোল আনা বোগল দাবা করে রেখে মজলুমদের পিঠ তেঁকিয়ে দিলে মজলুমরা তো আমাদের লিখনীকে শোষকদের পা-চাটা পাগলা কুত্তা বলবেই। অনেক রকম বিশেষণ মেশানো গালিগালাজ করাটা তো একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

মহানবি একবার সাহাবাদের উপদেশ দিলেন এই বলে যে, জালিমদেরকে তোমরা সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে (আনসুরুজ্ জালেম্মা)। সাহাবারা চমকে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! কেমন করে জালিমদেরকে সাহায্য করবো? (কাইফা আনসুরুজ্ জালেম্মা?) সঙ্গে সঙ্গে মহানবি বললেন, জুলুম করা বন্ধ করে দাও (কুফুহ আনিজ্ জুলম্মে)। আমরা কি মহানবির উপদেশটি বুকে ধারণ করে জালিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছি? যদি বলি, না ॥ তা হলে

উল্টাপাল্টা ঝড়ঝাপ্টা আসবেই। কলুষিত পুঁজিবাদ খাল কেটে কুমির আনয়ন করেছে আর সেই কুমিরের নাম নাস্তিক্যবাদে মোড়ানো কমিউনিজম। কলুষিত পুঁজিবাদের ধারক-বাহকেরা যখন মনগড়া বিকৃত ধর্মের দোহাই দিয়ে কমিউনিজমকে ফেরাতে চেয়েছে তখন যেই বিদ্রোহের বিলাপটি হজম করতে বাধ্য করা হয়েছে আর সেই বিলাপটির নাম হলো, ‘যে স্রষ্টা তোদের মতো শোষক জালিম তৈরি করে সেই স্রষ্টাকে মানি না।’ (এই বিষয়টি বিস্তারিত জানতে হলে অধম লিখকের রচিত মার্নেফেতের গোপন কথা বইটি পড়ে দেখতে পারেন)।

আহাদ আল্লাহর বদলে ওয়াহেদ আল্লাহর প্রমাণটি তুলে ধরতে গিয়ে কত রকম যুক্তি যে দাঁড় করানো হয় আর সেই যুক্তিগুলো নাস্তিক দার্শনিকেরা কচু কাটার মতো কেটে দেয়। এই সব কথাগুলো তুলে ধরতে রুচিতে বাধে। তবুও বলছি যে দার্শনিক কার্ট বলছেন, ‘ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলে কোনো সত্তা না থাকলে প্র্যাকটিকাল রিজন দ্বারা কাজ চালানো যেতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গেই ঈশ্বরের সত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।’ দার্শনিক কার্টের এহেন কথা শুনে নাস্তিক দার্শনিকেরা টিটকারির ভাষায় বলে ফেলেন, ‘আম্মার বিশ্বাস যে, আম্মার পকেটে ১০০ ডলার আছে ॥ ইহাতেই কি প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই পকেটে ১০০ ডলার আছে?’

আর এক বিখ্যাত দার্শনিক কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলতে লাগলেন যে, ‘ঈশ্বর যদি নাও থাকেন তবুও একজন ঈশ্বরকে কল্পনায় বানিয়ে নিতে হবে। কারণ বিশ্বাসটা নীতির পথে অবিচল রাখে।’ এই কথাগুলোর উপর আর মন্তব্য করতে চাই না। যে যেভাবে বুঝতে চায় বুঝুক। দার্শনিকদের কথাগুলো বিস্তারিত তুলে ধরে বিদ্যার বুজরুকি না করাই শ্রেয়। কার্টের পরেই হেগেলের অবস্থান। দ্বাদ্ধিক ঈশ্বরবাদই হলো

হেগেলের মূল কথা। এই কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কত ডিজাইনের যে গুরুগম্ভীরমার্কা প্যাচালের গীতের বয়ান দিয়েছেন পড়লে অবাক হতে হয়। আহাদ আল্লাহ হতে আলাদা করে ওয়াহেদ আল্লাহর ব্যাখ্যা তুলে ধরতে গেলে এমনটি হতে বাধ্য। নাস্তিকদের তীর-ধনুকের আঘাত খেতে খেতে শিশুর মতো অবশেষে ভঁয়া করে কাঁদতে হয়। আস্তিক দার্শনিকদের বইগুলো পড়ে দেখুন ॥ দেখতে পাবেন আমার কথাগুলো সত্য কি না।

‘কোনো অস্তিত্বই নাই, আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া’, ‘পূর্ব এবং পশ্চিমের যেকোনো তাকাও আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না’, ‘যেকোনো তাকাও না কেন, আল্লাহর চেহারা ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না’ ॥ এই জাতীয় বাণীগুলোর প্রচুর গবেষণা হওয়া উচিত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহর বাণীগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে গেলে দুনিয়ার সমস্ত পানি শেষ হয়ে যাবে, তবুও ব্যাখ্যা লিখা শেষ হবে না ॥ এই কথাগুলো অধর্মের নয়, বরং আল্লাহর। ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই মহাবিশালতার ব্যাখ্যাটি কী করে করা সম্ভব? বরং মহাবিশালতার মধ্যে ডুবে একাকার হয়ে যাওয়াটাই সঠিক বলতে চাই। সুফিবাদ এই কথাটিই জানিয়ে দেয়। বলে দেয় : তুমি ক্ষুদ্র বিন্দ্বে তাই সিন্ধুকে ধারণ না করে সিন্ধুতে মিশে যাও তথা ফানা হয়ে যাও। ফানাতে ভাষা থাকে না। আর ভাষা থাকলেও সবাই বুঝতে পারে না। কারণ সুফিবাদের ভাষাটি সবাই বুঝতে পারে না। তাই শাস্ত্রবিশারদরা শাস্ত্রকথাগুলোকে ধর্মের মূলমন্ত্র মনে করে সুফিদের কথাগুলোকে কুফরি বলে গাল দেয় এবং আম-জনতাকে সুফিবাদ হতে দূরে থাকতে উপদেশ দেয়। ‘আপন নফসকে হত্যা করো’ বলতে শাস্ত্রবিশারদরা তরবারির খোঁচা মারাটাকে বুঝে থাকে। অনেক বড় বড় সুফিরা বলে থাকেন যে, দৈহিক মিলনের চরম মুহূর্তে

যেমন কথা বলা যায় না, তেমনই পরমাত্মার সাগরে জীবাত্মা বাঁপ দিয়ে একটা কথাই শুধু বলে, আর সেই কথাটি হলো, মান নমিদানাম তথা ‘আমি জানি না’ অথবা ‘আমিই সত্য’ অথবা ‘তিনিই আমি, আমিই তিনি।’ জাগতিক ভাষায় কোনো কোনো সুফি ব্যাখ্যা দিতে গেলেও আগা-মাথা কিছুই বোঝা যায় না। বাবা শেখ ফরিদ, আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি আর বু আলি শাহ কলন্ডরের কথাগুলো এতই উঁচু মাপের কথা যে, সুফিবাদের গবেষকদেরও মাথা ঘুরে যায়। অবশ্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ভাষায় ‘কামেল পীর’ বলে ছবি দিয়ে প্রচার করা পীর ইনারা মোটেই নন। চীন দেশে বানানো একদম হবহ ওমেগা ঘড়ি ১৬৫ টাকায় বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু সুইজারল্যান্ডের ওমেগা ঘড়ি ৫০,০০০ টাকায় কিনতে হয়। যিনি বুঝবার তিনি এই সামান্য কথাতেই বুঝতে পারবেন।

গণতন্ত্রমনা জনতার নিকট একটি আস্থান

আমাদের শাস্ত্রবিদেরাও আহাদ আল্লাহ হতে ওয়াহেদ আল্লাহকে আপন দেহের মাঝের অবস্থানটিকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে আকাশের উর্ধ্বে উঠিয়ে রাখে। তাই ওলি-আল্লাহদের উলঙ্গ কথাবার্তা বুঝতে না পেরে শেরেক আর হারামের গন্ধ পায়। এ রকমভাবে আল্লাহকে দেখতে গেলে তো শেরেক আর হারামের গন্ধটি পাওয়া একান্তই স্বাভাবিক বিষয়। এই সকল শাস্ত্রবিদেরা আল্লাহকে মুখে মুখে

সর্বশক্তিমান বলে, কিছু কাজের বেলায় সর্বশক্তিমান আল্লাহকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। অবশ্য পাইকারিভাবে সব শাস্ত্রবিদদের কথা বলছি না। আদমকে কেন আল্লাহ সেজদা দিতে বললেন? আদমের ভেতর জাগ্রত রুহ তথা রবরুপী আল্লাহ স্বয়ং হাজির আছেন বলেই সেজদা দিতে বলেছেন। এই বিষয়টিতে শাস্ত্রবিদেরা একমত পোষণ করতে পারেন নি বলেই জটিল সমস্যা দেখা দেয়। আরও বেশি জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যখন আমাদের টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোতে সুন্নির হৃদ্যবেশ ধারণ করে ওহাবি মতবাদটি প্রচার করা হয়। অথচ বাংলাদেশে বহু বড় বড় সুন্নি আলেম আছেন : যেমন কাদেরিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসার শিক্কেরা এবং চট্টগ্রামের ষোল শহরে অবস্থিত সুন্নি মাদ্রাসার বড় বড় আলেমেরা। এই সুন্নি আলেমদের থেকে মাত্র একজন আলেমকে সুযোগ করে দিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন সুন্নির লেবাসে বর্ণচোরা আলেমেরা কেমন করে পালিয়ে যায়। কারণ সুন্নি আলেমদের সঙ্গে ওহাবি আলেমেরা কোনোদিন কোনো কালেও বাহাসে আসে না। যমের মতো ভয় করে। সবিনয়ে অনুরোধ করছি, একবার সুন্নি আলেমকে সুযোগ দিয়ে দেখুন, মজাটা তখনই বুঝতে পারবেন। তখনই বুঝতে পারবেন ওহাবি আলেমদের বিদ্যার দৌড় কতখানি। কেবল ফাঁকা মার্চে একপক্ষ দিয়ে খেলানো হলে খেলার মজাটি কি দেখা যায়? একবার খেলা জমাবার আশায় পরীক্ষামূলকভাবে একজন সুন্নি আলেমকে দাঁড় করিয়ে দেখুন না! দেখতে পাবেন অধমের কথাগুলো বর্ণে বর্ণে কতটুকু সত্য। তা ছাড়া আমাদের ধর্মে বড় বড় যে কয়টি ফেরকা আছে তার মধ্যে সুন্নি, ওহাবি আর শিয়ারাই প্রধান তিনটি ফেরকা। শিয়া ফেরকার আলেম দাঁড় করালে শুনতে পাবেন সব নূতন কথা এবং এইসব নূতন কথা তারা কোরান-হাদিসের দলিল দিয়েই শুনিয়ে দেবে। যেমন ওহাবির

তাদের কথাগুলিও কোরান-হাদিস দিয়েই শুনিয়ে আসছে। সুতরাং সুন্নি আলেমদের দাঁড় করিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন কোনো আলেম আর ধোপে টিকতে পারছেন না। সত্যকথাটি কারা বলছে তার তুলনামূলক বিচারক তখন আপনিই হয়ে যাবেন। আর আম জনতাও সুন্দর বুঝতে পারবে। এই রকম একটি সুযোগ কি কোনোদিন একজন সুন্নি আলেম পাবে না? গণতন্ত্রের আদর্শ বুকে ধারণ করে যদি কেবলই একপক্ষের কথাগুলি শুনবেন আর অন্যপক্ষকে বলবার কোনো সুযোগই না দেওয়া হয়, তো গণতন্ত্রের আদর্শটি কি মেনে নেওয়া হলো? একটিবার অন্যপক্ষকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে দেখুন। যদি পছন্দ না হয় তো বাদ দিয়ে দেবেন। কিন্তু বলার কোনো সুযোগই দেওয়া না হলে গণতন্ত্রের মর্যাদাটি কি থাকে? বিচারক তো একপক্ষের কথা শুনে কোনোদিন রায় দেন না।

কোনো এক সাহাবা কলেমা পাঠ করার পরও প্রতিপক্ষকে হত্যা করাতে অন্য এক সাহাবা মহানবিকে এই কথাটি বলার পর, মহানবি সেই সাহাবাকে হত্যা করার কারণটি জানতে চাইলে সাহাবা বললেন যে, সেই লোকটি মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। মহানবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘তোমার তরবারির অগ্রভাগটি কি তার হৃদয়েও প্রবেশ করছিল?’

মৌখিক স্বীকৃতির নাম শরিয়ত, আর হৃদয়ের স্বীকৃতির নাম মারফত এবং মারফতের বিষয়টি নিয়ে বিচার করতে নাই, কারণ উহা আল্লাহই ভালো জানেন। আরেকটি ঘটনার কথা বলছি : এক সাহাবার মনে খটকা লাগছে যে, এ রকম প্রকৃতির মানুষ কেমন করে বেহেশতে যেতে পারে? অথচ মহানবি বলছেন। সাহাবা তিন-তিনবার একই প্রশ্ন করাতে মহানবি বললেন যে, তোমার নাকে আঘাত লাগলেও (তোমার পছন্দ না হলেও) সে বেহেশতে যাবে।

ফেরকাবাজির ধর্মীয় ধৃষ্টতা

শিয়া ফেরকার অনুসারী আল্লাম্মা তাবাতাবাইর কোরান-তফসির আলমিজান পড়ে দেখার জন্য অন্যান্য ফেরকার মুসলমানদের আস্তান জানানো হয়। মুতাজিলা ফেরকার অনুসারীরা আল্লাম্মা জাম্বাকসুরির তফসিরে কাশ্শাফ তফসিরটি পড়ে দেখার জন্য অন্যান্য ফেরকার মুসলমানদের আস্তান জানানো হয়। সুন্নি ফেরকার অনুসারী মুফতি ইয়ার আহমদ খান নঈমির তফসিরে নঈমি তফসিরটি পড়ে দেখার জন্য অন্যান্য ফেরকার মুসলমানদের আস্তান জানানো হয়। ওহাবি ফেরকার অনুসারী ইমাম আবুল ফেদা ইসমাইল ইবনে কাসিরের তফসিরে কাসির-টি পড়ে দেখার জন্য অন্যান্য ফেরকার মুসলমানদের আস্তান জানানো হয়। দেওবন্দি ফেরকার অনুসারী হজরত মাওলানা আশরাফ আলি খানভি সাহেব রচিত তফসির বায়নুল কোরান পড়ে দেখার জন্য অন্যান্য ফেরকার মুসলমানদের আস্তান জানানো হয়। ফেরকাবাজি ভুলে গিয়ে সকল ফেরকার অনুসারীদের কোরান-তফসির পড়ে দেখলে পার্থক্যটি কিছুটা হলেও ধরা যায়। ধরা খাওয়া এবং সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টিতেও তকদির বিষয়টি জড়িত বলে মনে করি।

নির্ভেজাল বিজ্ঞান (পিওর সায়েন্স) পবিত্র বিজ্ঞান। কারণ পবিত্র বিজ্ঞান কারও ক্রটি করে না। আবার প্রয়োগ করা বিজ্ঞান (এপ্লায়েড সায়েন্স) মানুষের মঙ্গল যেমন করতে পারে তেমনি ক্রটিও করতে পারে। আণবিক শক্তির কথা বললেই মনের মধ্যে ভয় আসে ॥ হিরোশিমা এবং নাগাসাকির কথা শুনে। কিন্তু আণবিক শক্তি যে মানুষের মঙ্গলও করে তা চোখে দেখলেও ভীতিটি দূর করা যায় না। বিষদাঁতভাঙা জাতিসাপের ছোবলে মৃত্যুর ভীতিটা দূর করা যায় না।

আল্লাহর কালান্বিত কোরান পবিত্র। কারণ আত্মজিজ্ঞাসার দর্শন হলো কোরান। কিছু ব্যাখ্যা তথা তফসিরের প্রশ্নে কারো সঙ্গে কারো মিল পাওয়া যায় না। ব্যাখ্যার প্রশ্নে কিছু না কিছু পার্থক্য থেকে যায়। যার কাছেই যাবেন, মনে হবে ঠিকই তো বলছে। সবার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে অথচ পার্থক্যটি বিরাট হওয়া সত্ত্বেও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কষ্টকর। দুনিয়ার রাজনীতির মতাদর্শের প্রশ্নে গিয়ে দেখুন : দেখতে পাবেন প্রত্যেকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কী অপূর্ব চং! আমাকে আর আপনাকে এরা সাতবার কিনে সাতবার বেঁচে দিতে পারবেন। তাই বলছি, সুফিবাদ আপনাকে আর কিছু দিতে পারুক আর নাই পারুক, কিছু আত্মপরিচয় জ্ঞানবার প্রশ্নে একটা ঝাঁকুনি দিতে পারবে। সেই ঝাঁকুনিটি কারো কাছে সবল হতে পারে, আবার কারো কাছে দুর্বলও হতে পারে। মনের গভীরতার পার্থক্যে এমনটি হয়। গভীরতার পার্থক্যের পাশেই আবার সেই পুরনো তকদিরটি থাকবেই থাকবে।

বই-পড়া জ্ঞান বনাম আধ্যাত্মিক জ্ঞান

আমরা মূল বিষয়টি হতে ছিটকে অন্যত্র চলে এসেছি। এ রকম ছিটকে আসাটা প্রথমে টের পাই না। আর যখন টের পাই তখন করার কিছুই থাকে না। মূল বিষয়টি হলো, আহাদ আল্লাহর পরিচয়ের বিশদ ব্যাখ্যাটি কী এবং আহাদ আল্লাহর পরিচয়টি কেমন করে জানতে পারবো? ইসলামের চরম পর্যায়ে অনুমানের স্থান নাই। তাই আল্লাহ যে আহাদও সেটা বলতে শেখো তথা এককথায় দেখে নাও। পূর্ব-পশ্চিমের যেকোনো তাকাও দেখতে পারে আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই এবং এই যে আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই এটা কেমন করে দেখতে পারবে? সূক্ষ্ম জীবাপু দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। কারণ খালি চোখে দেখা যায় না।

মুখে বললেই আহাদ আল্লাহর পরিচয় জানা যায় না, খালি চোখে সূক্ষ্ম জীবাণু দেখো বললে যেমন দেখা যায় না, বরং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই কোরান বলেছে ফাত্তাখেজু ওয়াকিলা তথা ‘শক্ত করে উকিল ধরো।’ উকিল যেমন হাকিমের কাছে যাবার সহায়তা করেন, সে রকম যিনি আহাদ আল্লাহর পরিচয় জানতে পেরেছেন, সেই রকম একজন উকিল ধরে পরিচয়টি জানবার আশ্বান করছেন। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। কেউ ইচ্ছা করেই বুঝতে চায় না। তিনটি ধাপেই তকদির জড়িত। হস্তক্ষেপে ঝাঁকুনি খাবে চৈতন্য, কিছু লাভ হবে না। কারণ তকদির অনড়। বিষ্ঠ-বৈভব আর উন্নত (?) শিক্ষা লাভ করলে তো অনেক ক্ষেত্রে তকদিরটি আরও শক্ত পাথর হয়ে যায়। কারণ এগুলো আরও স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে দেয় এবং গ্রহণ করা তো দূরে থাক, বরং কত রকম যে টিটকারির যুক্তি আর বৈজ্ঞানিক (?) প্রমাণ চোখের সামনে তুলে ধরবে তা বলাই বাহুল্য। আহাদ আল্লাহর পরিচয় জানার জন্য সেই রকম উকিলটি পাবো কোথায়? এই উকিল খোঁজার জন্য প্রয়োজনে বহু দুর্গম পথ পেরিয়ে অগ্নিসর হবার আশ্বান জানানো হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর দাস তারা পাবেই, তাদেরকে খান্নাসরূপী শয়তান কোরান-এ বর্ণিত উনিশ প্রকার ধোঁকা দেবার অস্ত্র ব্যবহার করলেও শয়তানের অনুসারী বা বন্ধু বানানো যাবে না। কারণ জন্মের আগেই আল্লাহর দাস হবার তকদির নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এই রকম আল্লাহর দাসেরাই আল্লাহর আহাদরূপের পরিচয় কেমন করে হবে বুঝিয়ে দেবেন এবং তার ফর্দুলাগুলো শিখিয়ে দেবেন। কেমন করে নির্জনে মোরাকাবা করতে হবে তা জানিয়ে দেবেন। এই আল্লাহর দাসেরা বইখাতার স্কুলে পাঠাবেন না। কারণ এটা বইখাতার বিদ্যা বা জ্ঞান নয়। কারণ এই রকম স্কুলে জ্ঞান অর্জন করতে হলে চোখ

দুইটি খুলে বই পড়ে অর্জন করতে হয়। এলম্বে লাদুনি পড়ে অর্জন করার বিষয় নয়। এই জ্ঞান অর্জন করতে হলে দুইটি চোখ বন্ধ করে অর্জন করতে হয়। সুতরাং জ্ঞান অর্জন করার পথ ও মত সম্পূর্ণ আলাদা। তাই যারা চোখ-খোলা জ্ঞান অর্জন করেন, তারা যে কত রকম ভাষায় কত রকম অহঙ্কারের ঢং দেখিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকেন তার হিসাব ফকিরেরা রাখা তো দূরে থাক, আমলেও আনেন না। বরং ফকিরেরা চোখ-খোলা জ্ঞানীদের এতই সমীহ করেন যে, যেন তারা আরও বেশি ভুল বোঝে। কারণ ফকিরেরা ভালো করেই জানেন যে, সব কিছু কোরবানি করার পরই এই গুপ্তজ্ঞান তথা হেকমতের জ্ঞান তথা এলম্বে লাদুনির জ্ঞান অর্জন করা যায়। বৈষয়িক জ্ঞান হারাতে শেখায় না, বরং কেমন করে বেশি বেশি পাওয়া যেতে পারে সেই বিষয়টাই ভালো করে বোঝায়। অবশ্য বৈষয়িক জ্ঞানটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এই বৈষয়িক জ্ঞানে যে জাতি বেশি জ্ঞানী তারাই মোড়লগিরি করবে। জোর করে নয়, বরং জ্ঞানের বিশালতার জন্য মোড়লগিরি করবে। সুতরাং বৈষয়িক জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোরান বহবার বহু রকম ভাষায় আশ্বাস জানিয়েছে। আত্মপরিচয় জানবার জ্ঞানটি যেহেতু গোপন তথা গুপ্ত এলম্বে তাই নির্জনে চোখ বুজে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় অর্জন করতে হয়। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ আছে কি না অধম লিখকের জানা নাই। একেক ফকিরের ধ্যানসাধনার পথ একেক রকম হতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল বিষয়টি এক এবং অভিন্ন। সুতরাং এই সাধকদের কোনো জ্ঞাত থাকতেই পারে না। যদি জ্ঞাত থাকে বলতে চান, তা হলে তিনি ফকির হতে পারেন না। অথচ কখনওবা সমাজের প্রবল চাপে জ্ঞাত নামক সাইনবোর্ডটিকে বুলাতে

বাধ্য হন।

মনে করি যেমন আহাদ আল্লাহর বিষয়টি না তুলে ওয়াহেদ আল্লাহর কথাটি বলতে গেলেই যুক্তি আর তর্কের সামনে অনেক আন্তিক দার্শনিকেরা টিকতে পারেন না। পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিকেরা পর্যন্ত অনেক সময় নাস্তিকদের যুক্তির মাঝে টিকতে পারেন না। অথচ আহাদ আল্লাহর বিষয়টি তুলে ধরলে নাস্তিক দার্শনিকদের গুরুত্বাকুর চার্বাক পর্যন্ত বোকা বনে শিয়ালের মতো গর্ভে পালাতে বাধ্য। পৃথিবীতে এমন কোনো নাস্তিক জন্মগ্রহণ করে নি, যে আহাদ আল্লাহর বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরার পর আর একটি কথা বলতে পারবেন। কারণ আহাদ আল্লাহ বলতে বুঝায় যে কোনো অস্তিত্বই নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। ‘পূর্ব এবং পশ্চিমের যেকোনো তাকাও না কেন আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই।’ কোরান-এর এই বাণীটি বুঝাতে চেয়েছে যে, আল্লাহর সীফাত তথা গুণাবলি যদিও জ্ঞাত তথা মূল বিষয়টি নয়, তবে জ্ঞাত তথা মূল বিষয়টি না থাকলে সীফাত তথা গুণাবলি চিত্তাই করা যায় না। কিন্তু পরক্ৰমে ‘আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি’ বলার মাঝে সীফাতটি তথা গুণটি মোটেই বোঝানো হয় নি। ‘আমরা তোমার নিকটেই আছি’ বলার মাঝে রুহ তথা পরমাত্মার কথাটি বোঝানো হয়েছে। তবে এতই ক্ষুদ্র আকারে আছেন যে, ধরা পড়ার কথা নয়। আর ধরা পড়লে আল্লাহর বাহাদুরিটা থাকে কোথায়? এ জন্যই আল্লাহকে হেকমতদাতাও বলা হয়। মানবদেহের মাঝে রুহ তথা পরমাত্মা আছে বলেই মোরাকাবার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলার বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এ জন্যই মহানবি তাঁর উম্মতদের শিক্ষা দেবার জন্য জাবালুন নুর পর্বতে অবস্থিত হেরাগুহায় পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করেছেন। ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি বাদ দিলে ধর্মের একবস্তা ভালো ভালো কথা শেখা

যায় এবং সমাজে বিরাট (?) ইসলাম-গবেষক হওয়া যায়, কিন্তু আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না। ভালো ভালো কথা শিখে মানুষকে বোকা বানানো যায়, সাময়িকভাবে জিতে যাবার সাময়িক আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু আখেরাতটি যে ঝরঝরা, আখেরাতটি যে অন্ধকারে ডুবে থাকে সেটা মরার আগে বুঝবার কোনো উপায় থাকে না। সূরা কাহাফটি বার বার পড়ে দেখুন! দেখতে পাবেন কথাগুলো কত নির্মম সত্য। বু আলি শাহ কলন্ডরের দেওয়া মোরাকাবাটি তিনবার তিনস্থানে করে দেখুন, দেখতে পাবেন সত্যের সামান্য নিদর্শন এবং তা অবশ্যই দেখতে পাবেন বলে তিনি বোবা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। বু আলি শাহ কলন্ডরের মোরাকাবাটি বিস্তারিতভাবে সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে।

গবেষণার তাগিদ

মাওলা আলি (আ.) এক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, শত্রু মাওলা আলির উপর খুতু নিক্ষেপ করাতে হত্যা করলেন না। শত্রু অবাক হয়ে প্রশ্ন করাতে মাওলা আলি (আ.) বললেন, ‘তোমার খুতু নিক্ষেপ করাতে আমার ভীষণ রাগ হয়েছে তাই ছেড়ে দিলাম। কারণ এখন হত্যা করলে আমার রাগ চরিতার্থ করা হবে। হত্যাটি ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ তথা আল্লাহর পথে করা হবে না।’ আসলে এটাই ইসলামের মূল আদর্শ। এই আদর্শ এখন কতটুকু বিরাজ করছে তা পাঠকেরাই বিচার করবেন। এরকম আদর্শ বিরাজ করতো বলেই মহানবির সাহাবারা শক্তিশালী রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করতে পেরেছিল। আল্লাহর পথে জেহাদি জোশ নিয়ে আবার যেদিন মুসলমানরা অগ্রসর হতে পারবে, সেদিন কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে

না। এটা অধম লিখকের কথা নয়, বরং কোরান-এর কথা। কিন্তু এই জেহাদটিকেও একপেশে করে ফেলেছে। অস্ত্রের জেহাদের সঙ্গে নফসের সঙ্গে যে খান্নাস আছে সেই খান্নাসটিকে তাড়াবার জেহাদটিকে ইচ্ছা করে বাদ দেওয়া হয়। নফসের ভেতরের খান্নাসটিকে তাড়াবার জন্যই যত মোরাকাবার ধ্যানসাধনার বিভিন্ন রকম নিয়ম কানুন দেওয়া হয়েছে। তাই খলিফা ওমর ফারুক (রা.) জালুলার যুদ্ধে পাওয়া ধনসম্পদ দেখে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন। প্রশ্ন করাতে হজরত খলিফা ওমর ফারুক (রা.) বললেন, ‘এই ধনসম্পদের মাঝে আমি দেখতে পাচ্ছি অনাগত কালের মুসলমানদের পতন আর নির্মম অপমান।’ তবে এ কথাটি অপ্রিয় সত্য যে, ভেতরটিকে বাদ দিয়ে বাহিরকে দাঁড় করাতে চাইলে নির্মম সত্যটিকে জেনে শুনে অস্বীকার করা হয় এবং প্রতিটি বিষয়ে এই বিজ্ঞানের যুগে গবেষণা করা প্রয়োজন। তবে প্রতিটি বিষয়ের মূলসূত্র ভালো করে জেনে নিতে হয়। মূলসূত্রগুলো জানা না থাকলে লিখনির মাঝে ভুল থেকে যায়। যেমন নফস এবং রুহের পার্থক্য। নফস বলতে কী বুঝায় আর রুহ বলতেই বা কী বুঝায়? নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু রুহ তা করে না। তাই নফস জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সুতরাং সুখ-দুঃখ নফসকেই ভোগ করতে হয়। তাই নফসের মৃত্যু হলে নফসের মাগফেরাত চাইতে হয়। রুহের মাগফেরাত চাইবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ রুহ জন্ম-মৃত্যুর অধীন নয়। আবার নবি এবং রসুলের পার্থক্যটি জানা না থাকলে প্রতি পদে ভুল হতে বাধ্য। অনেকে তো রসুলকেই নবির চেয়ে বড় বানিয়ে ছেড়েছেন। যেমন অনেকেই নফসের মাগফেরাত না চেয়ে রুহের মাগফেরাত চেয়ে বসেন। বাজারে একবার উঁহা ভুল দর্শনটি প্রচার হয়ে গেলে উঁহা চিৎকার করে প্রতিবাদ করেও শুদ্ধ করা যায় না। সত্যকথাটি তুলে ধরলে বাঁকা চাহনিতে কিছু একটা

বলতে চায়। আবার শরিয়তি শয়তান আর মারফতি শয়তানের ব্যাখ্যা দিলে চমকে ওঠেন। তবে হালে প্রায় ক্রেত্রেই বিষয়টি মেনে নেবার প্রবণতাটি লক্ষ্য করা যায়। আবার জেহাদের কথাটি আসলে দুই প্রকার জেহাদের কথা বলতে হয় : একটি তরবারির জেহাদ এবং অপরটি নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। দুইটিরই প্রয়োজন অত্যধিক। একটি মাতৃভূমি রক্ষার জেহাদ, অপরটি নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। একটি ছোট, অপরটি বড়। তবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে মহানবি বলেছেন, ‘তোমরা ছোট জেহাদ হতে এবার বড় জেহাদের দিকে অগ্রসর হও।’

রুহকে বাংলা ভাষায় পরমাত্মা বলতে বাধ্য হলো। কারণ নফস আত্মা নহে। তবু বাংলা ভাষায় জীবাত্মা বলতে বাধ্য হলো। তবে কোরান-এর বর্ণিত নফস এবং রুহ শব্দ দুটি দিয়েই ভাবপ্রকাশ করা শ্রেয়। কারণ নফস সৃষ্ট জীবের মধ্যে থাকে, কিন্তু রুহ কেবলমাত্র জিন এবং মানুষের মধ্যেই থাকে। আর কোথাও নয়। অবশ্য আমাদের জানা মতে। কারণ অন্য কোনো গ্রহে জীব আছে কি না অথবা থাকলে তাদেরকে রুহ দেওয়া হয়েছে কি না জানা নাই। ভবিষ্যৎ কী বলে তা জানি না। কোনো কোনো গবেষক এটাও বলে থাকেন যে, আল্লাহ কি কেবলমাত্র এই বিশাল সৃষ্টির মাঝে বিন্দু নামক পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছেন? একমাত্র ছয়শত কোটি (?) মানুষের জন্যই কি এত বড় ও বিশাল সৃষ্টির আয়োজন? বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, হয়তো আরও অন্যধরনের জীবন অনগ্রহে থাকাটা বিচিত্র নহে। মানুষ নিয়েই আমাদের কাজ কারবার তাই মানুষের ভেতরের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করে যাবো। মানুষের মধ্যে রুহ তথা পরমাত্মা আছে বলেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়। রুহ আল্লাহর হুকুম তথা আদেশ। ইহা কোরান-

এর কথা, কিছু নফস আল্লাহর হুকুম তথা আদেশ ॥ এই কথাটি সমগ্র কোরান-এ একটিবারও বলা হয় নি। আল্লাহ স্রষ্টা, সুতরাং রুহও স্রষ্টা। নফস নয়। রুহ অতি ছোটরূপে মানুষের মাঝে বিরাজ করে। অণু-পরমাণুর চেয়েও ছোটরূপে বিরাজ করছে বটে, তবে রুহকে জাগিয়ে তোলার আদেশটিই একমাত্র মুখ্য আদেশ আর বাকি সব আদেশ গৌন। মুখ্য নয়। কেমন করে রুহকে জাগিয়ে তুলতে হবে তার অনেক রকম নিয়ম-কানুন আছে। গবেষণা করে দেখতে পাই যে, এই নিয়ম-কানুনগুলো অনেক রকম এবং কিছু কিছু নিয়ম-কানুন দীর্ঘদিনের। আবার কিছু কিছু মধ্যম এবং খুব কম নিয়মই আছে যাহা কম সময়ের জন্য। এই নিয়ম-কানুনগুলোকে মোরাকাবা-মোশাহেদা, ধ্যানসম্মাধির সাধনা, নির্বানপ্রাপ্তির সাধনা, স্থিতিতে অবস্থান করার সাধনা ॥ এভাবে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। আসলে মূল বিষয়টি হলো রুহকে জাগিয়ে তোলা। রুহকে কেমন করে, কী উপায়ে জাগিয়ে তুলবো? এই বিরাট এবং একমাত্র প্রশ্নটির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মতভেদ আছে। তবে রুহের বর্ণনা যে কোরান সতেরবার দিয়েছে সেখানে খান্নাস নামক শয়তানটিকে একমাত্র শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই দেখতে পাই যে, শয়তান, ইবলিস, মরদুদ এবং খান্নাসের কর্মগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এবং বার বার সাবধান করে দেওয়া। খান্নাস নামক শয়তান ‘আম্মি’টাকে কুয়াশার মতো ঢেকে রাখে। এই শয়তান নামক কুয়াশাটি তাড়িয়ে দিতে বার বার বলা হয়েছে। অনেকে ভুল বুঝে শয়তানটি তাড়াবার কথা শুনে ‘আম্মি’-কে দোষারোপ করে। ছি! ছি! এটা বড়ই অন্যায় কথা। হজরত আম্মির খসরু বার বার তাঁর আপন পীরকে বলছেন পীরের রঙে তাঁকে রাঙিয়ে দিতে। ‘আম্মি’-কে নাই করে দিতে বলেন নি। এই ‘আম্মি’-র বিষয়টি সবচেয়ে সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন সুফি

কবি হজরত আল্লাম্বা ইকবাল। তাই ইকবাল বার বার বলছেন যে, পীরের উপর প্রচণ্ড মহত্ত্ব রেখে নিজের 'আম্বি'-র মোকামটিকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হবে। সুফি কবি ইকবাল জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রশ্নে মোরাকাবার ধ্যানসাধনার গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। কেউ বোঝে কেউ বোঝে না। ওহাবি মতবাদ এসব বিষয়ে বিরাট বাধা তৈরি করে। কারণ ওহাবিদের কথাগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগে। কারণ শয়তান যেমন আদমকে অস্বীকার করে আল্লাহর এবাদত করার উপর নির্ভর করেছে সে রকম ওহাবিরাও সেটাই অনুসরণ করেছে। তাদের মূল বইগুলো পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায়। সুতরাং সুফিবাদের পথে এগিয়ে যেতে চাইলে প্রতি পদে পদে বাধা আসে। কোথাও মোটা বাধা আবার কোথাও চিকন বাধা আবার কোথাও ভাইরাসজনিত বাধা যাহা চোখে ধরাই পড়ে না। মোটা বাধাগুলোর মধ্যে দুইটি বাধাই প্রধান : প্রথমটি ওহাবি এবং দ্বিতীয়টি শিয়া। গবেষণার মাপকাঠিতে দু'টোই একদম বাতিল ফেরকা। আর মোতাজ্জিলা ও কাদিয়ানিরা বাতিল ফেরকার চেয়েও জঘন্য। এরা মুসলমান নামের কলঙ্ক।

খেলাফত বিষয়ে ভুলের অবসান হোক

সুন্নিদের মধ্যেও অনেক ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সুন্নিরা অবশ্য পীর-ফকির মানে তবে কিছু সুন্নি সুফিবাদের সার্বজনীন দর্শনের মাঠে শাস্ত্রকথার পায়খানা-পেশাব এত বেশি করে ফেলেছে যে, এগুলো তেলে আসল লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ সুন্নি বকরির তিন নব্বর বাচ্চার মতো পীরের বাড়ি বা আস্তানায় গিয়ে দু-তিনদিন লাফালাফি করে বড় বড় কথার বুলি শিখে মনে করে যে, আম্বি কী হনু রে! আসল শিক্ষাটি যে মোরাকাবার মাধ্যমে শিখতে হয়, জানতে হয়, তা আজকালকার পীর সাহেবেরা অজ্ঞাত কারণে একেবারেই শিক্ষা দেন না। বড় বড়

ওলিদের রচিত ফারসি ভাষার অমূল্য বইগুলো আজও কেউ অনুবাদ করলেন না। তবে হালে এক মহান আশেক খাজাবাবার বইগুলো ফারসি ভাষা থেকে চমৎকার অনুবাদ করেছেন, মূলটি সঙ্গে রেখে বাংলা উচ্চারণসহ। বইটির নাম দিয়েছেন দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন। সেই মহান অনুবাদকের নাম জেহাদুল ইসলাম। উনি ১১ম্বে ২০০৪ সালে পর্দা নিয়েছেন। উনার প্রথম অনুবাদ নাহজুল বালাঘা-র অনুবাদটি চমৎকার হয়েছে। কিছু বইটি হয়তো মাওলা আলির লিখা নয়, কোনো ঝানু এবং ঘাণ্ড আমির আলির মতো শিয়া পণ্ডিতের রচিত। একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়ে যায়। সব গোমর ফাঁক হয়ে যায়। কারণ এত বড় বইটির একটি পৃষ্ঠাও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর আলোচিত হয় নি। যদিও মাওলা আলিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একমাত্র দরজা বলা হয়। শিয়ারা অধ্যাত্মবাদ তো মানেই না, বরং সুযোগ পেলে বড় বড় ওলিদেরকে ম্যাজিশিয়ান বলে গালি দিয়ে ফেলে। ওহাবি এবং শিয়ারা টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। শিয়ারা মাওলা আলিকে প্রথম খলিফা না বানিয়ে হজরত আবু বকরকে কেন বসানো হলো এটা নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ করেন। যেহেতু শিয়ারা অধ্যাত্মবাদ মানে না সেহেতু মাওলা আলিকে আধ্যাত্মিক খলিফা মেনে নিতে পারে না। অথচ মাওলা আলি মহানবির প্রথম খলিফা এবং মাঝখানের খলিফা এবং শেষের খলিফা এবং সদাসর্বদা খলিফা। অধ্যাত্মরাজ্যে ঢুকতে হলে মাওলা আলির দরজা দিয়েই ঢুকতে হবে। কারণ জ্ঞান নামক মহানবির শহরে মহানবি দুইটি বা তিনটি দরজার কথা বলেন নি। বলেছেন, জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার একটাই দরজা, আর সেই দরজার নামটি হলো মাওলা আলি (আ.)। সুতরাং মাওলা আলি (আ.), পাক পাকাতন এবং আওলাদে রসুলের অনুমতি ছাড়া অধ্যাত্মরাজ্যে ঢোকা যায় না। ঢুকবার প্রশ্নটি উঠতে পারে

না। মনগড়া কথা বলে বলে মনে সাময়িক আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যসাগরে অবগাহন করা যায় না। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির রওজা মোবারকের সদর দরজায় লিখা আছে ‘রাজা হোসায়েন এবং রাজার রাজা হোসায়েন’ এবং আরও কিছু কথা। প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইমাম হোসায়েন কেমন করে রাজা হলেন? আর রাজার রাজাই বা কেমন করে হলেন? ইমাম হোসায়েন তো কারবালায় সপরিবারে শহিদ হয়েছেন, একমাত্র ইমাম জয়নুল আবেদিন ছাড়া। ইতিহাস বলছে, রাজা হয়েছিল এজিদ, খলিফা নামধারণ করেছিল এজিদ, মোমিনদের মোমিন (আমিরুল মুমিনিন) নামধারণ করেছিল এজিদ, রাজসিংহাসনে বসেছিল এজিদ ॥ অথচ খাজাবাবা বলছেন, ইমাম হোসায়েন রাজা, ইমাম হোসায়েন রাজার রাজা। বস্তুবাদী চিন্তার দর্শনে যারা বিশ্বাসী তারা কি খাজাবাবার এই কথাগুলো মেনে নিতে চাইবে? খাজাবাবা কি এই সামান্য ইতিহাসটুকু জানতেন না যে, এজিদ রাজার সিংহাসনে বসেছিল? তা হলে খাজাবাবা এখানে রাজা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন? ইমাম হোসায়েন আসলেই রাজা। দুনিয়ার রাজ্যের রাজা নন, বরং আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাজা। মনের রাজা। হৃদয়ের রাজা। এই রাজত্ব চিরস্থায়ী আর দুনিয়ার রাজত্ব অস্থায়ী। তাই এজিদকে মুসলিম সমাজ ভুলে গেছে। এজিদকে গালির প্রতীকরূপে ব্যবহার করে। এজিদকে মুসলিম সমাজ রিজেক্ট করে দিয়েছে। আর ইমাম হোসায়েনকে নামের আগেপিছে ব্যবহার করে চির-অমর করে রাখা হয়েছে। তাই খাজাবাবা ইমাম হোসায়েনকে রাজা বলেছেন এবং রাজার রাজা বলেছেন। হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ঠিকই মাওলা আলিকে গাদিরে খুন্নে খলিফারূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন, কিন্তু এই খলিফা দুনিয়ার খলিফা নন, বরং হৃদয়ের খলিফা, অধ্যাত্মরাজ্যের খলিফা। খাজাবাবার ভক্তরা বলেছিলেন, বাবা! আপনি আনা

সাগরের পানি একটি লোটারে এনেছিলেন এবং আপনি প্রায়ই বলেন যে, ইমাম হোসায়েনের যিনি গোলাম সেই গোলামের গোলাম আমি। তা হলে ইমাম হোসায়েন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন কেন পানির পিপাসায় কাতর হয়েছিলেন? খাজাবাবা বলেছিলেন, বাবারা, সংযত হও। তবে শোনো। আমি খাজাবাবা যদি সেই কারবালার মার্চে বাঁ হাতের ছোট আঙুল দিয়ে বালিতে খোঁচা দিই তো পানির নহর বয়ে যাবে। যদি ইমাম হোসায়েন ফোরাত নদীকে বলতেন যে, তুই পানি দিয়ে যা, তো সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করা হতো। কিন্তু এখানে মূল বিষয়টি হলো ॥ নানুর (মহানবির) উম্মতদের মধ্যে কারা আসল আর কারা নকল তা ভাগ করে দিয়ে গেলেন।

এজিদের তাঁবুতেও আজান, ইমাম হোসায়েনের তাঁবুতেও আজান, এজিদের তাঁবুতেও নামাজ, আবার ইমামের তাঁবুতেও নামাজ। কার নামাজ সঠিক আর কারটা ভেজাল? তাই নামাজ মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে, নামাজ মোমিনের জন্য মেরাজ, আবার এই নামাজই ওয়াইল নামক নরকে ফেলে দেবে। এ যেন ডাক্তার-সার্জনের চাকু আর কসাইর চাকু। দুটোই কাটে। দুটোই লোহ জাতীয় ধাতুতে তৈরি। কিন্তু একজন কাটে মানুষ বাঁচাবার আশায়, আরেকজন কাটে গোশত বিক্রি করবার জন্য।

এজিদ দুনিয়ার রাজ্য। এজিদ মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা। এজিদ স্বঘোষিত সকল মোমিনদের আমি। হাজার হাজার মুফতি-মোল্লারা এজিদের এই ঘোষণা মাথা নত করে মেনে নিয়েছে। সেই যুগে, সেই পরিবেশে, জানি না ধনসম্পদের লোভে নাকি জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে, এজিদকে এহেন আলেমরা সমর্থন দিয়েছিল। জানি না, দামেস্কের রাজদরবারে হাজার হাজার মুসলমানদের সামনে এজিদের বিক্রি-

হয়ে-যাওয়া তিনশ ঝানু-ঘাণ্ড মহাপণ্ডিত (?) মুফতিরা যে ইমাম হোসায়েনকে দেশদ্রোহী এবং তাঁকে কতল করা জায়েজের ফতোয়াটি শুনিয়েছিল তাঁর কতটুকু প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিছু ইতিহাসের নির্মম লিখনী হতে আমরা জানতে পারি, আমরা মহানবির হাদিস হতে জানতে পারি যে, এই রকম আলেম নামের কলঙ্করা দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট জীব হবে এবং জীবজন্তুরাও এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এই জাতীয় অপদার্থ আলেমসমাজ এবং হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার পণ্ডিতেরা ‘ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়’ গুনলে দাঁত বের করে হেসে হেসে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাবে। পরক্ৰমে ‘ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায়’ গুনলে চোখ-মুখ ফ্যাকাসে রঙ ধারণ করবে। তাই বার বার বলতে চাই, চীৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই এই বলে যে, ব্যক্তির সবচাইতে বড় ত্যাগে এই দুনিয়া উপহার দেয় সবচাইতে বড় শাস্তি। এই কথা কয়টি যে কতখানি নির্মম সত্য তা যারা সত্যের আদর্শে বাস করতে চায় তারা মর্মে মর্মে বুঝতে পারে। তাই খাজাবাবা এজিৎকে রাজা না বলে, জলজ্যাস্ত ইতিহাসের দিকে না তাকিয়ে ‘হোসায়েন রাজা, হোসায়েন রাজার রাজা’ বলে ঘোষণা করলেন। তবে কি খাজা বাবাই সঠিক বলেছেন? উনি কি দুনিয়ার রাজত্বের কানাকড়িও মূল্য দিলেন না? খাজাবাবা তাঁর দিওয়ান-এ লিখে গেছেন যে, তুমি দুনিয়াও চাইবে আবার আল্লাহও চাইবে এটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী তারা খাজাবাবার এই কথাগুলো মাথা নত করে মেনে নেবে, তা শয়তানের খান্নাসরূপ ধারণ করে অবস্থান করার পরও। যারা যুক্তিবাদী কিছু ওলি-আউলিয়াদের উপর বিশ্বাস রাখেন, তারাও মেনে নেবেন ॥ ইতিহাসের মাপকাঠিতে যুক্তির খাতিরে মিল না পেলেও। কিছু যারা সুফিবাদে মোটেই বিশ্বাস

করে না সেই শিয়ারা কেমন করে মেনে নিতে পারে? যে শিয়ারা বড়পীর সাহেবকে বড় ম্যাজিসিয়ান বলে কথায় কথায় গাল দেয়, তারা কেমন করে মেনে নিতে পারে? হজরত আবু বকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) গাদিরে খুন্নে মহানবির সামনে আলি (আ.)-কে মাওলারূপে মেনে নিলেন। সুতরাং তাঁদের উভয়কে দুনিয়ার খলিফা বলে চিন্তা করাটা একান্ত মান্বুলি ব্যাপার। আর মাওলা আলি (আ.) অধ্যাত্মবাদের খলিফা। শিয়ারা অধ্যাত্মবাদই মানে না। যে শিয়ারা অধ্যাত্মবাদই মানে না তাদের সামনে মাওলা আলিকে প্রথম খলিফা, শেষ খলিফা এবং মাঝখানের খলিফা এবং কালকেয়ামত পর্যন্ত মাওলা আলি (আ.)-র খলিফা হবার কথাটি কেমন করে বোঝানো যাবে? মেনে নেবার গোড়াটাই তো কাটা, তা হলে মেনে নেয় কী করে? শিয়াদের লিখনীতে, ভাষণেতে, অনুষ্ঠান পালনে কোনো অভাব দেখা যায় না। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ তথা ইসলামের মূল বিষয়টিই মানে না। তা হলে তাদেরকে বাতিল ফেরকা বললে কি অন্যায় কিছু বলা হলো? যে শিয়াদের ছলচাতুরী মোতাসিম বিল্লাহ বুঝতে পারেন নি এবং এই শিয়াদের কুটকৌশলেই হালাকু খাঁর নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং এই নির্মম হত্যাযজ্ঞে বহু শিয়া প্রাণ হারাবার পর বুঝতে পারলো এবং এই হালাকু খাঁ-ই নুর মুহাম্মদ দারবন্দির কাছে মুসলমান এবং মুরিদ হয়ে গেলেন ॥ এটা অধম লিখকের কথা নয়, বরং ইতিহাসের কথা। নুর মুহাম্মদ দারবন্দি একজন অতি উচুস্তরের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। নুর মুহাম্মদ দারবন্দি একজন সুফিবাদের একনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন ॥ এটাও ইতিহাসেরই কথা। আজ যদি শিয়ারা অধ্যাত্মবাদ মেনে নিত তা হলে ইরান-ইরাকের সংরক্ষিত লাইব্রেরিতে বহু ওলি-আল্লাহদের মহামূল্যবান রচনাসমূহ অবশ্যই পেতাম। ওহাবিদের প্রচণ্ড চাপে বাটালভি আর বাহায়ি নামক নূতন নূতন ফেরকাবাজির

চাপে মহামূল্যবান রচনাসমূহ হারিয়ে যেত না। ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত তাজকেরাতুল আউলিয়া নামক বইটিতে বহু ঔলিদের রচিত মহামূল্যবান রচনাসমূহের নামগুলো পর্যন্ত জানতে পারি এবং হস্তলিখিত বইগুলো অনেকের কাছেই ছিল বলে জানতে পারি, কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না।

কারবালার যুদ্ধ এবং সাহাবা প্রসঙ্গ

ইমাম হোসায়েন যখন জুলজিনাহ (দুলদুল) নামক ঘোড়ার পিঠে বসে এজিদের সৈন্যবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তোমাদের মাঝে কি একজন মুসলমানও নাই? আমাকে সাহায্য করার কি কেউ নাই?’ প্রথম কথাটিতে এজিদের সৈন্যবাহিনীতে মহানবির যে সকল সাহাবা ছিল তারা আর সাহাবা থাকা তো দূরের কথা, বরং মুসলমানই আর রইল না। দ্বিতীয় কথায় সাহায্য চাইবার পর এজিদবাহিনী হতে মাত্র তেরিশজন ইমাম হোসায়েনের দলে এসেছিলেন : হর এবং হরের পুত্র এবং একত্রিশজন সৈন্য ॥ যারা পরে এজিদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জেহাদ করে শহিদ হন।

অনেক হাদিসবেস্তা ইমাম হোসায়েনের এই ভাষণের ভিত্তিটিকে মেনে নেয় নি। তাদের মতে তারা তো অবশ্যই মুসলমান এবং মহানবির সাহাবাও বটে ॥ সুতরাং তাদের বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য। আমি ঐ সব হাদিসবেস্তাদের নামগুলো উল্লেখ করতে চাই না। কারণ তাতে মুসলিমবিশ্বে কয়েকজন বিখ্যাত হাদিসবেস্তার উপর ভক্তি ও বিশ্বাস হালকা হবার সম্ভাবনা থাকতেও পারে। বিখ্যাত হাদিসবেস্তারা এজিদ-বাহিনীতে-যোগ-দেওয়া সাহাবাগণ আওলাদে রসুলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরও বহাল তবীয়তে সাহাবাই থেকে গেলেন এবং এই জাতীয় সাহাবাদের (?) থেকে অনেক হাদিস সহি তথা নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণও করে নিয়েছেন।

ব্যভিচারের দোষে দোষী কিছু সাহাবাকে যে পাথর মেরে (রজম করে) মারা হয়েছে এবং পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল এবং অবশেষে উটের চোয়ালের হাড় অথবা পায়ের হাড় দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে মেরে ফেলে ॥ মহানবির কাছে এই সংবাদ দেবার পর মহানবি বলেছিলেন যে, ‘পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, পালিয়ে যেত!’ মহানবির মহাদয়ার এটি কি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা যায় না?

ইমাম হোসায়েনের উপর রচিত অনেক বইতে আমরা দেখতে পাই যে, যখন ইমাম হোসায়েন সাহায্য চাইলেন, তখন মরুভূমির বালির নিচে বাস করা কোটি কোটি বিষাক্ত বিছা, কীটপতঙ্গ এবং ছোট ছোট সাপ ইমাম হোসায়েনের দিকে ছুটে চলছে সাহায্য করার তরে এবং এই দৃশ্য দেখে এজিদের সৈন্যবাহিনী ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু যখন ইমাম হোসায়েন ইহাদের সাহায্য নেবেন না বললেন এবং এরা সবাই আবার স্বস্থানে ফিরে যেতে লাগলো, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। মরুভূমির বালির নিচে যে কী ভয়ংকর বিষাক্ত বিছা, কীট-পতঙ্গ আর ছোট ছোট সাপ থাকতে পারে তা ডিসকভারি নামক চ্যানেলটি না দেখলে প্রত্যেক বিশ্বাস হওয়াটা সম্ভব ছিল না। ইমাম হোসায়েন যদি মরুভূমির বালির নিচে বাস করা কোটি কোটি বিষাক্ত কীট আর সাপের সাহায্য নিতেন, তা হলে এজিদের একটি সৈন্যও আস্ত থাকার কথা নয় : চাবানো ঘাসে পরিণত হয়ে যেত।

আব্রাহা নামক কাকের বাদশা এবং অজস্র সৈন্যবাহিনী ও হাতিবাহিনীর কী শোচনীয় এবং করুণ পরিণতি হয়েছিল অতি ক্ষুদ্র আবাবিল পাখির দ্বারা, তা আমরা কমবেশি সবাই জানি। মহানবির দাদু আবদুল মোস্তালিবের সাহায্য চাওয়াতে যদি এহেন অবস্থার দৃশ্যটি জানতে হয়, মানতে হয় এবং বিশ্বাস করতে

হয়, তো মহানবি যে ইমাম হোসায়েনকে বলতেন যে, হোসায়েন আম্মা হতে এবং আম্মি (মহানবি) হোসায়েন হতে এসেছি ॥ মহানবি কেমন করে ইমাম হোসায়েন হতে এলেন তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্তে সুন্দর ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন খাজা গরিব নেওয়াজ তাঁর রচিত দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন নামক ফারসি ভাষায় রচিত পবিত্র গ্রন্থে।

উম্মাইয়া ও আব্বাসীয় জামানায় ইমাম হোসায়েন আর আওলাদে রসুলদের প্রশংসার হাদিসগুলো সাহাবাদের মুখে মুখে ফিরতো বলেই আজও কিছুটা রয়ে গেছে। একদম হারিয়ে যায় নি। তবে এটাও সত্য যে, বেশিরভাগ আওলাদে রসুলদের হাদিসগুলো হারিয়ে গেছে। কারণ এই জাতীয় হাদিস বলতে গেলে ঘাড়ের উপর মাথাটি থাকার সম্ভাবনা খুব কমই ছিলো। মহানবির এই হাদিসটি অনেকেরই জানা থাকার কথা, আর সেই হাদিসটি হলো : আল্লাহর কিতাব এবং নবির বংশধরদের আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে পারলে বিপথে যাবার কোনো ভয় নাই। এই হাদিসটি কী করে উম্মাইয়ারা এবং তাদের অনুসারীরা এবং তাদের হালুয়া-রুটি খানেওয়ালারা মানতে পারে? তা হলে তো খনার বহল প্রচলিত বচন ভুতের মুখে রাম নাম বাস্তবেই দেখতে পেতাম। হায় রে আম্মাদের ভাগ্য! যদিকে তাকাই দেখতে পাই গোঁজামিল দেওয়া ঠাট-বাটের ইসলামের ইতিহাস। কেবলই আচার আর অনুষ্ঠানের ছড়াছড়িতে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের আসল বিষয়টি অনুষ্ঠানের বিরাট বোঝার নিচে চাপা পড়ে আছে। তুলতে গেলেও মহাবিপদ। শাস্ত্রবিদদের ফতোয়ার হাজার হাজার বিষাক্ত তীরের আঘাত খেয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

পবিত্র কোরান-এর একটি হুবহু বাংলা অনুবাদ পাওয়াটা কোহিনুর হীরা পাওয়ার চাইতেও কষ্টকর। তাই সব কিছু ফেলে রেখে আমরা মূল কোরান-এর

অনুবাদটি এখন ধরেছি। তাও আবার শব্দভিত্তিক অনুবাদ এবং বহু আরবি ডিকশনারি সামনে রেখে নিরপেক্ষ মন ও বিবেকের দংশন খেয়ে। আমরা হুবহু অনুবাদ করার পর যে যে স্থানে ব্যাখ্যা দিতে পারবো না, তা অকপটে বলে দেব যে, এই এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নাই। ভগ্নান্নি করার চেয়ে ভুল স্বীকার করে নেওয়াটাকে শ্রেয় মনে করি। খুব শীঘ্রই কোরান-এর অনুবাদটি বাজারে পাওয়া যাবে বলে আশা রাখি এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েই বাজারে ছাড়া হবে। যেখানে কোরান নিজেই বলছে যে, দুনিয়ার পানিগুলো যদি কালি হয় এবং গাছগুলো যদি কলম হয়, তবুও ইহার (কোরান-এর) ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। সাতবার দুনিয়ার পানি কালি আর সাতবার দুনিয়ার গাছগুলো কলম হলেও শেষ করা যাবে না ॥ এই কথাটির দলিল না হয় নাই তুললাম। কারণ এতে পাঠক বাবা-মায়েরা এবং অধম লিখক শরম পাবো। ‘তিতা সত্য কথায়, শোনা যায়, বাবাও বেজার হয়।’ তাই এই তিতা কথাগুলো যাতে কিছুটা প্রচার করতে পারি তারই জন্য সুফিবাদে বিশ্বাসী বাবাদের কাছে কোরবানির পশুর চামড়াটি চেয়েছিলাম। কারণ কোরবানির পশুর চামড়াটির টাকা কোরবানিকারীর জন্য নাজায়েজ হলে অধম লিখকের জন্য উহা ডবল নাজায়েজ। এই নাজায়েজের জন্য কালকেয়ামতে যেন অপরাধী হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে না হয়।

কোরানের মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যার স্বরূপ

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে, গরুর শিং না হয় মাছের পিঠে ভর-করে-থাকা পৃথিবীটার কোনো কোনো অংশে ভূমিকম্প হয় যখন শিং বা পিঠে একটু নড়ে যাবার লক্ষণ দেখা দেয়। মেঘমালাকে কান ধরে ফেরেশতারা যখন গুর্জা দিয়ে

আঘাত করে তখনই বৃষ্টিপাত হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, ঠাটা পড়ে ॥ ইত্যাদি লিখতেও শরম করে। শরম করে যখন দেখি, পুরাতন দিনে কোরান-তফসিরের বাংলা অনুবাদক এইসব আজগুবি বিষয়গুলো সযতনে ফেলে দিয়ে পাঠক বাবা-মায়াদের কাছে তুলে ধরতেন। সাবাস অনুবাদক, সাবাস!

পৃথিবীটা স্থির হয়ে আছে আর সব গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ॥ এর দলিল দেখে পাঠক অবাক হয়ে যাবেন। মহানবির নামে একবোঝা হাদিস দেখিয়ে দিয়ে সঠিক প্রমাণ করতে চাইবে। বলি, এইসব পুরাতন আমলের কোরান-তফসির কার করা? মহানবির নামে এত হাদিস কোথা হতে কেমন করে যোগাড় করলো? এই জাতীয় হাদিসগুলো যে সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মনগড়া তা গবেষণায় পরিষ্কার বোঝা যায়। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে এই বানানো হাদিসগুলোর কোনো মূল্যই নাই, বরং হাসির খোরাকে পরিণত করতে চাইছে এবং কোরান-এর ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে কোরান-এর পবিত্রতার প্রশ্নে সংশয় জাগিয়ে তোলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও এক পীর (?) সাহেব রচিত বইতে পেলাম, পৃথিবী স্থির এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সেই পীর (?) সাহেব বিজ্ঞানের গালে চড় মারতে আদেশ করে তাঁর কথাগুলো বিশ্বাস করতে বলেছেন। কারণ তিনি কোরান হতে বহু দলিল তুলে ধরেছেন। এই যদি কোরান-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার দশাটি হয়, তা হলে আর বলার কিছুই থাকে না। উম্মাইয়া আর আব্বাসীয়দের বেতনখোর আলেম-উলামারা যে কত হাদিস বানিয়েছে তার নমুনা সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর প্রথম খণ্ডে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা বাকারার চুয়ান্ন নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে অধ্যাত্মবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকারকারী ওহাবিদের গুরুঠাকুর শ্রদ্ধেয় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সার্টিফিকেট

পাওয়া বিখ্যাত (?) কোরান-তফসির তফসিরে ইবনে কাসির-এর লেখক ইবনে কাসির সাহেব যেসব হাদিস তুলে ধরেছেন এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দেখে হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাই না। দুইজন বিখ্যাত অধ্যাপক, একজন খাস ওহাবি অপরজন গোলাবি সুন্নি ইহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাদেশীদের তওফা (উপহার) দিয়ে গেছেন। আর এগিয়ে যেতে চাই না। কারণ এত হাদিস তিনি কোথা হতে সংগ্রহ করলেন তার জন্য প্রশংসা পাবার যোগ্য। কারণ আমাদের মতো অল্প বুদ্ধিমানদের অনেক কিছু জানবার এবং শেখবার আছে। ইবনে কাসির সাহেব একটি মূল্যবান হাদিস সংগ্রহ করেছেন যার সারসংক্ষেপটি হলো : ঘন ঘন সন্তান হয় এমন মেয়ে দেখে বিবাহ করো। এতে অনেক সন্তান হবে এবং এতে মহানবির উম্মতের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সংখ্যায় সবচাইতে উঁচুতে উঠে আসবে এবং আরও কত কথা যা আর না বলাই ভালো। অথচ সংখ্যাতত্ত্ব মুসলমান আজও কোথায় অবস্থান করছে (?) ইতিহাস থেকেই জেনে নিন।

দার্শনিকেরা এবং মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, একটি মানুষ সম্পূর্ণ খারাপ হতে পারে না। সামান্য কিছু-না-কিছু ভালো গুণও তার থাকতে পারে। গুলিরা বলেন, একটি মানুষের ভেতরটা ফেরেশতা এবং শয়তানের গুণ ও দোষ দিয়েই বানানো হয়েছে। কারো গুণটি বেশি দোষটা কম আবার কারো দোষটা বেশি গুণটা কম। অথচ আমাদের সঙ্গে মানুষের নফসটিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একটি মানুষ কিছুতেই ভাবতে পারে না অথবা ভাবতে চায় না যে, যে-দেহটির ভেতর তাকে রাখা হয়েছে উহা ফেলে একদিন তাকে চলে যেতে হবে। বেশি এবং কম দিনের আপেক্ষিকতায় ভাসমান এই মাটির দেহটি। এই দেহটি যে সে নয়, এটা ভাবতে

চায় না অথবা ভাবতেই পারে না। কী অপূর্ব বিজ্ঞানময় মহিমায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের তৈরি এই দেহখানি। জানি, আমরা সবাই কমবেশি বুঝি যে, এই মাটির দেহটিকে ফেলে একদিন এক অজানা পথে এবং দেশে পাড়ি জমাতো হবে। আমরা বুঝেও বুঝতে পারি না। আমরা জেনেও জানতে পারি না। আমরা দেখেও দেখতে পারি না। আমরা জানি হয়েও অজানীর মতো আচরণ করি। এই দেহটিকে ঢেকে রাখার তরে নূতন নূতন কাপড় পরি। তারপর পুরাতন হয়ে গেলে, পরার অযোগ্য হলে, ফেলে দেই। কত দামিদামি মজার খাদ্য খাই, পেট ভরে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে আরাম পাবার কথাটি জানাই, তারপর পায়খানা করে সেই খাদ্যের কিছু অংশ ফেলে দেই। সেই পায়খানা কোথায় ফেলে দিলাম এটা কেউ চিন্তাও করে না। এই দেহটি ফেলে দিয়ে নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মাটি বেরিয়ে যায়। তখনই সেই অবস্থাটিকে কোরান-এর ভাষায় ছোট কেয়ামত হয়ে গেল বোঝায়। জীবাত্মাটি ধ্বংস হয়ে যাবার কথাটি বলা হয় নি, বরং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে বলা হয়েছে। ছোট কেয়ামত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ওঠানো হয়। আর এগিয়ে গেলাম না। জানীজনদের বুঝবার জন্য এই কথাটুকুই যথেষ্ট মনে করি। পরম শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত গবেষক সৈয়দ মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী সাহেব কতগুলো মহামূল্যবান কথা বলে গেছেন যা নিরপেক্ষ মনে প্রশংসা করতেই হয়। সুফিবাদে বিশ্বাসী না হন, এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথার জন্য অবশ্যই প্রশংসা করবো। তাই তিনি তার কোরান-তফসিরের নামটি দিয়েছেন আম্মি কোরানটি যেভাবে বুঝেছি। অপূর্ব নাম। তিনি খালেস নিয়তেই কোরান তফসির করে গেছেন, তা কার সঙ্গে কতটুকু মিললো বা না মিললো সেটা বড় কথা নয়। অধম আম্মিও কোরান গবেষণা করে খালেস নিয়তে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা

লিখে গেলাম। কে গ্রহণ করলো আর কে বর্জন করলো সেটা দেখার বিষয় নয়। গবেষণার দরজা যে-জাতি বন্ধ করে দিতে চায়, সেই জাতি সভ্য জাতির হাসপাতালে স্যালাইন নিতে বাধ্য। পরিশেষে একটি ছোট্ট কথা বলি : সব কিছু বিক্রি করে দিলেও আমি অধম কিছু বলতে চাই না। কারণ সময় এবং পরিবেশ অনেকটা বাধ্য করে। কিন্তু যদি মানুষের শেষ সম্বল বিবেকটুকু কেউ বিক্রি করে দিতে চায় অথবা বিবেকটাকে যেদিন বিক্রি করে দিবেন সেদিন নিশীথ রাতে একাকী ডায়েরিতে লিখে রাখবেন যে, আজ আমি জানোয়ারে পরিণত হয়ে গেলাম। ইতি অমুক।

রুহ এবং নফস বিষয়ে ভুলের অবসান হোক

আহাদ এবং ওয়াহেদের উপর পরিষ্কার ধারণা না থাকলে অধ্যাত্মবাদের বিষয়টির প্রাথমিক সূত্র বা সংজ্ঞা জানাটা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সব কিছুকেই আত্মবিরোধী এবং উল্টাপাল্টা বলে মনে হবে। নফস এবং রুহের উপর পরিষ্কার ধারণা থাকতেই হবে, যদি আপনি মারফতের দেশে পা রাখতে চান। অন্যথায় সব কিছুতে ল্যাভড়া পাকিয়ে ফেলবেন। আপনাকে প্রথমেই জানতে হবে যে, নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না। নফস জান্নাতে যায়, কিন্তু রুহ জান্নাতে যায় না। নফসে মোতমায়েন্নাকে জান্নাতে যাবার আশ্বাস জানানো হয়, কিন্তু রুহকে জান্নাতে যাবার আশ্বাস সমগ্র কোরান-এর একটি স্থানেও পাবেন না। নফসকে ভাগ করা যায়। রেড ব্লাড সেলকে ভাগ করা যায়, কিন্তু হোয়াইট ব্লাড সেলকে ভাগ করা যায় না। আঙ্গুরা, লাউয়াম্মা, মোতমায়েন্না, মুলহেম্মার, ওয়াহেদাতান ॥ এই পাঁচটি ভাগে নফসকে ভাগ করতে দেখি। কিন্তু

রুহকে ভাগ করা যায় না। তাই কোরান-এর কোথাও রুহকে ভাগ করার একটি আয়াতও নাই। যদি কেহ রুহকে ভাগ করে দেখাতে চায় তাহা তার নিজস্ব বিষয়। কোরান-এর বিষয় নয়। নফস ঘুমায়, কিন্তু রুহ ঘুমায় না। নফস তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু রুহ তন্দ্রা কাকে বলে জানে না। নফস জন্ম দেয়, রুহ জন্ম দেয় না। নফস জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু রুহ জন্মগ্রহণ করে না। নফস সর্বপ্রকার ভোগবিলাসে মগ্ন থাকতে পারে, কিন্তু রুহ তা করে না। নফসের সৃজনীশক্তি নাই, কিন্তু রুহের আছে। নফস সর্বভূতে বর্তমান। নফসকে সবখানেই কমবেশি পাওয়া যায়, কিন্তু রুহকে মাত্র দুইটি স্থানে পাওয়া যায় : জিন এবং মানুষের ডেতরেই রুহ থাকে এবং আর কোথাও থাকার বিধান নাই। রুহ জাত, কিন্তু নফস সিম্বাত। নফস দুর্বল, কিন্তু রুহ সর্বশক্তিমান। রুহ জাগ্রত হলেই ফেরেশতাদের পাহারা দেওয়া কর্তব্য হয়ে যায়। সূরা নহলের দুই নম্বর আয়াতে রুহের আগমনের সঙ্গে ফেরেশতাদেরকে পাবেন, কিন্তু নফসের সঙ্গে ফেরেশতাদের পাহারা দেবার কথাটি নাই। যেহেতু নফস সিম্বাত তাই তার অনেক ভাগ আছে। পুরাতন আলেম-উলামারা আঠারো হাজার ভাগ করে গেছেন। কমবেশি তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু নফসকে যে ভাগ করা যায় এটা পরিষ্কার বোঝা গেল। কিন্তু রুহকে কেউ ভাগ করেন নি কারণ রুহকে ভাগ করা যায় না। যদি কেউ রুহকে ভাগ করতে চেষ্টা করেছে সে রুহের কিছুই বোঝে নি। সে যদি পীর হয়ে থাকে তা হলে সে পীর নামের কলঙ্ক। মুরিদদের মুখে ফিরিয়ে নেওয়া কর্তব্য। কারণ সেই পীর রুহ বিষয়ে অন্ধ। মুরিদও অন্ধ। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাতে গেলে দুজনেই গর্তে পড়ে। সিম্বাতের যেমন ভাগ আছে সে রকম বিবর্তনও আছে। যাহা ভাগ করার যোগ্য বিবর্তন সেখানে অবধারিত। সুতরাং বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন ঠিকই আছেন। না

বোঝার দরুন ডারউইনকে গালি দেয়, যেমন অধম লিখকও একদিন গালি দিয়েছি। তুলাকে সুতা বানানো হলো। তুলার প্রথম বিবর্তনটির নাম সুতা। সুতাটিকে কাপড় বানানো হলো। কাপড় সুতার বিবর্তন, তুলার দ্বিতীয় বিবর্তন। আবার গাছ হতে তুলা পেলাম। আগুন, পানি, মাটি আর বাতাস ছাড়া কোনো গাছ হয় না। এখন আগুন, পানি, মাটি আর বাতাস কোথা হতে এলো? এই প্রশ্নটির উত্তর দেবে আলবাব তথা জ্ঞানীজন। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আওতায় ওলির পড়েন না। যে এই বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন এ রকম গবেষকদেরকে বিজ্ঞানীও বলা হয়। কোরান চোখে আঙুল দিয়ে আমাদেরকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছে যে, একেকজন একেক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করবে এবং এ রকম বিশেষ জ্ঞানীদেরকে কোরান-এর ভাষায় আলবাব বলা হয়েছে আর আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানী তথা সায়েন্টিস্ট। সূরা বাকারার একশত চৌষটি নম্বর আয়াতটি বার বার পড়ে দেখুন, দেখতে পাবেন আমার কথাগুলো কতটুকু তিষ্ঠ সত্য। নফস সিফাত, রুহ জাত। রুহ নামক জাতটি মাত্র দুইটি সিফাত নামক নফসের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, ধরার উপায় থাকে না। তাই ভুল করা হয়। এই ভুলটি অনিচ্ছাকৃত, তাই ক্ষমার যোগ্য। যেমন, দুধের মধ্যে মাখন লুকিয়ে থাকে। দুধের মধ্যে মাখন লুকিয়ে আছে ॥ খালি চোখে স্থূলবুদ্ধিতে ধরা যায় না। কারণ মাখন থাকার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। ঘোঁয়া দেখে আগুন অনুমান করা যায়, কিন্তু দুধ দেখে মাখন থাকার অনুমান করা যায় না। কারণ ইহা অতি সূক্ষ্ম। স্থূলরূপ ধারণ না করলে বিশ্বাসের অভাব থাকা স্বাভাবিক। মাখন তোলার যন্ত্র বা অস্ত্র দিয়ে যখন দুধের উপর জলি জিকির করা হয় বেশ কিছুক্ষণ, তখন দুধের শরীরে লুকিয়ে থাকা মাখনগুলো আলাদা হয়ে বেরিয়ে দুধের উপর ভাসতে থাকে। অবাক

হয়ে চোখ দু'টো সেই ভাসমান মাখন দেখতে থাকে। জিন এবং মানুষ নামক মাত্র দু'টি নফসের সঙ্গে রুহ মিশে আছে। খালি চোখে কিছুই বোঝা যাবে না। মাখন তোলার যন্ত্রের মতো মোরাকাবা-মোশাহেদা নামক যন্ত্র দিয়ে নির্জন স্থানে একাকী ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আপনার ভেতর যে-নফসটি আছে সেই নফস হতে ভেসে উঠবে জাগ্রত রুহ। মাখন ভেসে উঠলে সেই দুধ আর দুধ থাকে না। তখন সেই দুধের নাম হয়ে যায় ঘোল বা মাঠা। দেখতে একদম দুধের মতো। মুখে দিলেই বোঝা যায় যে, দুধের শরীর হতে মাখন বেরিয়ে গেলে ওটা আর দুধ থাকে না। হয়ে যায় মাঠা। চোখ বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু মুখ বিশ্বাস করিয়ে দেয়। নফস হতে রুহ যখন ভেসে ওঠে তখন জাগ্রত হয় তখন সেই নফস আর নফস থাকে না। যদিও খালি চোখে নফসই মনে হয়। তখন সেই নফসের নাম হয়ে যায় মোতমায়েন্না তথা পরিতৃপ্ত, জাম্মাল তথা নুরময় শরীর, ওয়াজহুল্লাহ তথা আল্লাহর চেহারা, নররূপী নারায়ণ তথা নরের সুরতে নারায়ণ, সারাপা তথা পা হতে মাথা পর্যন্ত জালুয়া তথা নুরে নুরময়, বান্দা নেওয়াজ তথা বান্দার মাঝে আল্লাহর রহস্য। কারণ দুধ ও মাঠা দেখতে একই রকম, কিন্তু আসলে এক নয়। সাধারণ মানুষ এবং আল্লাহর ওলিকে তাই সহজে চিনে নেওয়াটা কষ্টকর। চিনবার আর কোনো উপায় থাকে না। তাই তকদিরের উপর নির্ভর করতে হয়। বুদ্ধি চিনিয়ে দিতে অক্ষম। কারণ এখানে বুদ্ধি বেকার (হাফেজ সিরাজি)। আপনি মনমানসিকতায় যে রকম ঠিক সে রকম গুরুটিই বেছে নিতে বাধ্য। তকদিরের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আপনি যদি মনমানসিকতায় কৈ মাছ হয়ে থাকেন তা হলে কৈ মাছের ঝাঁকেই আপনাকে থাকতে বাধ্য করবে, ইলিশ মাছের ঝাঁকে যেতেই পারবেন না। তকদির ঝাঁকিয়ে আপনাকে তাড়িয়ে দেবে, যা কারো পক্ষেই

বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তাই আমরা সূক্ষ্ম তকদিরের বৃত্তে আঁকপুঁকি বাঁধা আছি। ষাট হাত পানির নিচ দিয়ে ইলিশ মাছ চলাচল করে, তাকে অল্প পানির উপর আনাই যায় না এবং না যাওয়াটাই ইলিশ মাছের তকদির। আর অল্প পানির কৈ মাছকে ইলিশের চলার পথে আনাই যাবে না এবং এই আনা-যাবে-না-টাই হলো কৈ মাছের তকদির। তাই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নির্ভুল এবং নিপুণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দেখে ভুল ধরতে গেলে ভুল তো পাওয়া যাবেই না, বরং চোখ বিস্ফারিত হয়ে নিজের কাছেই ফেরত আসবে (সূরা মূলক : ৩)। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যটিকে আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট তকদিরের বৃত্ত বা বলয়ের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন। একটাকে ডিঙিয়ে অপরটির বৃত্তে বা বলয়ে বেরিয়ে আসার অধিকার দেওয়া হয় নি (সূরা রহমান)। তবে এটাও ঠিক যে, আল্লাহর রহমাপ্রাপ্ত জিন এবং মানুষকে আল্লাহ পাক অপরিসীম ক্রমতা এবং শক্তি দান করেছেন। জিন এবং মানুষকে আল্লাহ বলছেন যে, আমার সৃষ্টিরাজ্য হতে বেরিয়ে যাও যদি তোমাদের ক্রমতা থাকে, কিন্তু তা পারবে না। তবে আমার অনুমতি পেলে, আমার বিশেষ রহমত পেলে সুলতানের (আল্লাহর) সৃষ্টিরাজ্য হতে বেরিয়ে লা-মোকামে অবস্থান করতে পারবে। (সূরা রহমান এবং সূরা মোজায়েল)।

এরশাদ শিকদারের ফাঁসিতে মৃত্যুর যাতনা অমৃতলাল বর্মণ বুঝতে পারবে। যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করছে এবং এমনকি যে-জল্লাদ নিজ হাতে যমটুপির উপর দড়ি (ম্যানিলা রোপ) গলায় পরিয়ে দিচ্ছে, তার পক্ষেও মৃত্যুর যাতনা বুঝবার কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং আল্লাহর ওলিকে আর এক ওলি চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে। সাধারণ মানুষ মারা যাবার দৃশ্যটি দেখে দুঃখ পেতে পারে অথবা ভয়ও পেতে পারে, কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণাটি বুঝতে পারবে না।

মৃত্যুযন্ত্রণাটি বুঝতে পারবে ইয়াসিন হত্যার ফাঁসির আসামি অমৃতলাল বর্মণ। আল্লাহর ওলিকে ওলিই চিনতে পারে, কারণ ওলি হবার ধ্যানসাধনাটি উভয়েই করে এসেছেন। একদম সাদামাঠা কথায়, সিংহের শরীরে কতটুকু শক্তি তা বাঘের পক্ষে বোঝা সম্ভব এবং বাঘের শরীরে কতটুকু শক্তি তা সিংহের পক্ষে বোঝা সম্ভব, কিন্তু খরগোশ আর হাঁদুরের পক্ষে নয়। একজন কুস্তিগীরের শরীরে কতটুকু শক্তি আছে তা অন্য একজন কুস্তিগীর বুঝতে পারবে ॥ কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও কুস্তিগীর এবং আমরা সবাই মানুষ। সে রকমভাবে ওলিদের নাম হয় অনেক। আসলে একই জিনিসের নাম হয় অনেক : কুপি, হারিকেন, মোমবাতি, আর প্রদীপ ॥ আসলে একটিই মাত্র আগুন জ্বলতে দেখি। জ্বলন্ত রূহে ভাসমান নফসের অধিকারী মানুষটিকেই বলা হয় আল্লাহর ওলি, মুরশিদ, পীর, আবদুহ, সম্যক গুরু, চেতন গুরু, মজ্জুব, সালেক, রিদ্দি, সারাপা, মুনি, ঋষি, সেইন্ট ইত্যাদি। সেই জ্বলন্ত রূহের ভাসমান নফসের যিনি অধিকারী তাঁকে সবাই চিনতে পারে না, কারণ চিনবার কোনো উপায় থাকে না। এখানেই তকদির। তকদিরে থাকলে চিনতে পারবেন, না হলে যেমন আছেন তেমনই থেকে যাবেন। সেই জ্বলন্ত রূহের ভাসমান নফসের অধিকারীদের অনেকেই হালে বলে ফেলেন : ‘আমিই সুবহানি সব শান আমারই’, ‘আমিই একমাত্র সত্য’, ‘এই জুঝার মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেহ নাই’, ‘আদম-হাওয়া অস্তিত্বে আসার অনেক আগেও আমিই আছি’, ‘তিনিই আমি’, ‘তুই মুই, মুই তুই’ ॥ ইত্যাদি অনেক রকম কথা বলে ফেলেন। সেই নফস দেখতে সাধারণ নফসের মতোই, আসলে তা নয়। দুধের উপর ভাসমান মাখন। দেখতে দুধের মতোই, আসলে ওইটা আর দুধ নয়, বরং ঘোল বা মাঠা। সাধকের নফস দেখতে অন্য দশটা নফসের মতোই, আসলে ওটা নফস নয়, বরং

মোতমায়েন্না, রিন্দি, সারাপা, জাম্মাল, ওয়াজহুল্লাহ, বান্দা নেওয়াজ, মাওলাউল আলা, আবদুহ, মুনি, খাম্বি, সেইন্ট ইত্যাদি। ভাসমান অবস্থায় মাখনই বলতে পারে ‘আমিই মাখন।’ কিন্তু দুধের শরীরে মিশে থেকে ‘আমিই মাখন’ বলা যায় না। কারণ মাখন লুকিয়ে আছে, ভাসমান নয়। ভাসমান হলেই দুধ আর দুধ থাকে না। রুহ জাগ্রত অবস্থায় বলতে পারে, ‘আমিই সত্য,’ কিন্তু নফসের সঙ্গে মিশে থেকে ‘আমিই সত্য’ বলা যায় না। কারণ রুহ লুকিয়ে আছে। জাগ্রত নয়। জাগ্রত হলেই নফস আর নফস থাকে না, হয়ে যায় মোতমায়েন্না। আর এই মোতমায়েন্না নফসকেই জ্ঞান্নাতে দাখেল হবার আশ্বান জানানো হয়। আশ্বারা এবং লাউয়াম্মাকে জ্ঞান্নাতে দাখেল হবার আশ্বানটি সমগ্র কোরান-এ একবারও জানানো হয় নি। কারণ এই দুইটি অবস্থায় রুহ নফসের সঙ্গে মিশে থাকে। জাগ্রত হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই জ্ঞান্নাতে দাখেল হবার আশ্বানটির প্রশ্নই ওঠে না। তাই আল্লাহ পাক সূরা কেয়ামতে নফসে লাউয়াম্মার কসম খাচ্ছেন। কারণ লাউয়াম্মা নফস সংগ্রামরত অবস্থায় থাকে, জেহাদের ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে। এই জেহাদ ছোট জেহাদ নয়। তলোয়ারের যুদ্ধটিকে ছোট জেহাদ বলা হয়। এই জেহাদ নফসের বিরুদ্ধে। ধ্যানসাধনার যত্ন বা অস্ত্র দিয়ে রুহকে জাগ্রত করার সাধনা। নফসে মিশে থাকা রুহকে জাগ্রত তথা ভাসিয়ে তোলার সাধনা। সুবহান মানেই ভাসমান। তাই আল্লাহকে ভাসমান বলা হয়। সুবহান আল্লাহ তথা ভাসমান আল্লাহ। এই যুদ্ধটিকে বড় জেহাদ বলা হয়। জেহাদে আকবর, জেহাদে কবির। তাই সৃষ্টিজগতকে ধ্বংস করার সময় আল্লাহ নফসে লাউয়াম্মার কসম খাচ্ছেন। যাহা আছে এই সৃষ্টিজগতে তাহা আছে একটি মানবদেহে (আল্লামা ইকবাল)। সুতরাং একটি মানবদেহের মৃত্যুটাই হলো একটি ছোট কেয়ামত। আর কেয়ামত হবার সঙ্গে সঙ্গে আপন

কর্মফল নিয়ে ওঠানো হবে। আঘাত করলে আঘাতের কর্মফল নিয়ে ওঠানো হবে। ভালোবাসলে ভালোবাসার কর্মফল নিয়ে উঠতে হবে। যে রকম কাজটি করা হয়েছে সেই কর্মফল নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে উঠতে হবে। কারণ সৃষ্টি এবং আগের সব জড়ানো স্মৃতির বোঝাপুলো জ্বালিয়ে দিয়ে ফেরেশতারূপে (শিশুরূপে) ওঠানো হবে। (সূরা মোদাসসের)। আমরা কেয়ামত বলতে দুই রকম কেয়ামতকে বুঝতে চাইবো : বড় কেয়ামত এবং ছোট কেয়ামত। একটি মৃত্যুই যে একটি ছোট কেয়ামত এটা সবাই কমবেশি জানেন। সুতরাং কেয়ামতের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানো হবে। আমরা অন্যধর্মের ভাষায় পুনর্জন্ম বলতে চাই না। কারণ সত্যটি অনেক সময়, অনেক পরিবেশে, অনেক পরিস্থিতিতে তিষ্ঠে হয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। তাই আমরা কেয়ামত বলবো, পুনর্জন্ম বলবো না। যদি কেহ সাহস করে বলেন, তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

জিন এবং মানুষের নফস ছাড়া আল্লাহকে ভাসমানরূপে পাওয়া যায় না এবং পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আল্লাহ নিজে রূহরূপে এই দুইজনের সঙ্গে মিশে আছেন। সুতরাং নফস দেহের বাহিরে থাকে না, বরং দেহের ভিতর থাকে। সুতরাং দেহের বাহিরে আল্লাহকে ভাসমানরূপে পাওয়া যাবে না এবং পাবার প্রশ্নই ওঠে না এবং যারা দেহের বাহিরে খুঁজে বেড়ান তারা বোকা এবং বোকার স্বর্গে বাস করছেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায় তোমার এই দেহটি হলো মিম্বের জিকির (মিম্বের স্মরণ), সব কিছুর উৎস, উর্ধ্বগমনের বোরাক, সব কিছুর গুপ্তরহস্যভাণ্ডার। তোমার খুদির (আমির) প্রতি যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখতে পারো, তো কিছুই পাবে না। দুনিয়ার বৈষয়িক বিত্ত-বৈভবের নূতন নূতন আবিষ্কারের বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবাদের সাগরে অবগাহন করার কোনোটাই পাবে না। আল্লামা

ইকবাল উভয় অর্থে খুদিকে অনুশীলন করার কথাটি বলেছেন। তাই নিরপেক্ষতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। আল্লাহ দেহের বাহিরে জ্ঞাতরূপে (সিফাতরূপে নয়) থাকেন না বলেই কোরান-এ ঘোষণা করলেন যে, ‘আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি।’ শাহারগটি দেহের বাহিরে থাকে না, বরং দেহের ভিতরেই একটি অংশ। সুতরাং দেহটি যে আল্লাহর রহস্য ইহা পরিষ্কার বোঝা গেল। আরও বোঝা গেল যে, দেহ নামক আপন ঘরের খবর নিতে হবে, রহস্য জানতে হবে, দেহতত্ত্বের মোকামগুলি এবং লতিফাগুলি এবং কোন মোকামের কী কাজ, কোন লতিফাতে কী রহস্য ইহা আপন গুরু বা পীরের নিকট জানতে হবে। সুতরাং দুনিয়ার লোভ-মোহ হতে যিনি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন নি তিনি গুরু তথা পীর নামের কলঙ্ক। মুখ ফিরিয়ে নাও এবং আবার মুরিদ হও ॥ যদি সত্যকে আলিঙ্গন করার অদম্য স্পৃহা তোমার মাঝে থেকে থাকে। আর যদি সাইনবোর্ড নিয়ে থাকতে চাও তা হলে আমার এই উপদেশটি আমি ফিরিয়ে নিলাম।

সাধনার সহায়ক মোকাম পরিচয়

আপন দেহঘরেই চারটি মোকাম আছে : মোকামে নাসুত, মোকামে মালাকুত, মোকামে জাবরুত এবং মোকামে লাহুত। এই চারটি মোকামের প্রাথমিক পরিচয় জেনে নিলে ধ্যানসাধনার পথে এগিয়ে যেতে সহজ হয়। আবার প্রাথমিক পরিচয় না জেনেও ধ্যানসাধনায় এগিয়ে যাওয়া যায়। ধ্যানসাধনা করলেই সাধক আপনা হতে মোকামগুলোর পরিচয় পেয়ে যায়। সাধারণ এবং ভালো মানুষগুলো নাসুত এবং মালাকুতেই অবস্থান করে। ধ্যানসাধনায় তথা মোরাকাবার মাধ্যমে একজন জাবরুত মোকামে আসতে পারে। তাও আবার প্রচুর ধ্যানসাধনার প্রয়োজন হয় এই

মোকাম্বে অবস্থান করতে (দিওয়ান-ই মুঈনুদ্দিন)। কিন্তু মোকাম্বে লাহতে আসা চারটিখানি কথা নয়। যখন নিজের স্বকীয়তাটিকে গুরু চরণে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া যায় আর আমার বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখনই লাহত মোকাম্বে আসা যায়। এই মোকাম্বে আসার পর সাধক দেখতে পান যে, আপন গুরু আর আপনার মাঝে নাই, বরং বিদায় গ্রহণ করেছেন এবং খান্নাসরূপী শয়তানটিও বিদায় গ্রহণ করেছে। সাধক তখন দেখতে পান যে, তাঁর গুরুও তিনি এবং শিষ্যও তিনি। সাধক তখন বলে ফেলেন, ‘আমার পীরও আমি আবার আমার মুরিদও আমি।’ (হাফেজ সিরাজি, মাওলানা রুমি, বু আলি শাহ কলন্দর, হজরত বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী এবং আরও অনেক গুলি)। এইখানেই সাধক পুকুর, খাল এবং নদী পার হয়ে সমুদ্রের লোনা জলে পা রাখেন, এখানকার জলের স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেখতে জলই, কিন্তু ধরনধারনের চরিত্রটি ভিন্ন। এই সমুদ্রটিকেও সাধকেরা নয় ভাগ এমনকি আঠারো ভাগে ভাগ করেছেন (মাতলাউল উলুম : বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী)। এই ভাগ সমুদ্রে অবস্থান করেই গভীরতার গুণগত পার্থক্য নির্ণয় করার ভাগ। এর বেশি কিছু নয়। এর বেশি কিছু ভাবাটা নিছক পাগলামি, যদি আদিত্যটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাবতে যায়।

এই মোকাম্বে যেতে হলে যে আর কিছুই নিজের বলে থাকতে পারে না, তারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। গুরু নানক তাঁর গুরু বাবা বাহালুল দানার নির্দেশিত মতে কঠোর ধ্যানসাধনায় বেশ কয়টি বছর মগ্ন থাকার পরও যখন দেখতে পেলেন যে, মোকাম্বে লাহতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, বরং মোকাম্বে জাবরুতের উন্নত স্তরেই ঘোরাফিরা করতে হচ্ছে, তখন আপন গুরু বাবা বাহালুল দানাকে বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে বললেন। গুরু নানকের গুরু বাবা বাহালুল দানা তখন বললেন,

‘বাবা, সামান্য একটি সূক্ষ্ম পর্দা (দেয়াল) এখনও তোমার মাঝে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এই সামান্য সূক্ষ্ম পর্দাটি ছিন্ন করতে পারলেই লাহত মোকামে যেতে পারবে।’ গুরু নানক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘বাবা! সেই পর্দাটির নাম দয়া করে আমাকে বলে দেবেন কি?’ গুরু বাবা বাহালুল দানা বললেন, ‘অবশ্যই। সেই সূক্ষ্ম পর্দাটি যাহা তোমার মাঝে এখনও বাস করছে তার নাম হলো, তুমি চাও যে তোমার নামটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক। তুমি চাও যে, তোমার নাম দুনিয়ার মানুষ জানুক, তোমার প্রশংসা করুক, তোমাকে নিয়ে ধন্য ধন্য করুক। বাবা নানক, জেনে রাখো যে, লাহত মোকামে যাবার পথে এইটি একটি শক্ত, কঠিন এবং সূক্ষ্ম পর্দা। এই পর্দাটি তোমার মধ্যে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ লাহত মোকামে যেতে পারবে না।’ (খাম্বি অমৃত)। এখন পাঠক বাবা-মায়েরা বুঝে দেখুন, লাহত মোকামে গমন করাটি কত জটিল, কত সূক্ষ্ম! এই যদি লাহত মোকামে যাবার মানদণ্ড হয় তা হলে দুনিয়ার প্রতি মোহ রেখে কেমন করে গুরু হতে পারে! কেমন করে পীর হতে পারে? যদি এই রকম গুরুর মুরিদ হয়ে থাকেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিন। অন্যগুরু খুঁজতে থাকুন। এ রকম গুরু খোঁজাকেই মহানবি জ্ঞান অন্বেষণ করার কথাটি বলে বুঝিয়েছেন। না হলে মহানবি কেন চীন দেশেও যাবার কথাটি বলেছেন! সেই দিনে চীন দেশে যাওয়া অনেক কষ্টকর বিষয় ছিলো। গুরু আপনাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তা বিষয়টি যতই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হোক না কেন। আর যদি সাইনবোর্ডটি কাঁধে নিয়ে তিন নম্বর বকরির বাচ্চার মতো দুধ না পেয়েই লাফালাফি করতে ভালোবাসেন তো আমার বলার কিছুই রইল না। কেবল এটাই বার বার মনে করতে চেষ্টা করবেন যে, এটাও আপনার তকদিরে লিখা ছিল। কারণ তকদির খণ্ডায় না। তবে কখনও

কখনও ওলিদের দোয়ায় খণ্ডিয়েও যেতে পারে। আবার একটিবার চিন্তা করে দেখুন তো, এই রকম পর্দা কার মাঝে না আছে? কে না চায় যে, আমার সুনাম আমার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক? তাই গুরু নানক বিনয়ের সাথে আপন গুরুকে প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলে অনুমতি দিলেন। গুরু নানক বললেন, ‘বাবা, দুনিয়াতে অনেক গুরুই আছেন যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, সবাই তাদের একডাকে ঢেনে ও জানে এবং শ্রদ্ধাভরে ভক্তি জানায়।’ গুরু বাবা বাহালুল দানা বললেন, ‘বাবা, ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে হয়েছে, তাই দোষের কিছু নাই। যদি নিজের পক্ষ হতে হয়, তবেই দূষণীয়। আল্লাহকে নিয়ে অহঙ্কার করা যায়, নিজেকে নিয়ে নয়।’ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (খাজাবাবা) হাত তুলে দোয়া চাইবার সময় অনেক ওলির নাম ধরে সালাম দিয়ে দোয়া চাইতেন। খাজাবাবার বড় বড় খলিফারা দোয়ার মাহফিলে শরিক হতেন এবং অনেক ওলির নামই শোনেন নি। একদিন এক ওলির নাম ধরে খাজাবাবা বার বার দোয়া চাইছেন। সেই ওলির নামটি হজরত বাবা সিনানাথ, যা তাঁর খলিফারা জীবনেও শোনেন নি। বিনয়ের সহিত প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলে, অনুমতি দিলেন। খলিফারা বললেন, সিনানাথ নামের কোনো ওলির কথা তাঁরা জানেন না। খাজাবাবা বললেন, ‘কেমন করে জানবে বাবা? সিনানাথ একজন এতই উঁচু স্তরের আবদুহ যে তিনি বনেই ফুটেছিলেন এবং বনেই গন্ধ ছড়িয়ে ঝরে গেছেন। যার পদসেবা করার যোগ্যতাটুকু আছে বলেই বার বার দোয়া চাইছি।’ সবাই অবাক! সুতরাং এখানে লাহত মোকাম আঠারো ভাগেরও উর্ধ্বে বলে অধম লিখকের মনে হয়। সুতরাং লাহতের আঠারোটি ভাগ যেমন আছে তেমনি ভাগের বহু উর্ধ্বে অবস্থান করা অনেক ওলিও আছেন। দলিল হিসাবে সূরা কাহাফের আবদুহ খিজির আর মুসা (আ.)-এর ঘটনাটাই যথেষ্ট মনে করি। এ

জন্যই মারফত অস্বীকারকারীর দলেরা খিজিরের অবস্থানটিকে অসহ্য একটি ঝামেলার বোঝা মনে করে এবং মনগড়া যা-তা ব্যাখ্যা দিয়ে বানানো হাদিস দাঁড় করিয়ে জনতার পাতে সহি খাদ্য বলে পরিবেশন করে। এই অখাদ্য-কুখাদ্য মার্কাগুলো তারাই খাবে যাদের তকদির জন্মের আগেই লেখা হয়ে আছে। মশা-মাছির কপালে যা লেখা থাকে তাই তো হবে, তাই বলে কি আল্লাহ পাক মশা-মাছি সৃষ্টি করা বন্ধ করে দেবেন?

বাবা সিনানাথ নামক অতি উঁচুস্তরে অবস্থান করা মজ্জুবের নামটি খাজাবাবা বলে না দিলে জীবনেও নামটি জানতে পারতাম না। দুনিয়াতে অনেক কিছু আবিষ্কার করার পথে এখনও অজানা রয়ে গেছে। আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারছি। আজ হতে চল্লিশ বছর আগে বগুড়া শহর হতে ঢাকাতে ফোন করবো। পোস্ট অফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে অনেককাল অপেক্ষা করার পর যে ফোনটি পেলাম সেই ফোনের নামটি ছিলো ট্রাংকল। ছেলে-মেয়েদের বললে ট্রাংকল নামটি শুনে হি হি করে হাসে আর বলে, ‘বাবা, এই প্রথম শুনলাম।’ হাসবার কারণ আছে। সোনা মসজিদ, বদল গাছির পাহাড়পুর, ঠাকুর গাঁও আর পঞ্চগড় হতে ভক্তরা অহরহ মোবাইল ফোনে কথা বলছে, সুতরাং হাসবার তো কথাই। বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যা সেদিনের মানুষের কাছে গাঁজাখুরি গল্পো বলেই মনে হবে। যারা আখেরি এলেন, আখেরি চ্যালেঞ্জ, আখেরি গাউসুল আজম, আখেরি মুজাদ্দের, আখেরি নূর, আখেরি মোনাজাত, আখেরি বিজ্ঞান বলতে চায়, অথবা আখেরি ভাইরাসে আক্রান্ত, আজকের দুনিয়া তাদেরকে পাগলই বলতে চাইবে। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে আখেরি (শেষ) বলে কিছু নাই। বিবর্তনবাদের চক্রে নব নব রূপে পৃথিবী নামক গ্রহটি ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণায়মান

চরিত্রটি যারা খামিয়ে দিতে চায়, তারা সভ্যতার ইতিহাস হতে একদিন ছিটকে পড়ে।

ছবি বিষয়ে ভুলের অবসান হোক

খাজাবাবা রচিত দিওয়ান-ই মুঈনুদ্দিন নামক গ্রন্থ মূল ফারসি ভাষাসহ বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় জেহাদুল ইসলাম সাহেব। বিরাট গ্রন্থ। প্রায় ৫২৯ পৃষ্ঠার। একটি কুবাই পড়ে আমি অধম চমকে গেলাম। বার বার পড়তে লাগলাম। মাথা ঘুরছে। মূল ফারসিটা না থাকলে অনুবাদকের উপর সামান্য সংশয় জেগে উঠতো। একটি শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য ফারসি টু উর্দু এবং অপরটি ফারসি টু ফারসি ডিকশনারি দু'টো খুলে দেখার পর অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এমন গোপন কথাগুলো খাজা গরিব নেওয়াজ কেমন করে লিখে গেলেন! আমরা লিখলে তো অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো। তবুও কিছু মহানবির হাদিস মনে আছে তাই মিলাতে চেষ্টা করলাম এবং ভক্ত মাওলানা মাহতাব উদ্দিনকে নিয়ে বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম আর ভাবলাম যে, উমাইয়া আর আব্বাসীয়রা কেন ছবি তোলার বা আঁকার বিরুদ্ধে জাল স্ট্যাম্পের মতো, জাল দলিলের মতো, জাল হাদিসগুলো বানিয়ে গেছে! তারা জানত যে, যদি এজিদ, মারোয়ান, হাজ্জাজ, মোতাওয়াক্কিলের মতো আরও অনেকের আঁকা ছবি থেকে যায় তবে অনাগত কালের মুসলমানেরা ঐ সব ছবির উপর জুতার মালা, মুইড়া ঝাড়ুর মালা পরিয়ে রাখত আর ঘণার খুতু নিক্ষেপ করে পচা রজনীগন্ধার ডাঁটা ছবির সামনে রেখে

দিত। যেমন দলিলরূপে আজকের যুগে কেউ হিটলার, মুসোলিনি আর ফ্রান্সের ছবি রাখা তো দূরে থাক, বরং ঘণার খুঁতু নিক্ষেপ করে।

তফসিরে ইবনে কাসির-এর লিখক ইবনে কাসির সাহেব তো সবার মাথায় আঘাত করে হাটে হাড়িখানা ভেঙে দিয়েছেন সূরা আরাফের একশত সাতান্ন নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে। তিনি তো সাহাবা হিশাম ইবনে আস উম্মুর বর্ণিত কথাগুলো সহি বলে সকল নবির ছবি বিশেষ ধরনের সিদ্ধুকে, সমতলে রাখা ছবিগুলো একে একে দেখানোর পর মহানবির ছবিটি দেখে সাহাবারা সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন (তফসিরে ইবনে কাসির, বাংলা অনুবাদ চতুর্থ খণ্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠা হতে ৩৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যেখানে নবিদের ছবিগুলো আছে এবং সেই সঙ্গে মহানবির ছবি দেখে সাহাবারা অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু ভিন্ন দেশের সম্রাটদের তো মুখের উপর একজন সাহাবাও বললেন না যে, ছবি তোলা হারাম। আমাদের এখানে এক মসজিদের ইমাম সাহেব বহুদিন মাইকে ছবি তোলা হারামের বয়ানটি দিয়েছেন। তারপর অধম লিখকের মামাতো ভাই বদলি হজের নামে ইমাম সাহেবকে হজ্জে নিয়ে গেছেন। হজ্জ করার পর সপ্তাহের একদিন তফসিরের বয়ান করছেন এমন সময় একজন ভদ্রলোক ইমাম সাহেবকে ছবি হারাম হবার কথাগুলো তুলে ধরলেন এবং বললেন যে, আপনি হজ্জে যাবার সময় পাসপোর্টে আপনার ছবি ছিলো কি না? বৃদ্ধ ইমাম সাহেব বললেন যে, ছবি তোলা হারাম তবে পাসপোর্টের ছবিটি তোলা হালাল। প্রশ্নকারী বললেন যে, সেই দিনে পাসপোর্টের কোনো বালাই ছিলো কি না? বিজ্ঞানের যুগ ইমাম সাহেবকে নিরুত্তর করে দিল। আর একবার আমার পাশের গ্রামের এক বৃদ্ধ মসজিদের ইমাম সাহেব শবে বরাতের রাতে আতশবাজির পটকা ফোটানো নাজায়েজ বলে বয়ান দিচ্ছেন

এমন সময় এক মুসল্লি উঠে বললেন যে, বাড়ি হতে আসার পথে দেখলাম আপনার ছেলে আতশবাজির পটকা ফুটাচ্ছে। উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, সঙ্গদোষে এই কাজ করছে। এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়টি আর এগিয়ে নিতে চাই না। কারণ আমার মূল বিষয়টি এখনও বলা হয় নি।

আদম দেহই রহস্যের মাকাম, ইনসান দেহ নহে

আমাদের আলোচনার মূল বিষয়টি এখানে মানুষের দেহটি। এই দেহের ভেতরই আল্লাহ রবরূপে বিরাজ করছেন। যে দেহের রহস্যগুলো ধ্যানসাধনায় একটি একটি করে চিনতে পেরেছে, জানতে পেরেছে, সে আল্লাহর রহস্যময় অবস্থানটি চিনতে পেরেছে। ‘যে আমাকে দেখেছে সে সত্যকে দেখেছে’ (মান রানি ফাকাদ রাআল হাক্কা) এই কথাটি মহানবি বলার সঙ্গে সঙ্গে যে কয়জন নাসারা প্রশ্ন করেছিলেন, তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন। অন্যান্য সাহাবারা কিছুটা অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে মহানবিকে কোনো প্রশ্ন না করে একটি বিশেষ পরিবেশে যখন সাহাবারা প্রশ্ন করেছিলেন এই বলে যে, আপনাকে আবু জাহেল, আবু লাহাব, ওক্বা, সায়বা, আবদুল্লাহর মতো কাট্টা কাফেরেরা এত দেখল অথচ মুসলমান হলো না! কোরান-এর সূরা আরাফের একশত আটানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘(মোহাম্মদ) দেখিতেছেন, তাহারা আপনাকে দেখিতেছে অথচ তাহারা আপনাকে দেখিতেছে না।’ এদের তকদির এদেরকে আসলরূপে দেখতে পাবে না তাই এদেরকে আস্তান করা আর না করা সমান। ‘এই আমাকে যে দেখেছে’ ॥ বলার মাঝে মহানবির দেহ মোবারকটির কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং এই দেহের মাঝেই সব রহস্য লুকিয়ে আছে। এই আব, আতস, খাক আর বাতকে পৃথক

করতে পারলে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়ে যায়। তাই আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি বলেছেন, ‘এখানে দেহটি ফানা হয়ে আছে আবার অন্যস্থানে দেহ-ধারণ করেই নৌকা পার হয়ে যাচ্ছে এবং তুমি বলে দাও যে, এটাই ফকিরের শান।’ আবার এই দেহটিকেই আত্মার জীবন্ত কবর বলা হয়। এই জীবন্ত কবরই দুনিয়ার সব শাস্তি, সব শাস্তি ভোগ করে। রোগ-যাতনায় আত্মার জীবন্ত দেহটি ছটফট করছে, যাতনায় চিৎকার করছে, হাসপাতালের বেডে শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণার আজাব ভোগ করে এই জীবন্ত দেহ নামক কবরটি। তাই দেহের বাহিরে পরমকে তারাই খোঁজে যারা আপন দেহটিকে অস্বীকার করে। তাই তাদের কেনাবেচা সব বাকিতে। মরে যাবার পর সব কিছু পাবার কথাটি গুনিয়ে যায়। অথচ কোরান বলছে যে, যারা দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে মারা যাবে তারা মরণের পরও অন্ধই থাকবে। আবার এই জীবন্ত দেহটিকেই নুরের আধার বা পাত্র বলা হয় কেন? যেহেতু আল্লাহ দেহের শাহারগের নিকটেই অবস্থান করছেন, এবং যেহেতু আল্লাহর জাত রুহ অবস্থান করছে, সুতরাং এই জাতকে, এই রুহকে জাগ্রত করতে পারলে, ভাসমান অবস্থায় রাখতে পারলে দেহটি নুরে নুরময় হয়ে যায়। এই জাত নুরে নুরময় হতে পারলেই আপনি আদমের রহস্য। তাই ইনসান সুরত নয়, বরং আদম সুরতই হলো আল্লাহর সুরত। এখানে এসেই অনেক খবিরুদ্দিন-দবিরুদ্দিন নামের গবেষকেরা খেই হারিয়ে ফেলেন। সুতরাং আজাব, শাস্তি, আনন্দ, মুক্তি আর নুরে নুরময় করতে হয় এই দেহটিকে। যে দেহে স্বয়ং আল্লাহ রুহরূপে বিরাজ করছেন, সেই দেহটি হলো আদমের রহস্য। তাই আদমের মধ্যে যখন রুহ ফুৎকার করলেন এবং পরিপূর্ণতা দান করলেন তখনই আদমকে সেজদা দিতে বললেন। মানব-আকৃতিটিতে যখনই পরিপূর্ণতা এলো কেবল তখনই রুহ ফুৎকার করা হলো।

বিবর্তনবাদের দর্শন প্রচ্ছন্নভাবে এই বাক্যের মাঝে লুকিয়ে আছে (সূরা হিজর)।
এই আদমকেই সেজদা করার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ।

সালাত বা নামাজের প্রকারভেদ

এই আদমেরই জন্য আনুগত্যের সেজদা (এই আনুগত্যই আসল সেজদা আর মাথা নত করা প্রতীকী সেজদা) করতে বলেছেন আল্লাহ। সবাই সেজদা করলো এবং ইবলিস করলো না। এই সেজদাটির মূল বিষয় হলো আনুগত্যের সেজদা, গুরুত্বপূর্ণ মেনে নেবার আন্তরিক সেজদা। এই আনুগত্যের সেজদাটি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কারণ ইহা আপেক্ষিক সেজদা নয়, বরং চিরন্তন সেজদা। তাই দেখতে পাই চাঁদ-সূর্য, বৃক্ষ-লতা সেজদায় আছেন। এই সেজদা আপেক্ষিক নয়, বরং চিরন্তন (সূরা রহমান)। আনুষ্ঠানিক সেজদা আপেক্ষিক। যে কোনো মুহূর্তে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। এই আনুষ্ঠানিক সেজদাটি রূপক সেজদা। রূপক সেজদা আসল সেজদাটির দিকে এগিয়ে নেবার শিক্ষা দেয়। তাই রূপক সেজদাটির প্রয়োজন আছে। নামাজ দায়েমি এবং ওয়াক্তিয়া। ওয়াক্তিয়া নামাজই দায়েমি নামাজের দিকে এগিয়ে যাবার শিক্ষা দেয়। ওয়াক্তিয়া নামাজে আনুষ্ঠানিকতা আছে। রূপকতার ইষৎ মিশ্রণ আছে। তাই ওয়াক্তিয়া নামাজ কিছুদিন পড়ার পর অনেককেই বিরতি দিতে দেখি। কিছু দায়েমি নামাজের বিরতি নাই, পরিত্যাগের প্রশ্নই আসে না। তাই সূরা মাযারাজে এবং হাদিসে দায়েমি সালাতটিকে মহিমাবিত সালাত বা নামাজ বলা হয়েছে। দায়েমি নামাজের মধ্য দিয়েই ফানা হওয়া যায়, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়,

রহস্যলোকের দ্বার উদ্ঘাটন করা যায়। (দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন)। অথচ নামাজ বিষয়ে এত কথা বললাম, নামাজের গুরুত্ব এত দিলাম, কিন্তু অবাক কথাটি বললে সবার মন খারাপ হয়ে যায়। আর মন খারাপ হবার কথাটি হলো, সমগ্র কোরান-এর একটি পাতায় একটি লাইনেও আল্লাহ বলেন নি যে, তিনি (আল্লাহ) নামাজীদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন। নামাজ কয়েম করতে পারলে সবার কপালে একটি সিমা বা চিহ্ন ফুটে ওঠে, এটা কোরান-এরই কথা। কপালের উপর কালো কহরটিকে অনেকেই কোরান-এর বর্ণিত সিমা বা চিহ্ন মনে করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। এই চিহ্ন যাদের কপালে ফুটে ওঠে তারা কখনও কোনো প্রকার অন্যায় কাজ করে না, করতে পারে না। কারণ সব রকম ফাহেসা কাজ হতে তাকে বিরত করে ফেলেছে। ইতিহাস বলে এজিদের কপালে নামাজ পড়ার কহর ছিলো, ইবনে জিয়াদের কপালে নামাজের কালো কহর ছিলো, সীমারের কপালে নামাজের কালো কহর ছিলো, মহানবি কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আসামি মারোয়ানের কপালে নামাজের কালো কহর ছিলো, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ॥ যাকে ইসলামের হিটলার বলা হয় ॥ তার কপালে নামাজের কালো কহর ছিলো, খলিফা মোতাওয়াক্কিলের কপালে নামাজের কালো কহর ছিলো, মহীশূরের নবাব টিপু সুলতানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দুর্গের ভাঙা অংশ দেখিয়ে যে দিয়েছিল সেই মীর সাদেকের কপালে নামাজের কালো কহর ছিলো, নবাব সিরাজের সঙ্গে পবিত্র কোরান স্পর্শ করেও সমগ্র ভারতবাসীকে যে দুইশত বছর গোলামি করিয়েছিলো সেই মীর জাফরের কপালে নামাজের কালো কহর ছিলো ॥ তা হলে কেমন করে, কোন ব্যাখ্যায় কপালের কালো কহরকে নামাজের সিমা বা চিহ্ন বলা যেতে পারে? মহানবির আগের সকল নবিদের উম্মতেরা নামাজ পড়তেন এবং জাকাত আদায়

করতেন এবং তাদের আমলে ওয়াজিয়া নামাজের কোনো প্রচলন ছিলো না, তা হলে কোরান বলছে যে, প্রত্যেক নামাজির কপালে একটি সিমা বা চিহ্ন ফুটে উঠবে, সেই সিমা বা চিহ্নটিতে কেমন করে কপালের কালো কহরটিকে বুঝানো যায়? মহানবির আগের নবিদের উন্মতদের মাটিতে বা পাথরে বা পাকা শানে কপাল বার বার ঠেকিয়ে নামাজ পড়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ওয়াজিয়া নামাজটি চালুই হয়েছে কেবলমাত্র মহানবির আমলে। নামাজ আদায়ের প্রশ্নে যে রকম এই কথাটি অকাট্য সত্য, তেমনি জাকাত আদায়ের সময় যে শতকরা আড়াই টাকা ধার্য করা হয়েছে উহা কেবলমাত্র মহানবির আমল হতে শুরু হয়েছে। মূল নামাজ ও জাকাত এক ও অভিন্ন, কিন্তু প্রয়োগের প্রশ্নে ভিন্ন হতে বাধ্য ॥ দেশ, কাল ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের জন্য। মূল বিষয় বিষয়ই থেকে যায়। বিষয় আজ বিষয়, আগামীকাল কখনও অমৃত হয় না। এত বোঝানোর পরও যাদের কোনো পরিবর্তন আসবে না, তাদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে বলেছেন আল্লাহর ওলিয়া। কারণ যাদের উপর শয়তান খান্নাসরূপে দেহের মধ্যে প্রবল এবং চালকের ভূমিকা নেয় তাদেরকে বোঝানো আর না বোঝানো সমান কথা। তাদেরকে ডাকা আর না ডাকা সমান কথা। জোর করে আনলে বোঝা তো দূরের কথা, বরং মাহফিলের মাঝে পায়খানা-পেশাব করে দিয়ে পরিবেশটিকে আরও অসহনীয় করে তোলে।

বার বার বলছি। কত বার একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছি। বার বার চিন্তা করুন, খলিলের কাবা ফেলে কেন মহানবি হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনা করতে গেলেন? কেন লোকালয়ে ধ্যানসাধনাটি না করে একদম নির্জন একটি অন্ধকার গুহার মধ্যে এতটি বছর ধ্যান করলেন? কেন ইব্রাহিম খলিলের কাবা ॥ আল্লাহর ঘরে

ধ্যানসাধনা করলেন না, বরং নির্জন স্থানে একাকী ধ্যানসাধনা করতে গেলেন? প্রার্থনার অংশবিশেষ সবাইকে নিয়ে করা যায়, কিন্তু ধ্যানসাধনাটি কেবলই একা নির্জন স্থানে করতে হয়। এই ধ্যানসাধনা আপনাকে করতেই হবে, যদি রহস্যলোকের কিছুটা অবগত হতে চান, রহস্যলোকের কিছুটা জানতে চান। তাই আগের দিনের এমন একটি ওলিও পাওয়া যায় না, যিনি ধ্যানসাধনাটি না করে ওলি হয়েছেন। এ জন্যই আগের দিনের ওলিদের মাঝে একটি প্রচণ্ড সখ্য ছিলো, মিল ছিলো, একে অপরের সঙ্গে খোলা মনে মেলান্বেশা করতেন এবং একে অপরকে অসম্ভব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আর আজ? না বলাই ভালো। কারণ হাতের আঙুল আয়না দিয়ে দেখতে হয় না। আজকের দিনে এক ওলি আরেক ওলির মুখ দেখাও বন্ধ করে দিয়েছেন। যদি বা কোনক্রমে দেখা সাক্ষাৎ হয়েই যায় তো রাজার-প্রজার ব্যবহারটির মতো আচরণ ফুটে ওঠে। এসব কীর্তিকলাপ দেখে দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে ওহাবিদের সঙ্গে তবলিগ জামাতে গিয়ে ঢোকে। বনে বাঘ, পানিতে কুমির, গাছে বিষধর সাপ : বলি, যাবেটা কোথায়? সুতরাং নিরপেক্ষ মনে কাকে দোষ দেব? ইমিটেশনের জগতে সব কিছু যেন ইমিটেশন হয়ে যাচ্ছে। কোনো সাধন-ভজনের নাম-নিশানাটাই যেন হারিয়ে গেছে। বইতে আছে, বাস্তবে কাঁচকলা। কিছুই জানে না, স্বঘোষিত পীর হয়ে বসে আছে! ধর্মের ভাষা-ব্যাকরণ মুখস্থ। ধর্মের বাণী, পবিত্র গ্রন্থের উপমা কথায় কথায় তুলে ধরবেন, মনে হবে কেতনা বড় হিয়া হয়। ॥ আসলে অধ্যাত্ম ধ্যানসাধনের নিয়ম-পদ্ধতি কিছুই জানে না। যা জানে, যা বলতে চায়, তা আপনি ফুটপাথের দশ টাকায় কেনা ধর্মীয় বইতে পাবেন। তা হলে পীর ধরে লাভটা কী হলো? বড় বড় কোরান-তফসির, হাদিসের অনুবাদগুলো পড়লেই তো হলো। তা হলে আবার গুরুর কিসের

প্রয়োজন? রুম্মি, হাফিজ, সানায়ি, জাম্মি, আম্মির খসরু, বু আলি শাহ কলন্দর, বুল্লে শাহ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটায়ি, বাউল সম্রাট লালন কেন ধ্যানসাধনাটির গুরুত্ব দিয়ে গেলেন? কারণ ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদা না করে যে জ্ঞান শেখা যায় তা পুঁথিগত জ্ঞান। মানুষকে একবোঝা কথার মারপ্যাচ দিয়ে বোকা বানানো যায়। নিজেই বিরাট জ্ঞানী বলে সবার কাছে জাহির করা যায়। বাহবা পাওয়া যায়। আর মনে মনে ভাবে, ‘আম্মি কী হনু রে!’ দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব আর চাকচিক্যময় জ্ঞান আপনাকে ‘আম্মি কী হনু রে’-মার্কী উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে পাছাটা ফুলিয়ে দেবে। ঘরবাড়ি, আধুনিক জীবনযাপন, সেমিনারে গুরুগম্ভীর ভাষণ, অল্পকথা মেনে মেনে বলার আভিজাত্য সত্যিই তো আপনাকে ‘আম্মি কী হনু রে’ বানিয়ে ছাড়বে। আধ্যাত্মিক বিষয়, রহস্যলোকের রহস্যময় কথাগুলো তখন বিদ্বপের ভাষায় ডাক্টরিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞানের হাসিটি হাসবেন। যেমন, শিয়াদের গুরুঠাকুর সৈয়দ আম্মির আলি সাহেব দি স্পিরিট অব ইসলাম নামক মহামূল্যবান বইটিতে সুফিবাদটিকে মুড়িভাজা করে ছেড়েছেন। দি হিস্টরি অব স্যারাসিন-এ শিয়া লেখক সৈয়দ আম্মির আলি সাহেব, নুর মুহাম্মদ দারবন্দির কাছে হালাকু খাঁর মুরিদ ও মুসলমান হবার কথাটি তাঁর মোটেই ভালো লাগে নি, তাই একদম বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অথচ অন্যান্য ইতিহাস লেখকেরা এত বড় বিস্ময়কর ঘটনাটি পরম শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরেছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, এই হালাকু খাঁর বদৌলতেই মধ্য এশিয়ায় আজ কিছু মুসলমান দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ফকিরদের কথা কেউ জ্ঞানের কচকচানির ভারিঙ্কি চাল মেরে ফেলে দিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। আবার অনেকে পরম শ্রদ্ধাভরে লিখে রাখে। কী বিচিত্র এই পৃথিবীর মানুষগুলো! চলা, বলা, লিখার কত রকমের ঢং দেখতে পাই! তাই

আলেকজান্ডারের ভাষায় ‘কী বিচিত্র এই দেশ’ না বলে বলতে চাই, ওগো আল্লাহ পাক, তোমার সৃষ্ট এই পৃথিবীটা কী বিচিত্র! এই পৃথিবীতে প্রেম আর প্রতারণা পাশাপাশি চলে। এই পৃথিবীতে প্রতিযোগিতার প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাই। এই পৃথিবীতে খুনাখুনি আর খোদাপ্রেম পাশাপাশি চলে। তারপরেও কি তোমার সৃষ্ট এই পৃথিবীটাকে বিচিত্র বলার সামান্য স্বাধীনতা দেবে না? প্রতিটি মানুষ জানে, এই দেহখানি, এই জীবন্ত কবরখানি আহাদের কঠিন রূপে ওয়াহেদ নামক ‘আম্মি’-টাকে শক্ত করে সত্তার প্রতিটি কোষে কোষে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় দেহটাই সব। দেহের ভিতর একটা যন্ত্র ঘড়ির কাটার মতো টিকটিক করে বেজে চলছে। যে কোনো মুহূর্তে থেমে গেলে, বন্ধ হয়ে গেলে, এই বাস্তব দেহটি লাশ হয়ে যায়। আর ‘আম্মি’ নামক ওয়াহেদ অদৃশ্য হয়ে যায়। ‘আম্মি’ নামক বায়বীয় পদার্থটি দেহ ছেড়ে বিদায় নিলেই দেহটিকে লাশ বলা হয়। আম্মি কোথায় গেলাম? উল্লিনে না সিজ্জিনে? জানি না। কারণ জানবার ধ্যানসাধনাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ধ্যানসাধনা করা তো পরের কথা, মনগড়া কতগুলো প্রার্থনা শাস্ত্রবিদেরা শিখিয়ে দিয়েছে। শাস্ত্রপাঠে স্বর্গ-নরক মরার পর পাওয়া যাবার বয়ান শুনিয়েছে ভাষার লালিত্য দিয়ে।

হাকিকি কবর ও শরিয়তি কবর

এতদিন এই আহাদ নামক জীবন্ত দেহটির সেবা করেছি, খান্নাসরূপী শয়তানের বিচিত্র সূক্ষ্ম ধোঁকার ফাঁদে পা দিয়েছি। আহাদ নামক জীবন্ত দেহটি যে আম্মি নই তখন সবাই কমবেশি বুঝতে পারে, যখন আম্মিটা দেহ হতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। এই আহাদ নামক দেহটির কত যত্ন করেছি, কত কিছু দেহটাকে খেতে দিয়েছি,

কত দামি দামি কাপড় দিয়ে সাজসজ্জা করেছি। এই আহাদ নামক দেহটাই তো আমার নফসের তথা আত্মার জীবন্ত কবর। তবে কি এতটি দিন কেবল কবরপূজা করে গেলাম মনের অজান্তে, মনের ভুলে! তবে কি কবরপূজা হারাম! মাটির কবরটি তো লাশের কবর আর জীবন্ত দেহটি তো আত্মার কবর। একটি শরিয়তি কবর আর একটি হাকিকি কবর। দু'টোকেই মানতে হবে। দু'টোর প্রতিই ইম্যান রাখতে হবে। জীবন্ত দেহটি আত্মার জীবন্ত কবর। যত শাস্তি যত যাতনা, যত রোগভোগ, যত প্রকার টেনশান এই জীবন্ত কবরেরই সহ্য করে নিতে হয়। সইতে না পারলে ওয়াহেদ আত্মা আহাদ নামক জীবন্ত দেহ নামক কবর হতে আপন ইচ্ছায় বাহির হয়ে যায়। আপন ইচ্ছায় বাহির হয়ে যাবার নামটিকে বলে আত্মহত্যা, খুদ কাশি, সুইসাইড, হারিকিরি ইত্যাদি।

একদিকে আগুন, পানি, মাটি আর বাতাসের তৈরি এই যন্ত্রণাময় আহাদে জড়িয়ে দেওয়া আবার তার উপর শয়তানকে খান্নাসরুপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী কষ্টকর ব্যাপার, কী অস্থিরতা, কী চঞ্চলতায় দিকভ্রান্ত হওয়া ॥ যেন সব রকম জঞ্জাল গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যাতনা! এ যেন জাহান্নামের আগুনে সব সময় নিজেই জ্বালাতে হচ্ছে। এ যেন জাহান্নামের আগুন আমারই আহাদরূপের মাঝে বিরাজিত। এ যেন জাহান্নামের আগুন কেবলই আমার অন্তরটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে অথচ বোকার মতো অন্য কোথাও জাহান্নামের আগুনটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ যেন হরিণের মৃগনাভির মতো ॥ আপন শরীরের একটি অংশ থেকে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে অথচ অন্যত্র খুঁজে বেড়ানো। আহাদ-সত্তার মাঝেই ওয়াহেদের রহস্য। অন্যত্র কেবলই আকাশ, মাটি, নদী, সাগর, চাঁদ তারা আর বহু বিচিত্র অগণিত নক্স। কেবলই সিফাত আর সিফাত। জ্ঞাত ওয়াহেদ নাই।

জাত ওয়াহেদ কেবলমাত্র জিন এবং মানবের সঙ্গেই থাকেন। তাই শয়তান জিন হতে পারে এবং তাই বলে সব জিনকে পাইকারিভাবে শয়তান ভাবাটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ জিনদের মাঝে বহু গুলি, সাহাবা ছিলো, আছে এবং কাল কেসামত পর্যন্ত থাকবে। তা না হলে কোরান-এর সূরা রহমান শুনলে কেন অনেক জিন অভিভূত হতো এবং হয় এবং কাঁদে। জিনদের কান্না আর মানুষের কান্নার মধ্যে গুণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিন্তু কান্না তো দুঃখ-বেদনার একটি উলঙ্গ আন্তর্জাতিক বোবা ভাষা। কিছু ইসলাম-গবেষকের জিনদের নাম শুনলেই গালদাহ শুরু হয়ে যায় এবং নিরপেক্ষতা ছেড়ে মনগড়া কথাবার্তায় বই লিখে বিভ্রান্ত করে। তাই আবার বলছি যে, কোরান-এর প্রাথমিক সূত্রগুলো ভালো করে না জেনে, না বুঝে ধর্মের উপর বড় বড় গবেষণামূলক বই লিখে জাতিকে বিভ্রান্তির বুড়ি উপহার দেয়। অবশ্য এটা না বুঝেই করা হয়। কারণ বুঝবার পরও যদি না বোঝার ভান করা হয় তো তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তাই আগের দিনের বড় বড় গুলিদের লিখনী হতে জানতে পারি যে, জাহান্নামের আগুন গাছপালা, ঘরবাড়ি, কোনো কিছুই জ্বালায় না, জ্বালাবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। কেবল জিন এবং মানুষের অন্ত রটুকুই জাহান্নামের আগুন জ্বালায় আর কোনো কিছু জ্বালায় না এবং অনেকে জাহান্নামের আগুনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আর সইতে না পেরে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। শতকোটি টাকার মালিক, সমস্ত শরীর সুইজারল্যান্ড হতে চেকআপ করে কোনো প্রকার রোগ নাই বলে সার্টিফিকেট পাওয়া মুকেশ আগরওয়ালা প্রেমিকার কাপড় দিয়ে সিলিং ফ্যানে বুনে আত্মহত্যা করলো। এই জাহান্নামের আগুন ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক কেহই ধরতে পারে না, অথচ মুকেশ আগরওয়ালা

আত্মহত্যার কাপড়ে বুলছে। জাহান্নামের আগুন কতখানি গুপ্ত, কতখানি রহস্যে লুকানো যে, কেউ ধরতে পারে না, কেউ বুঝতে পারে না।

ফেরকাবাজির পরিণাম

সাধক মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে নিজের ভেতর লুকানো শয়তানরূপী খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার সাধনায় ধ্যানমগ্ন থাকেন। শয়তানরূপী খান্নাসটি তাড়িয়ে দেবার জন্যই নবি-রসুলরা প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত-ইশারায় ভরে গেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, দায়েমি নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কোরবানি ইত্যাদি প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাঝেই এই লুকিয়ে থাকা রহস্যটি অনুধাবন করা যায়। অনুষ্ঠানের মাঝে অণুপরিমাণ নিরেট সত্যটিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কেউ ধরতে পারে, কেউ পারে না। এই ধরা না ধরার মধ্য দিয়েই নানা রকম ফেরকার সৃষ্টি হয় যেমন সুন্নি, শিয়া, ওহাবি, রফেদান, আহলে হাদিস, মুতাজ্জিলা, বাহাই, বাটালভি, চক্রালভি, নুসাইরি, দেওবন্দি, রেজভি, তবলিগ, বুরহানিয়া, ইমামতিয়া ॥ এ রকম অনেক ফেরকা। ঝগড়া, মারামারি লেগেই থাকে। অথচ প্রত্যেকের মনে করা উচিত যে, আমার ধর্মদর্শন আমার কাছে আর তোমার ধর্মদর্শনটি তোমার কাছে। আগেকার ওলিরা মুরিদদেরকে মোরাকাবা-মোশাহেদার পথ দেখিয়ে দিতেন। একেক ওলির একেক রকম মোরাকাবা, কিন্তু মূল দর্শনটি এক এবং অভিন্ন। আমি অধম লিখক বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর লিখিত তেইশ প্রকার মোরাকাবার একটিও গ্রহণ না করে হজরত বু আলি শাহ কলন্ডরের দেওয়া মোরাকাবাটি গ্রহণ করে নিয়েছি এবং

সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত লিখে দিয়েছি এবং কেমন করে মোরাকাবাটি করতে হবে তাও লিখে দিয়েছি। যেহেতু কলন্ডর সত্যরহস্য কিছুটা হলেও অবশ্যই জানতে পারবে বলে নিশ্চয়তা দিয়ে গেছেন এবং এমন কথাটিও বলে গেছেন যে, তিনটি মোরাকাবা তিনটি নির্জন স্থানে করার পর যদি সামান্য নিদর্শনও না পাও তো হাতে দু'টো পাথর নিয়ে তাঁর মাজারে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বলে দিয়ো, কলন্ডর মিথ্যুক (হবহ কলন্ডরের ফারসি ভাষার অনুবাদটি তুলে ধরা হলো)।

অধম লিখকের তিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হতে বলছি যে, একজন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, ভালো কবিতা লিখতেন, সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং পীর-ফকির মানবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং নাস্তিক্যবাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারই বাল্যবন্ধু আমার ভক্ত এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাষায় টিটকারি করার পর ভক্তটি সইতে না পেরে বলে ফেলেছিল, আমার পীরবাবা তোমার মতো দশটা পকেটে রেখে চলে। ভক্তের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমার বাসায় আসেন। আমার বিশাল বুক কালেকশন দেখে একটু অবাক হলেন। আমি কেবল হেসে একটি কথাই বলেছিলাম এবং সেই কথাটির সামান্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'বাবা, জেনে রাখো, কথার মধ্যে আল্লাহ নাই আর আল্লাহর মধ্যে কথা নাই।' ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক বিখ্যাত যৌন বিজ্ঞানীদের রেফারেন্স তুলে ধরলাম। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, বাৎসায়নও তুলে ধরলাম। বললাম, 'বাবা জেনে রাখো, অধম লিখকের বাবা আমার মায়ের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করার চরম মুহূর্তে আমার বাবা একটি বাক্যও শুদ্ধ করে বলতে পারে নি এবং পৃথিবীর কোনো মানুষ সেই চরম মুহূর্তে একটি বাক্যও বলতে পারে না। সুতরাং চরম মুহূর্তে আল্লাহর

নৈকট্য লাভের পর আর কোনো কথা থাকে না। তাই কথার যেখানে শেষ, ভালোবাসার সেখান থেকেই শুরু হয়।’ আমার কথাগুলো তার কাছে ভালো লাগলো। বললাম, ‘বাবা, যদি কিছু পেতে চাও তো আমার কথামতো তিনটি মোরাকাবা করে দেখ। যদি কিছু না পাও তো যা ইচ্ছা তাই আমাকে বলে দিয়ো। এর আগে একটি কথাও নাই।’ তিনি আমার কথামতো বগুড়া জিলার কাহালু উপজেলার একটি মাজারের আশেপাশেই মোরাকাবায় বসলেন। তারপর আর কী? একটির পর একটি মোরাকাবা করে চলছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তাহাজ্জুদ, নফল রোজা এবং রিয়াজতের পর রিয়াজত করে চলছেন। আল্লাহ পাক তাকে কত বড় হেদায়েত দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাকে খাস বান্দা হবার রহমত দান করেছেন বলেই পরহেজগারি জিন্দেগিকে আপন ইচ্ছায় বরণ করে নিতে পেরেছেন। সব কিছুর মালিক তো একমাত্র আল্লাহ পাক। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। পীর তো কেবল উসিলা মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। কারণ চরম সত্যে পীর ধরাও শেরেক, কিন্তু এটাই শেষ শেরেক। যখন লাহত মোকামে সাধক গমন করেন তখন দেখতে পান যে, পীর ডান দিক দিয়ে আর খান্নাসরুপী শয়তান বাম দিক দিয়ে চলে গেছেন। তখনই সাধক বলে ফেলেন যে, ‘আমার পীরও আমি, আর আমার মুরিদও আমি।’ এক বিনে আর বহু দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তখন অবলুপ্ত হয়ে যায়। তখনই সাধক তৌহিদে বাস করেন। এই রহস্যময় জ্ঞান যিনি অর্জন করতে পারেন নি তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে সাধারণ ॥ সমাজ জীবনে হয়তো অনেক কিছু সম্মানের পাত্র। সেই এলম্নে লা দুনি হা সিল যে করতে পারে নি আর যিনি পেরেছেন তারা উভয়ে কি সম্মান? চক্কুস্নান এবং অন্ধ কি সম্মান? আলো আর অন্ধকার কি সম্মান? ফাঁসির আসামি এরশাদ শিকদার ফাঁসির রশিতে বুলে মৃত্যুযন্ত্রণা বুঝতে

পারছে, অথচ যে জল্লাদ যন্নটুপি পরিয়ে ফাঁসির দড়িটি গলায় পরিয়ে পা হতে পাটাতন সরিয়ে দিচ্ছে সে কি এই মৃত্যুযন্ত্রণা বুঝতে পারবে? অথবা জল্লাদের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে ফাঁসির দৃশ্যটি দেখছে? ফাঁসির আসামি এরশাদ শিকদারের মৃত্যুযন্ত্রণাটি বুঝতে পারবে আর এক ফাঁসির আসামি অমৃত লাল বর্মণ। অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সিংহের শরীরে কতটুকু অথবা বাঘের শরীরে কতটুকু শক্তি সেটা একটা সিংহ বুঝতে পারবে। কিন্তু একটি খরগোশ অথবা হাঁসের পক্ষে কি বোঝা সম্ভব? না, মোটেই না। সুতরাং ধ্যানসাধনাটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথা যিনি ধ্যানসাধনাটি করছেন কেবল তিনিই বুঝতে পারবেন। সমাজের অন্য দশজন বুঝতে পারবে না। তবে সহানুভূতি দেখাতে পারেন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন ॥ এর বেশি কিছু নয়। সুতরাং সুফিবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তাই ব্যক্তিকে আশ্রয় করতে পারে।

সত্যদর্শনে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি আশ্রয়

মহানবির আসহাবে সুফ্ফারাও ধ্যানসাধনাতে মগ্ন থাকতেন এবং মহানবি রহস্যের জ্ঞান বিতরণের জন্যই এই আসহাবে সুফ্ফাদের নিয়োজিত করেছিলেন। মহানবির এত বড় বড় সাহাবারা থাকা সত্ত্বেও কেন মহানবির জুঝা মোবারক হজরত ওয়ায়েস করনিকে দান করে গেলেন? হজরত ওয়ায়েস করনি তো মজ্জুব তাবৈঈন

ছিলেন। মজ্জুবের জন্য শরিয়তের আইন খাটে না। দুনিয়ার আইনেও তো তাই রাখা হয়েছে। তাই আগের দিনের বড় বড় ওলিরা প্রায়ই বলতেন যে, লা ইউফতা আলাল আশেকিন তথা প্রেমিকের ওপর কোনো ফতোয়া নাই। কেউ আমার কথাগুলো মেনে নেবে এবং এই মেনে নেওয়াটাই তার তকদির। আবার কেউ আমার কথাগুলো মেনে নেবে না এবং এই না মানাটাই তার তকদির। সূরা মুলকের সেই বাণী : আমার সৃষ্টিতে কোনো ভুল নাই, বরং তোমার চোখের দৃষ্টি বিক্ষারিত হয়ে তোমার কাছেই ফেরত আসবে। আমি অধম লিখক সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই : আসুন, আমার উপর আপেক্ষিক (কিছুদিনের জন্য) বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করে ভক্ত হয়ে আমার কথামতো মোরাকাবা-মোশাহেদা করে দেখুন না আমার কথাগুলো সত্য না মিথ্যা। চুক্তিভিত্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস রেখে আমার ভক্ত হয়ে আমার কথামতো মাত্র তিনটি ধ্যানসাধনা করে দেখুন না আমার কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্য কি না। হে সাধনা করে সত্য জানার আগ্রহী সাধক! আসুন, অনুরোধ করছি। চুক্তিভিত্তিক মৃত্যু বিবাহের মতো মাত্র একটিবার তো পরীক্ষাও করতে পারেন আমার এই আস্থানে কতটুকু সত্যতা বহন করে। সারাটি জীবন মালপানি মালপানি করে যাবেন, তা করুন, কিন্তু সামান্য একটু সময় সারা জীবনের মধ্যে বাহির করে নিতে কি পারবেন না? আমার এই ডাক, আমার এই আস্থান, আমার এই দাওয়াত তো কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সর্বধর্মের সব মানুষের জন্য : যারা ধর্মের ধার ধারেন না, যাদের হিশাবের অঙ্কে ধর্মটির সামান্য স্থান পায় নি, যারা প্রকৃতিবাদী, যারা মানবতাবাদী, যারা সন্ধেহবাদী, যারা প্রচুর লেখাপড়া করেছেন, যারা অনেক ডিগ্রি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতি আমার শেষ অনুরোধ রইল ॥ আসুন, চুক্তিভিত্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে

এগিয়ে আসুন। হয়তো ব্যর্থ নাও হতে পারেন। হয়তো সত্যদর্শনে চোখের জল গড়িয়ে পড়বে। হয়তো নিজের সারাটি জীবনের ভুল অঙ্কগুলো পরিষ্কার হয়ে সত্যসাগরে অবগান করতে পারবেন। সাইনবোর্ডের পূজারি হবার চেয়ে সত্যের পূজারি হওয়া অনেক শ্রেয়। আমরা সবাই কমবেশি বাপ-দাদার সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে বড় বড় বুলি আউড়িয়ে বাপ-দাদাদের সত্যতা প্রমাণ করার অঙ্ক প্রতিযোগিতায় মগ্নে আছি। আমরা ভ্যানগাড়ি চালিয়ে বাজনা ছাড়া ইসলামিক মরণগীতির ক্যাসেট শুনছি, আমরা লালনগীতি, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, হাসনরাজা, জালাল শাহের মরমি গান শুনছি। কিন্তু এর মর্মটি অনুধাবন করার তরে সামান্য এগিয়ে আসছি না। আমরা সঙ্গীত, নৃত্যকলার শৈলী, নাটক-যাত্রার মার্জিত আলংকারিক নিরেন লাহিড়ি মার্কা ভাষার যাদুকরি ঠমকে বার বার ধমক খেয়ে চলছি। কিন্তু একটিবার কি কিছুদিনের তরে ধ্যানসাধনার জন্য এগিয়ে আসবো না? আপনাদের বিবেক কী বলে? সব কিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিন, আমার আপত্তি রইল না।

আর একটি কথা মনে রাখবেন, ধ্যানসাধনা করলে অবশ্যই পাবেন। কিন্তু তকদিরে যদি ধ্যানসাধনাটি লিখা না থাকে তো ধ্যানসাধনায় বসতে গিয়ে বুঝতে পারবেন যে, কী এক অদৃশ্য শক্তি আপনার পাছায় লাথি মেরে উঠিয়ে দিচ্ছে। কুখ্যাত সম্বাসীরা যেমন আচমকা গুলি খেয়ে পথে কুকুরের মতো মরে পড়ে থাকার দৃশ্যটি দেখিয়ে দেয়, তখন হাঁশ আসে যে, মহাপাপ মৃত্যুদণ্ড উপহার দেয়। মশা-মাছি সৃষ্টি করার মাঝেও তো আল্লাহ অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ বোঝে কেউ বোঝে না। ধন তো অনেক পেয়েছেন। তারপরেও ধনের নেশা! কত খাবেন? কত আনন্দ করবেন? কত দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন? হয়তো শত বছর, আপনার

ছেলেরা খাবে, মেয়েরা খাবে, নাতিরা খাবে, তারপর? এই আহাদ নামক কঠিন দেহটিকে ফেলে যে একদিন আপনাকে চলে যেতেই হবে। একটু আগে, না হয় একটু পরে। এরই জন্য এত মাখামাখি, এত মত্ততা। তারপর সব শেষ। সব নীরব। কেবল একা আর একাকী অবস্থান। এতই নেশা, এতই মাতাল, নামাজ পড়বেন কখন? নেশায় চুর হয়ে নামাজ কেমন করে পড়বেন? নামাজের ধারে কাছেও তো নেশার অবস্থায় যেতে পারবেন না। যাবার অধিকার নাই। এটাই বিধির চিরন্তন বিধান (সূরা নেসা)।

সবশেষে শেষ কথাটি বলছি : নিজের ডেতর খান্নাসরুপী শয়তান খেলছে আর আন্নি আর আপনি খান্নাসের ভাড়া করা মাইকের মতো জোরে এই ভবের নাট্যশালায় কেবল চিৎকারই করে গেলাম। একবার একটি মুহূর্তের তরেও ভাবতে পারলাম না যে, সব খেলাগুলো খান্নাসরুপী শয়তান খেলে গেল আম্মাকে একদম বোকা বানিয়ে! গাধার মতো কেবলই চিনির বোঝাই টেনে গেলাম, কিন্তু একবার চিনিটি চিনতে পারলাম না। ‘ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা বড় দায়’, কথাটি কি বেশি মূল্যবান, নাকি ‘ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায়’ কথাটি বেশি মূল্যবান! এই বুঝতে না পারাটাও একটি তকদির। এই তকদির একমাত্র আল্লাহর ওলি বদলিয়ে দিতে পারেন, দোয়ার মাধ্যমে। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সাঁ দেখতে আটটি, আসলে কিন্তু সাতটি। সঙ্গীতের গুরুঠাকুরেরা বলেন যে, যত রাগ-রাগিণী, যত গান সব এই সাত পাকেই বাঁধা। এর বাইরে সঙ্গীতের যাবার বিধান নাই। গানের অন্তরার আবিষ্কারক মিল্লা তানসেনের কত কঠিন কঠিন রাগ, যেমন হংসধ্বনি, ঝিনঝুটি, বাহার, কেদারা, মেরুবেহাগ, ঊমরী, ইমন ইত্যাদি ॥ সবই ঐ মাত্র সাতটি পাকেই বাঁধা। মিল্লা তানসেন, আন্নির খসরু, ফতেহ আলি খান,

নাজাকাত আলি, সালামত আলি, ভীমসেন যোশী, রবিশংকর ॥ সবাই সাত পাকে বাঁধা। সাত পাকের মাঝেই সব বাহাদুরি, সব ঠাটবাট। সে রকম যত প্রকার মোরাকাবা-মোশাহেদা, ধ্যানসাধনা, অনেক রকম অনুষ্ঠান, সব কিছু এক শয়তানের চারটি রূপের পাকে বাঁধা। জগতের যত মুনি, ঋষি, গুলি, দরবেশ, মজুব, মস্তান ॥ সবাই অনেক অনেক কথা আর উপদেশ দিয়ে গেছেন। আসলে সবগুলো উপদেশ মাত্র চারটি পাকে বাঁধা। ইবলিস, শয়তান, মরদুদ আর খান্নাস। এই চারটির বাহিরে একটি কথা, একটি উপদেশও কোনো নবি, কোনো রসূল, কোনো গুলি, কোনো আবদাল, কোনো ধর্মগ্রন্থ, কোনো মহাপুরুষ দিয়ে জ্ঞান নি। দিয়ে যেতে পারেন না। দিয়ে যেতে পারবেন না। কারণ সব উপদেশ সব ধর্মগ্রন্থ এই চারটি পাকেই বাঁধা আছে।

যাহারা সাধনায় আগ্রহী তাহাদের প্রতি অনুরোধ

মোরাকাবা-মোশাহেদা তথা ধ্যানসাধনা তথা মেডিটেশন করার জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল খুলেছি। একদম নির্জন স্থানে। তিনদিকে টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘোলটি ধ্যানসাধনার ঘর তৈরি করা হয়েছে। তিনটি মহিলাদের জন্য এবং তেরটি পুরুষদের জন্য। প্রতিটি চল্লিশ দিনের ধ্যানসাধনার খাবার খরচ মাত্র এক হাজার টাকা।

বলে রাখলাম

দেশ-বিদেশ হতে অনেকে বু আলি শাহ কলন্ডরের মোরাকাবাটি পুনরায় লিখে জানাতে এবং কী কী নিয়মে মোরাকাবাটি করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ জানাতে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। কিন্তু এই মোরাকাবাটির প্রতিটি ধাপে কী কী করতে হবে এবং কেমন করে করতে হবে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইটির প্রথম খণ্ডে।

জানিয়ে রাখলাম

আমাদের কিছু বৈঠকি ওয়াজের সিঁড়ি আছে। প্রয়োজন মনে করলে সেই সিঁড়ি কিনতে ও শুনতে পারেন। হয়তো শুনে ভালো লাগতে পারে, আবার নাও লাগতে পারে। একটা ঝাঁকুনি চিন্তার রাজ্যে খেতেও পারেন, আবার নাও পারেন। বিশ্ব্বয়ের ধমক আর চমক চোখে লাগতেও পারে, আবার নাও পারে। কোনো মানুষের পছন্দ-অপছন্দের উপর কোনো জোরজবরদস্তি চালানোর বিধান নাই। সংগ্রহের জন্য প্রকাশনালয়ে যোগাযোগ করুন।

সুফিবাদ প্রকাশনালয়

প্রযত্নে : বে-ঈমান হোমিও হল

১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫

ফোন : ০১৭১১১২৮১৬৯

বিন : ইন্ডরংস.১৫০স.পড়স

